সচিত্র।

"বিজ্ঞানমন্বয়মেবৈতদশেষমবগচ্ছত"।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সাধু কর্ত্তৃক

যোড়াসাঁকো ৫ নং দ্বারিকানাথ ঠাকুরের গলি হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

১৩ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের গলি

বিজ্ঞান-যন্ত্রে

শ্রীঅধরচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯০।৯১

সূচিপত্র।

সূচিপত্র সমাপ্ত।

BENG... 17. AUG.

মানবতত্ত্ব।*

মানব কি, কোথা হইতে আইল, কোথা যাইবে এবং তাহার কর্ত্তব্যই বা কি? এই সকল প্রশ্ন চিন্তাশীল মানবের মনে স্বতঃই উত্থিত হইয়া থাকে। বস্তুত মানবের এই আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান, এই আত্মচিন্তাই পরমার্থ চিন্তা। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে ঋষিগণ এই আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বহুল চিন্তা করিয়া পৃথিবী মধ্যে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আধুনিক বঙ্গবাসী এই সকল আত্মতত্ত্ব একবারও চিন্তা করেন না এবং প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিগণ-প্রথিত সিদ্ধান্ত গুলি একবারও সমালোচনা করেন না। তাঁহারা উপন্যাস, নবন্যাস, নাটক, পদ্য প্রভৃতি সুললিত কাব্য-রচনা পাঠ করিয়া কাল অতিবাহিত করেন—যাহাতে আমোদ আছে তাহাই পাঠ্য মনে করেন এবং যাহাতে চিন্তা-শক্তি চালনা ও বিশেষ অধ্যবসায় আবশ্যক তাহা একেবারে পরিত্যাগ করেন। এ জন্য বঙ্গ ভাষায় চিন্তাশীলতা-পরিচায়ক গ্রন্থ অতি বিরল। ব্রহ্ম-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণের বোধের জন্য সম্পূর্ণ গ্রন্থ একখানিও নাই। বীরেশ্বর বাবু কতক পরিমাণে এই অভাব দূর করিয়াছেন। তাঁহার "মানব তত্ত্ব" গ্রন্থে ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্বের সংক্ষেপ সমালোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কিন্তু বীরেশ্বর বাবু আত্মজ্ঞান সংস্কারের জন্য—ধর্ম্ম ও সমাজের উৎকর্ষ সাধন জন্য মানবতত্ত্ব প্রনয়ণ করেন নাই। তাঁহার মতে আমাদের ধর্ম্ম ও সামাজিক অবস্থা যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট, তাহার আর উন্নতির আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে কেবল ঐহিক ব্যাপারে মনঃসংযোগ করিলেই—ধনাগমের চিন্তা ও চেষ্টা করিলেই বাঙ্গালী প্রকৃত উন্নতি লাভ করিবে। তিনি লিখেন "যে ধর্ম্ম ও সমাজের উৎকর্ষ সাধন জন্য ভারত বাসিরা চিরজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন ও যাহার উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, বঙ্গবাসী ছন্নমতি হইয়া তাঁহারই সংশোধনে ব্যতিব্যস্ত। ঐহিক ব্যাপারে তাহারা তাদৃশ মনঃসংযোগ করেন নাই বলিয়া অধুনা ভারতের এই দুর্দ্দশা, তাহার উন্নতি চেষ্টা কেহ করেন না। পৃথিবীতে যদি কোন সত্য ধর্ম্ম থাকে তবে সে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, যদি পৃথিবীর কোন দেশে প্রকৃত জ্ঞানালোচনা হইয়া থাকে, তবে সে ভারতবর্ষে। পৃথিবীতে যদি কোন সভ্য জাতি থাকে, যদি কোন জাতি নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় পবিত্র ধর্ম্মভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, তবে সে জগদ্বিখ্যাত দেবোপম আর্য্য জাতি। বঙ্গবাসির ঐ সকলের উন্নতির চেষ্টা অনাবশ্যক, বহির্জ্জাগতিক উন্নতি চেষ্টাই বঙ্গবাসির নিতান্ত আবশ্যক।" উহাই বুঝাইয়া দিবার জন্য বীরেশ্বর বাবু "মানবতত্ত্ব" প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আমাদের কয়েকটী বক্তব্য আছে—

১। যাহাকে আমরা সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বলি সেটা কি? হিন্দুধর্ম্ম কি একজন না বহুজন ঋষি-প্রথিত? ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন "হিন্দুধর্ম্ম অসংখ্য ঋষি ও

* [illegible] কলিকাতা। [illegible] মূল্য [illegible]

জ্ঞানীর মস্তিষ্ক হইতে সঞ্জাত হইয়াছে, ইহাতে নাই এমত মত পৃথিবীতে কোন ধর্ম্মে নাই"। যদি তাহাই হয়, তবে কোন্ মতটী বঙ্গযুবকের গ্রহণীয়?

২। আর্য্যজাতির ভারতে আগমন কাল হইতে অদ্যাবধি হিন্দুধর্ম্মের কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না? বেদের সময়ে, উপনিষদের সময়ে, পুরাণের সময়ে এবং বর্ত্তমান সময়ে ঐ হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না? এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম বলিলে কোন ধর্ম্মটী বুঝায়? বৈদিক, ঔপনিষদিক বা পৌরাণিক ধর্ম্ম? যদি কালপরম্পরায় হিন্দুধর্ম্মের পদ্ধতি ও প্রকরণের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আধুনিক বাঙ্গালী তন্মধ্যে কোনটী ভাল তাহা নির্ব্বাচন জন্য চেষ্টা করিলে দোষ কি?

৩। হিন্দুধর্ম্ম এত প্রশস্ত ও জটিল যে ইহার মধ্যে সর্ব্ব প্রকার ঈশ্বর কল্পনা আছে। সাকার ও নিরাকার, দ্বৈত ও অদ্বৈত, একেশ্বর ও সর্ব্বেশ্বর প্রভৃতির কল্পনা সকলই আছে। আবার, সকাম ও নিষ্কাম, হিংসা ও অহিংসা, স্বার্থ ও নিঃস্বার্থ, জ্ঞান ও অজ্ঞান, গার্হস্থ ও সন্ন্যাস, বাহ্য ও মানস পূজা প্রভৃতি নানা প্রকার উপাসনা পদ্ধতি আছে। এইরূপ সঙ্কটে নব্য বাঙ্গালী কি করে? কোন মতটী গ্রহণীয় বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করে?

৪। প্রধানতঃ বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য এই পঞ্চ উপাসক অদ্যাপিও ভারতে বর্ত্তমান আছে; ঐ পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের শাখা প্রশাখা অন্ততঃ ২০০ সম্প্রদায় হইয়াছে; এই সকল ধর্ম্ম প্রণালী হিন্দু পদ বাচ্য। বঙ্গযুবকের ইহার মধ্যে কোনটী গ্রহণীয়?

৫। হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, হিন্দু সমাজের সম্বন্ধেও তাহা খাটে। গ্রন্থকার যাহাকে হিন্দু সমাজ বলিলেন সেটী কি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারি যুগেই এক বিধ? সমাজ প্রবর্ত্তক কি একই ব্যক্তি? ধর্ম্মের ন্যায় সমাজের কি জটিলতা ও বিভিন্নতা নাই? সমাজের কি কাল ভেদে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই? যদি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, আর পরিবর্ত্তনই যদি উৎকৃষ্ট ও অধমের বিচার সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে বঙ্গযুবকের কোনটী ভাল, কোনটী মন্দ বিচার করা কি আবশ্যক নয়?

হিন্দুশাস্ত্র অকূল জলধিসম—ইহাতে যাহা খুজিবেন তাহাই পাইবেন—ভিন্ন মত দূরে থাকুক সম্পূর্ণ বিপরীত মত পরিপোষক ঋষি বাক্যও পাওয়া যায়। মানবতত্ত্বে যে যে বিষয়ে যে যে মত সমর্থন করা হইয়াছে তদ্বিপরীত মতের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করা যায়। সেদিন পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুসংখ্যক ঋষি বাক্য দ্বারা বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়ত্ব প্রমাণ করিলেন, কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ বাচস্পতি মহাশয় তদ্বিপরীত মত অর্থাৎ বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত নয়, তাহাও ঋষি বাক্য দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন। যখন শাস্ত্রীয় বচনে বৈপরীত্য এবং বড় বড় পণ্ডিতের মধ্যে শাস্ত্রের মীমাংসা লইয়া এত মতভেদ, তখন নিরীহ বঙ্গযুবক কি করিবে? কোনটী প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম ও রীতিনীতি বলিয়া গ্রহণ করিবে? যদি বল, বর্ত্তমান কালের ধর্ম্ম ও ব্যবহারটীই আমাদের গ্রহণীয়। বর্ত্তমান কালেওত উপরিউক্ত বিভিন্ন ধর্ম্ম ও ব্যবহার প্রচলিত আছে? তবে কোনটী গ্রহণীয়? আর, যদি বল বিভিন্ন উপাসকের মধ্যে যাহার যে পৈত্রিক ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার তাহাতেই থাকা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেত সদ সদ পদ্ধতির বিচার রহিল না। এতদ্ভিন্ন ইহাতে আরও অনেক দোষ আছে।

গ্রন্থকার বলেন "মানবতত্ত্ব কোনও গ্রন্থ বা প্রচলিত কোনও মত অবলম্বনে লিখিত হয় নাই। আপনাদের দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যাহা জানিতে পারা গিয়াছে তাহাই লিখিত হইয়াছে মাত্র"। তাঁহার কথাতে বুঝা যায় যে, ইহা কোন হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া লিখেন নাই। যখন তাঁহার মতের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ-সাপেক্ষ রহিল, তখন তিনি কি যুক্তিতে বলেন, শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম ও ব্যবহার বাঙ্গালীর অবলম্বনীয়। আর যদি শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতেন তাহা হইলে বা কি হইত ? হিন্দুশাস্ত্রে ত সকলই আছে, তাঁহার বিপরীত মতও ত স্থাপন করা যায় ? পূর্ব্বতন ঋষি বাক্যই হউক বা অধুনাতন অধ্যাপক বাক্যই হউক, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইলেই সাধারণ লোকে তাহাকে শাস্ত্র বলে। আর্য্যজাতি অতি প্রাচীন ও ইহাতে অসংখ্য ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব নানা প্রকার মতের অপ্রতুল কি ?

আমাদের বিবেচনায় ঐহিক সুখ পরিবর্দ্ধন জন্য ধর্ম্ম ও সমাজ উভয়েরই সংস্করণ আবশ্যক। সমাজের সহিত ধর্ম্মের নিগূঢ় সম্বন্ধ, সমাজের সহিত বহির্জ্জাগতিক ঐহিক সুখের অভেদ্য সম্বন্ধ আছে। অতএব, ঐহিক সুখের বৃদ্ধি করিতে হইলে ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্করণ অত্যাবশ্যক। সমাজ বলিল ভারতবর্ষের বাহির হইয়া দেশান্তর গমন করিও না, অমনি ভারতবাসিদিগের দেশান্তর গমন করিয়া বাণিজ্য শিল্প বা কৃষি ইত্যাদি ঐহিক সুখ পরিবর্দ্ধক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা বন্ধ হইল, অধঃপতিত ভারত বৈদেশিক বিজ্ঞানের উন্নত ফল অনায়াসলব্ধ হইলেও লাভ করিতে পারিলেন না। আবার দেখুন, ধর্ম্মানুরোধে লোকে সর্ব্বত্যাগী হয়, আত্ম-নির্যাতন করে, বৃথা উপবাস করিয়া শরীর ক্ষীণ করে, দাম্পত্য সুখ পরিবর্জ্জন করে, সমাজিক আমোদ প্রমোদ ত্যাগ করে, অর্থনাশ করে! অতএব ধর্ম্মও সমাজ কুসংস্কারগ্রস্ত হইলে ঐহিক সুখের নানা ব্যতিক্রম জন্মে। যদি তাহাই হয়, তবে বীরেশ্বর বাবু কি যুক্তিতে বলেন যে, বাঙ্গালী ঐহিক সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেন ওদ সংস্করণে ব্যস্ত? স্থূল কথা এই যে ধর্ম্মও সমাজ সংস্করণ চেষ্টা করিলে যে বাণিজ্য কৃষি ইত্যাদির উন্নতি হয় না এমন নয়। সকল দেশে এবং সকল সময়ে সর্ব্ববিধ উন্নতি এক সময়েই হইয়া থাকে। সংস্করণের জাতীয় উদ্যমে ধনাগম উন্নতিও হইয়া থাকে।

আর একটী কথা—তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের পক্ষপাতী—তিনি তাহাতে দোষ শূন্য দেখেন। যদি তাহাই হয়—ধর্ম্ম ও সমাজের ঐহিক সুখের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না থাকে, তবে ভারতের ঐহিক অবস্থার এত দুর্দ্দশা কেন ? যদি ধর্ম্ম ও সমাজের ঐহিক সুখ বর্দ্ধন করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মও সমাজ সম্পাদন করিতে পারে নাই—এজন্য ইহার সংস্করণের আবশ্যক। আর যদি তাহাদের এ ক্ষমতা না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে ঐহিক সুখের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। এতদস্থলে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্করণ করিলে ঐহিক সুখের ব্যাঘাত জন্মে না, যে হেতু সকল লোকেই কখন এক কার্য্যে ব্যস্ত থাকে না।

গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের পক্ষপাতী হইয়া, তাহার সম্পূর্ণ অনুশীলন ও অনুষ্ঠান

করিতে বলিয়াছেন কিন্তু গ্রন্থের উপসংহারে তদ্‌বিপরীত মতও দেখা যায়। তিনি লিখেন "ইউরোপীয় সভ্যতার আলোক আমাদের নিতান্ত আবশ্যক"। "ইউরোপীয় সভ্যতার আলোক দ্বারা বিশেষ নিপুণতার সহিত ইউরোপীয় দিগের নিকট গুণ ভাগ শিখিয়া ভারত সমাজ-প্রবিষ্ট দোষাবলী সংশোধন করিতে চেষ্টা কর"। "যদি ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্করণে তোমাদের ইচ্ছা থাকে, তবে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সামাজিক নিয়ম সকল পরিত্যাগ করিও না; দৃঢ় রূপে উহার উপাসক থাকিয়া সংস্কার সাধনে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই সফলকাম হইতে পারিবে"। ইহার সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত মতের সামঞ্জস্য কোথায়?

মানবতত্ত্বে যে যে বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশের যৎকিঞ্চিৎ আভাস নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তিতে দেওয়া গেল।

১। বিশ্ব। যখন আমরা কোন পদার্থের আদি জানিতে পারি নাই, তখন বিশ্বকে সাদি বলিব কেন—অনাদি বলিনা কেন? বিশ্বকে আদি বলিয়া অনাদি স্বরূপ ঈশ্বর কল্পনা করি কেন? আকাশ ও কাল উভয়ইত অসীম ও অনাদি, তবে কেন অনাদি স্বরূপ ঈশ্বর কল্পনা করি? গ্রন্থকার বলেন "বিশ্বের অনাদিত্ব জ্ঞানই আমাদের স্বাভাবিক, সুতরাং প্রকৃত। বিশ্ব কখনও সৃষ্ট হয় নাই, কখন নষ্টও হইবে না। উহা চিরকাল আছে, চিরকালই থাকিবে। দেখিয়া শুনিয়া যাহা জানা যায়, যদি তাহারই নাম জ্ঞান হয়, মীমাংসা করিতে যদি যুক্তিরই সহায়তা লইতে হয়, যদি আপ্তবাক্য বলিয়া কিছু আছে এরূপ বিশ্বাস না করা যায়, তবে বিশ্বকে অনাদি বলিতে হইবে"। বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে বিশ্বের অনাদিত্বই প্রমাণ হয়।

২। সৃষ্টি। বিশ্ব ও পৃথিবী স্বতন্ত্র অথবা পৃথিবী বিশ্বের অংশ মাত্র। বিশ্ব অনাদি হইলেও পৃথিবী সাদি হইতে পারে, কিন্তু ইহার উপাদান পূর্ব্ব হইতে ছিল বলিতে হইবে। তবে কি প্রকারে পৃথিবী "সৃষ্ট" বস্তু? যখন উপাদান সামগ্রী অনাদি কাল হইতে রহিয়াছে, তখন তাহার গঠনে পৃথিবীরূপ ধারণ করাতে সাদি হইল কি যুক্তিতে? গ্রন্থকারের মতে বিশ্ব অনাদি অনন্ত, কিন্তু পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টি কে করিল? প্রকৃতি না প্রকৃতি অতীত "ঈশ্বর" শক্তি? যদি ঈশ্বর করিয়া থাকেন, তবে উহার উপাদান কোথায় পাইলেন? যদি উপাদান অগ্রে ছিল, তবে সৃষ্টি কি রূপে হইল?—সে কেবল নির্ম্মাণ কার্য্য বৈত নয়? যে গঠনের উপাদান বস্তু নূতন, পূর্ব্বে ছিল না অর্থাৎ সাদি উহাই সৃষ্ট, নতুবা নির্ম্মিত বস্তু বিশেষ। বোধ হয় তিনি "নির্ম্মাণ" অর্থে "সৃষ্টি" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

পরমাণুই কেবল নিত্য—তাহার ধ্বংস নাই—এইটাই সাঙ্খ্য মতে প্রকৃত উপাদান বস্তু—ইহা অনাদি অনন্ত। এতদ্ব্যতীত সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল। আর্য্যেরা যাহাকে পঞ্চভূত এবং আধুনিক ইয়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে ৬৫ ভূত বলিতেছেন, তাহাই প্রকৃত বিশ্ব। ঐ সকল উপাদান পদার্থের সংযোগ বিয়োগই সৃষ্টি। [illegible] হইতে মানব

পর্য্যন্ত সমুদয় পদার্থের একই উপাদান—পরমাণু—মূলপ্রকৃতি। ঐ পঞ্চভূতও এই মূল-প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত। নিত্য (Noumina) অপরিবর্ত্তনীয়, অতএব সৃষ্ট নয়। নৈমিত্তিক (Phenomena) পরিবর্ত্তনশীল, এজন্য সৃষ্ট। নিত্য নৈমিত্তিক উভয়ই প্রকৃতি বৈ আর কিছুই নয়। নিত্য প্রকৃতি অব্যক্ত, নৈমিত্তিক ব্যক্ত। এই পরিবর্ত্তনশীল ব্যক্ত প্রকৃতির ভিতর অব্যক্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় যে প্রকৃতি আছে, সেটী নিত্য—কাহারও সৃষ্ট নয়। সেই অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা বা বিদ্যমানতাকে দার্শনিকগণ "সৎ" বলেন —ইহা অনাদি অনন্ত—সৃষ্ট নয়। সেই নিত্য অবস্থাকেই তাঁহারা "পুরুষ" বলিয়াছেন এবং নৈমিত্তিক অবস্থাকে "প্রকৃতি" বলিয়াছেন। সুস্মতঃ পুরুষ প্রকৃতি একই পদার্থ। বিজ্ঞান কেবল "নৈমিত্তিক" জানেন মাত্র, নিত্য কিছুই জানেন না—তবে অনুসন্ধানে যাহা জানা যায় তাহা কেবল বৈজ্ঞানিক অনুমান মাত্র। পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অনুমান আছে। তন্মধ্যে মানবতত্ত্বে যে মতটী বিবৃত হইয়াছে, সেটী এই—পৃথিবী সৃষ্টির প্রাক্কালে ইহা অন্ধকারময় দ্রব পদার্থ ছিল, পরে পরিবেষ্টিত বাষ্পরাশি হইতে জল হওয়াতে, ইহা কঠিন হইয়া গোলাকার ধারণ করিল, পরে অবস্থানুক্রমে প্রস্তর ও মৃত্তিকা হইল এবং তদুপরি উদ্ভিদ ও জীব জন্মিল। বহুকাল পূর্ব্বে ভারতে এই পৌরাণিক মত প্রচলিত হইয়াছিল এবং অধুনাতন ইউরোপে লাপ্লাস (Laplace's Nebular Theory) এই মতের উদ্ভাবনা করিয়াছেন।

উপর্য্যুক্ত দুই পরিচ্ছেদে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মানব প্রকৃতি অতীত স্বতন্ত্র ঈশ্বর সৃষ্ট নয়—ইহা প্রকৃতি প্রসূত জীব।

৩। মানব। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের মতে পদার্থ দুই প্রকার, জড় ও চেতন। যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও যাহার ভার আছে তাহা জড়। যাহা তদ্ গ্রাহ্য নয়, ভারশূন্য ও যাহার শক্তি প্রভাবে মানব সমস্ত কার্য্য করে তাহা চেতন পদার্থ অথবা আত্মা। মানব এই জড় ও চেতন পদার্থের সমষ্টি মাত্র। চেতন আত্ম-স্বতন্ত্র, ঈশ্বর ইহাকে জড় পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করাইল জীব সৃষ্ট হইল। বীরেশ্বর বাবু দক্ষতার সহিত এই মত প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন জীব জড় পদার্থে গঠিত যন্ত্রবিশেষ। বিবিধ জড় উপাদান সন্নিবেশে যেমন একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ হয় এবং সে আপন কার্য্য করে, সেইরূপ জীবও বিবিধ জড় উপাদানে গঠিত। আত্মা নামক অবাঙ্‌মানস গোচর কোন স্বতন্ত্র শক্তি ইহার ভিতর কেহ বিন্যস্ত করে নাই। যাহাকে আত্মা বলা যায় সে কেবল জড়জাত চেতনশক্তি মাত্র। ঐ শক্তি পদার্থ মাত্রে নিহিত। আত্মা বাদীরা বলেন যে জড় পদার্থ নিশ্চেষ্ট এবং জীব সচেষ্ট, অতএব জীবে জড়শক্তি অতিরিক্ত অবশ্য কোন পদার্থ আছে। এই অনুমান অসিদ্ধ তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। যাহাকে আত্মাবাদীরা জড় বলিয়া নিষ্ক্রিয় পদার্থ বলেন, বাস্তবিক তাহা জড় বা নিষ্ক্রিয় নয়। পদার্থ পরমাণু-পুঞ্জ মাত্র। এক্ষণে বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে প্রত্যেক পরমাণু অপর পরমাণুকে আকর্ষণ করে। পরমাণু জড় বা নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয় পদার্থ। যদি সক্রিয় হয়, তবে চেতনা বা শক্তি উহাতে অবশ্য নিহিত থাকিবে, কারণ শক্তিই তাহার গুণ বা ধর্ম্ম। জড়ের চেষ্টা আছে বটে কিন্ত সে চেষ্টা একটি নিয়মের অধীন, আত্মাবাদীর এই আপত্তি খণ্ড

নার্থ গ্রন্থকার বলেন যে উদ্ভিদ ও জীবগণেরও স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই, তাহারাও এক নিয়মের বশীভূত। যদি স্বতন্ত্র চেতনআত্মা ইচ্ছার কারণ হইত, তবে অবশ্য কোন না কোন সময়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত। ইচ্ছা জড় শক্তি জাত। মানব যে ইতর প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে কেবল তাহার শরীর-যন্ত্র অপর যন্ত্র অপেক্ষা নির্ম্মাণ-কুশল বলিয়া। যন্ত্রাধিক্যই মানবের প্রাধান্যের হেতু। মানবের যেমন বোধ ও জ্ঞান আছে, জড়েরও তাহা আছে—অল্পাধিক্য মাত্র। আর যদি তাহাই না থাকে, তাহাতেই দোষ কি? সকল পদার্থের সকল শক্তি থাকে না। পদার্থের চৈতন্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া; স্থূল বুদ্ধি উহার "জড়" নাম রাখিয়াছে। বস্তুত জড় শক্তির যে যে লক্ষণ, চৈতন্য শক্তিরও সেই সেই লক্ষণ। যাহাকে আত্মা বলা যায় সে কেবল জড়-জাত চেতন শক্তি বিশেষ—তাপাদির ন্যায় গুণ বিশেষ। ইহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে মানব জড় পদার্থ গঠিত সক্রিয় যন্ত্রবিশেষ।

৪। পূর্ব্বকাল ও পরকাল। যদি মৃত্যুর সঙ্গে শরীর উপাদান ধ্বংস হয়, তবে আত্মাও ধ্বংস হয়। কিন্তু পদার্থ যখন কিছুতেই ধ্বংস হয় না, তখন আত্মারও ধ্বংশ হয় না বলিতে হইলে। পদার্থ ধ্বংশ হয়, কিন্তু আত্মা ধ্বংশ হয় না এরূপ মত তিনি সমর্থন করেন না। তিনি একস্থলে লিখেন "বোধ হয় মানব মরিয়া মানব হইবার এক্ষণে অধিক সম্ভাবনা।" দুঃখের বিষয় এই মতের অকাট্য বৈজ্ঞানিকযুক্তি প্রদর্শন করেন নাই; কেবল মাত্র এই বলিয়াছেন যে জড়-আত্মা উদ্ভিদ হইয়াছে, উদ্ভিদ-আত্মা পর্য্যায়-ক্রমে মানব আত্মা হইয়াছে। এই কি যুক্তি? এই প্রবন্ধটী ভাল করিয়া পাঠ করিলে বুঝা যায় যে তিনি অনবধান বশতঃ প্রচলিত মতও মানিয়া গিয়াছেন, কেননা একস্থলে লিখেন যে "কার্য্য ও অবস্থাভেদ অনুসারে এ নিয়মের (অর্থাৎ পর্য্যায় ক্রমে মানব হওয়া) ব্যত্যয় হইবার সম্ভাবনা আছে"। এজন্য তাহার মতে অসামঞ্জস্য দোষ ঘটিয়াছে।

৫। ঈশ্বর। আস্তিকে বলে ঈশ্বর আছেন, নাস্তিকে বলে ঈশ্বর নাই। কিন্তু ঈশ্বর বস্তু কি? তাঁহার স্বরূপ কি? কেহ তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করেন না—স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন না। এজন্য ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। আমাদের বিবেচনায় ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিলেই উভয় পক্ষের বিবাদ মিটিয়া যায়—আস্তিকে নাস্তিকে মিল হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য ঈশ্বর কি? ঈশ্বর যদি "বস্তু" বা "সত্বা" বা "কিছু" হন তাহা হইলে তিনি জ্ঞান বা বুদ্ধির বিষয় হইলেন; যদি জ্ঞান বা বুদ্ধির বিষয় হন, তবে তাঁহাকে জানিবার জন্য জ্ঞান বা বুদ্ধিচালনা অর্থাৎ যুক্তি আবশ্যক। আর যদি "বস্তু" বা কোন "সত্বা" না হন, তাহা হইলে পাকতঃ তাহার বিদ্যমানতাই অস্বীকার করা হইল। যখন ঈশ্বরের সত্বা আছে বলা হইল, তখন তিনি কোন প্রকার (অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয়) "বস্তু" বা "কিছু" বলিতেই হইবে—নতুবা আর কি বলিব? তবে সেই বস্তু সামান্য ইন্দ্রিয় গোচর বস্তুর মত হইবে এমন নয়—পরমাণু, শক্তি প্রভৃতির ন্যায় হইতে পারে। এই অর্থে তাঁহাকে "বস্তু" বলা গেল। অতএব তাঁহার সত্বা থাকিলে, তিনি যে এক প্রকার বস্তু তাহা স্বীকার্য্য। এজন্য সূক্ষ্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি ঈশ্বর নির্ণয়ের জন্য যুক্তির সাহায্য লয়েন—বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করেন। কিন্তু

স্থূলদর্শী ব্যক্তি যুক্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন। ভক্তিমার্গ উপলব্ধ ঈশ্বরের সহিত যুক্তিমার্গ উপলব্ধ ঈশ্বর মিলে না, এজন্য পরস্পরের এত মত ভেদ! কিন্তু বাস্তবিক দ্বন্দ্বের কোন কারণ নাই। সাধারণতঃ যাহা কিছু অনুসন্ধান করা যায়, তাহার সত্বা বা বস্তুত্ব অগ্রে স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তৎপরে তাহার সত্বা বাস্তবিক আছে কি না সাব্যস্ত করিতে হয়। ইহা সাব্যস্ত করিতে হইলে যুক্তিমার্গ অবলম্বনীয়—বিজ্ঞানশাস্ত্র তাহার উদাহরণ স্থল। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ভক্তি-মার্গ পরিত্যজ্য। বিশেষতঃ ভক্তি সংস্কারমূলক, অতএব কুসংস্কার সংমিশ্রণ সম্ভাবনা।

এই ঈশ্বর বস্তুকে বিবিধ কল্পনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বীরেশ্বর বাবু দুইটী দার্শনিক কল্পনা বিবৃত করিয়াছেন। একবিধ ঈশ্বর এই যে, তিনি সগুণ—অসীম অনন্ত গুণ বিশিষ্ট। সদ্‌গুণের সমষ্টি, অসদ্‌গুণের নয়। এই সকল গুণ ভাববাচক, অভাববাচক নয়। তাঁহার অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দয়া আছে। তিনি প্রকৃতি অতীত স্বতন্ত্র পুরুষ, একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিশ্বনিয়ন্তা। এইটী প্রচলিত ঈশ্বর। ইহার সত্বা বীরেশ্বর বাবু অস্বীকার করেন। তিনি বলেন "প্রচলিত ঈশ্বর মানবের মনঃ কল্পিত" এবং ঈশ্বরে আরোপিত গুণের পরস্পর সামঞ্জস্য নাই। সগুণ ঈশ্বর অসিদ্ধ, ঈশ্বরে যে গুণ আরোপ করা হইয়াছে সে মানবীয় গুণ। মানব ঈশ্বর অপেক্ষা নিকৃষ্ট, অতএব ঈশ্বরকে মানব গুণ সম্পন্ন করাতে তাঁহাকে নিকৃষ্ট করা হইয়াছে। এই অপরাধে সাকার ও নিরাকার উভয় বাদীই দোষী। তিনি লিখেন "যে নিরাকারবাদীরা সাকারবাদীদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করেন। তাঁহারাও যে পৌত্তলিক তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না, তাহারা মানবীয় শারীরিক ধর্ম্ম ঈশ্বরে আরোপ করেন নাই বটে, কিন্তু মানসিক গুণ সকল অবিকল তাঁহাতে প্রদান করিয়াছেন, মানবের ন্যায় তাঁহার ইচ্ছা, প্রিয়াপ্রিয় কার্য্য, কৃতজ্ঞতাভিলাষ, তোষামোদ প্রিয়তা, দণ্ড, পুরস্কার, দানশীলতা, জ্ঞান, প্রভৃতি সমুদয় মানবীয় মানসিক ধর্ম্ম তাঁহাতে কল্পিত করিয়াছেন"। তিনি দেখাইয়াছেন যে প্রকৃতিতে যেমন জ্ঞানের পরিচয় আছে তেমনি অজ্ঞানেরও পরিচয় আছে, যেমন দয়ার পরিচয় আছে তেমনি নির্দ্দয়তার ও পরিচয় আছে, যেমন কৌশলের পরিচয় আছে, তেমনি অকৌশলের ও পরিচয় আছে। ঈশ্বরই যেখানে একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিশ্বনিয়ন্তা সেস্থলে তাঁহার শক্তি, জ্ঞান ও দয়ার সামঞ্জস্য করা যায় না। সামঞ্জস্য দূরে থাকুক তাঁহাতে বিপরীত গুণ আছে প্রমাণিত হয়। ঈশ্বর সমদর্শী অথচ ভক্ত বৎসল! অসীম ন্যায়পর অথচ পরমকারুণিক! একইবস্তু একই সময়ে অসীম শীতল ও অসীম উষ্ণ! ঈশ্বরকে সদ্‌গুণ সমষ্টি করাতে, তদবিপরীত গুণ সমষ্টিও করা হইয়াছে।

অন্যবিধ ঈশ্বর এই যে, তিনি নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্গুণ, ও নিষ্ক্রিয়। এটীও বোধ হয় বীরেশ্বর বাবুর মতে "প্রচলিত ঈশ্বর"। এরূপ ঈশ্বরের সত্বাও তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন উপরুক্ত "সকল গুণ গুলিই অভাববাচক হইল। ঈশ্বরের আকার নাই, গুণ নাই, অবস্থান্তর নাই, কার্য্য নাই, তবে আছে কি? ঈশ্বর আছেন, অথচ অস্তিত্ব ব্যঞ্জক কিছুই তাহার নাই, সুতরাং ঈশ্বর নাই অথবা ঈশ্বরকে মানব জ্ঞানের বহির্ভূত ও মানবের সহিত সম্বন্ধ শূন্য বলা হইল। আকার হীন, গুণ হীন, অবস্থান্তর বিহীন, ও কর্ম্ম

শূন্য পদার্থ বা কিছু সম্ভব হইতেই পারে না, যদিও পারে তাহা হইলে তাহার কোন কার্য্যই হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর নির্ব্বিকারাদি গুণ সম্পন্ন হইলে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা বা পূর্ব্বোল্লিখিত রূপ সেবাতোষ, করুণা নিধান, স্বর্গ নরক বিধাতা প্রভৃতি হইতে পারেন না। আর যদি তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা আদি হয়েন, তবে নির্ব্বিকারাদি হইতে পারেন না"।

উপরোক্ত দ্বিবিধ ঈশ্বর প্রকৃত ঈশ্বর নয়, বলিয়াছেন। তবে কি ঈশ্বর মূলেই নাই? গ্রন্থকার বলেন আছেন—প্রকৃতির নিত্যাবস্থাই ঈশ্বর, পরমাণুপুঞ্জই ঈশ্বর, অব্যক্ত প্রকৃতিই ঈশ্বর, প্রকৃতি নিহিত শক্তিই ঈশ্বর। প্রকৃতি অতীত কোন স্বতন্ত্র শক্তি বা ঈশ্বর নাই। প্রকৃতিই ঈশ্বর, প্রকৃতিই বিশ্ব—প্রকৃতিই সমস্ত! প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থাই ঈশ্বর, অব্যক্ত পরমাণু বা শক্তিপুঞ্জই পরব্রহ্ম। ব্যক্ত অবস্থাই বিশ্ব। এতদ্‌সম্বন্ধে তিনি লিখেন, "ঈশ্বরানুসন্ধানের মূল কারণ এই যে অনিত্য হইতে নিত্য অন্বেষণ করা। আমরা যাহা দেখিতেছি তৎসমস্তই অনিত্যাবস্থা অথচ নিত্য সম্বন্ধ; সেই নিত্যাবস্থা ঈশ্বর, ও অনিত্যাবস্থাই বিশ্ব। সুতরাং ঈশ্বর ও বিশ্ব স্বতন্ত্র না হইয়াও ভিন্ন, অগ্নি ও দাহিকা শক্তি যেরূপ ভিন্ন, জল ও শৈত্য যেরূপ ভিন্ন, চুম্বক ও আকর্ষণ শক্তি যেরূপ ভিন্ন সেইরূপ ভিন্ন"। সকলই ঈশ্বর বা শক্তিময়—যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বর, ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই সর্ব্বেশ্বরবাদ ভারতে শঙ্করাচার্য্য ও ইউরোপে স্পিনোজা (Sponaza) প্রচার করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মতে এই মূল-প্রকৃতি, প্রকৃতি-শক্তি বা বিশ্ব-শক্তি (যাহাই বলুন) নিরাকার, নির্ব্বিকার ও নির্গুণ এবং এই শক্তির সত্বা কেবল কল্পনা বা অনুমান (Hypothesis) মাত্র—বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। এই শক্তিটী কি, তাহা কেহ জানে না।

গ্রন্থকার যাহাকে নাস্তিকতা বলেন তৎপ্রতিপাদক যুক্তিই দেখাইয়াছেন, আস্তিকতা প্রতিপাদক অর্থাৎ তাঁহার স্বীকার্য্য ঈশ্বর স্থাপন সম্বন্ধে কোন যুক্তি দেন নাই—প্রকৃতির নিত্যাবস্থাই ঈশ্বর এই কথা বলিয়াছেন মাত্র। ইহাতে এই বুঝায় যে, প্রকৃতি শক্তিকে "ঈশ্বর" আখ্যা দিলেন—মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, তাড়িত শক্তি, প্রভৃতিকে তদাখ্যা দিলেন না। কিন্তু ঐ শক্তিকে "ঈশ্বর" উপাধি বা আখ্যা দিলে কি ধর্ম্মের শেষ মীমাংসা হইল?

এই শক্তিটী যদিও এক্ষণে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই, তত্রাচ ঐ শক্তির সত্বা আস্তিক নাস্তিক উভয়েই স্বীকার করেন (যদিও উভয়ই ঐ শক্তির কিছুই জানেন না)। তবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এত বিবাদ কেন? নাস্তিক প্রকৃতিকে প্রকৃতি শক্তি বলিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। আস্তিক ঐ শক্তিকে ভিন্ন আখ্যা, ভিন্ন পদবীতে, ভিন্ন উপাধিতে বরণ করেন—মানবীয় গুণ দ্বারা সাজাইয়া "ঈশ্বর" আখ্যা দেন—শক্তিকে তখন শক্তি মনে করেন না—তখন তাহাকে দেবতা রূপ ধারণ করান। বস্তুতঃ কবি কল্পনার শক্তিকে মানবীয় গুণ বিশিষ্ট করাতে উভয় পক্ষে এত বিবাদ। ঘুড়ীকে ঘুড়ী বলিলেই হয়—কিন্তু ইহাকে মানবীয় গুণ বিশিষ্ট করিয়া মানব, দেবতা, অথবা ঈশ্বর বলিলেই অকথা উক্তি করা হইল, শক্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ। অর্থ ও বিদ্যাকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী আখ্যা

দিয়া মানবীয় গুণে রঞ্জিত করিলে, অর্থ ও বিদ্যা কামিনী রূপ ধারণ করিবে এবং মানব স্বভাব প্রাপ্ত হইবেন, এটী কেবল কল্পনা মাত্র। তেমনি বিশ্ব-শক্তিকে "ঈশ্বর" আখ্যা দিয়া মানবীয় গুণে সজ্জিত করিলে সেটী বিশ্ব-শক্তি বই আর অন্য কিছু হইবে না। সে শক্তিটী আপন স্বভাব ছাড়িয়া তোমার ইপ্সিত স্বতন্ত্র স্বভাব ধারণ করিবে না। একপক্ষ যুক্তির সাহায্যে যথাযথ বর্ণন করিতে চায়, অপর পক্ষ ভক্তি গদ গদ চিত্তে কবি-কল্পনা ও কাব্যালঙ্কারে ঐ শক্তিকে কল্পিত গুণে ভূষিত করে; এজন্যই এত মতভেদ। সূক্ষ্ম বিবেচনায় ঈশ্বরের বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই পক্ষই এক মতাবলম্বী। উভয় পক্ষই শক্তির নিগূঢ়তত্ত্ব জানেন না, এবং না জানিয়াও তাহার অস্তিত্ব স্বীকার্য্য বলিয়া ধরিয়া লয়েন। উভয়ই যখন অজ্ঞ তখন এত বিবাদ কেন?

৫০ পৃষ্ঠায় ঈশ্বর উপাসনার অযৌক্তিকতা ও নিষ্ফলতা প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু আবার ৬৫ পৃষ্ঠায় তদাবশ্যকতা স্থির করা হইয়াছে। "পূর্ব্ব ও পর সন্ধ্যারাগ রঞ্জিত মনোহর কালে অভিনিবেশ পূর্ব্বক পরম পরাৎপর বিশ্ব-দেব ব্রহ্মের উপাসনা" করিতে গ্রন্থকার আদেশ করিয়াছেন। একটী স্তবও বিন্যস্ত করিয়াছেন এবং বলেন তাহার "মর্ম্মার্থ বুঝিয়া পাঠ করিলে মৃত্যু ভয় থাকে না" ও সংসারে "জয়ী—" হইতে পারিবেন। আমরা এই উভয় মতের সামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহার মতে যদি ঈশ্বর শুদ্ধ বিশ্ব-শক্তি মাত্র হন,—ঈশ্বর যদি জড়জাত শক্তিই হন,—জীব ব্রহ্মে যখন অভেদাত্মা প্রকৃতি-শক্তিই হন, ঈশ্বরে মানবে কোন প্রভেদ না থাকে—তবে উপাসনার আবশ্যকতা কি? কল্পনা-সুখ ব্যতীত উপকারই বা কি? আর, বিশ্ব-শক্তি ভাবনাই যদি "উপাসনা" হয়, তবে যে শক্তি "অচিন্ত্য" বলিয়াছেন তাহা ভাবনার বিষয় কিরূপে হইবে? আর, ভাবনার বিষয় হইলেই কল্পনা-সুখ ব্যতীত উপকারই বা কি ঈশ্বর কল্পনা কি মনস্তুষ্টি জনক চিন্তা-সুখের জন্য? এরূপ ভাবনার যুক্তি বা সার্থকতা প্রতিপাদন করেন নাই। বিশ্ব-শক্তি যতক্ষণ বিশ্ব-শক্তি বলিয়া ভাবনা করা যায়, তখন আর তাহাকে "উপাসনা" করা যুক্তি সঙ্গত ও আবশ্যক হয় না, কারণ তাহাতে মনস্তুষ্টি ব্যতীত আর কোন ফলই নাই। আর্ষকণ শক্তি বা তাড়িত শক্তিকে উপাসনা করিলে বাঞ্ছিত ফল হয় না কেন? যখন ইহাতে ফল নাই তখন ঈশ্বর নামধেয় বিশ্ব-শক্তিকে উপাসনা করিলে কি ফল হইবে? আর যদি সেই শক্তিকে মানবীয় গুণে সজ্জিত কর, তাহা হইলে সেই শক্তিটি কি আপন স্বভাব ছাড়িয়া তোমার প্রার্থনা পূরণ জন্য ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করিয়া প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিবে?

তিনি একস্থলে লিখেন "আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বর-তত্ত্ব একই কথা"। "আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইবার শক্তি এই বিশ্ব মধ্যে কাহারও নাই"। কিন্তু তদবিপরীত ভাবও আর এক স্থানে পাওয়া যায়—"প্রকৃত ঈশ্বর তত্ত্ব কেবল আর্য্য ঋষিরা বুঝিয়াছিলেন"। আরও লিখেন কি সাকারবাদী, কি নিরাকারবাদী, কি দ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী, কি আস্তিক, কি নাস্তিক সকলকেই তিনি (ঈশ্বর) সমান চক্ষে দর্শন করেন ও সকলকেই সমানরূপ উদ্ধার করেন"। আস্তিক নাস্তিকের পরিণাম ত একই হইল! যদি তাহাই হয়, তবে উপাসনার আবশ্যকতা কি?

৬। **জ্ঞান ও বিশ্বাস।** এক সাম্প্রদায়ের মতে জ্ঞান সহজাত; অপরের মতে জ্ঞান অর্জ্জিত। বীরেশ্বর বাবু শেষটী সমর্থন করিয়াছেন। জ্ঞান মানোবৃত্তি বা মানসিক শক্তি বিশেষ নহে। কোন বিষয় জানার নাম জ্ঞান—বিষয়ের গোচর না হইলে তৎ সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না। যদিও মানব-প্রকৃতিতে জানিবার শক্তি নিহিত আছে বটে, কিন্তু ঐ শক্তি স্বয়ং কোন বিষয় জানিতে পারে না—ইহা ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ। যাহা ইন্দ্রিয় গোচর নয় তাহা বুদ্ধি বা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। এজন্য ঈশ্বরও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না। ঈশ্বর প্রদর্শক কোন স্বাভাবিক মনোবৃত্তি মানবের থাকিতে পারে না। বিষয়ের সত্য নিরূপণই প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞান পরীক্ষা সাপেক্ষ, চূড়ান্ত নয়। "জ্ঞানের ঐ পরীক্ষা নিরপেক্ষ অবস্থা অর্থাৎ কেবল মাত্র সংস্কারানুসারে যে জ্ঞান সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে ও যাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই বিবেচিত হইয়াছে তাহাই বিশ্বাস পদ বাচ্য। জ্ঞানের বিরুদ্ধে যুক্তি শ্রবণ যোগ্য, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তি অগ্রাহ্য; জ্ঞান পরিবর্ত্তসহ এজন্য চঞ্চল, বিশ্বাস চূড়ান্ত এজন্য দৃঢ়; জ্ঞান চঞ্চল বিষয় হৃদয়ে দৃঢ় সম্বন্ধ নহে, বিশ্বাস দৃঢ় বিষয়ে দৃঢ় সম্বন্ধ হইয়া স্বভাব বা সংস্কারের ন্যায় হইয়া যায়; জ্ঞান চক্ষুষ্মাণ, বিশ্বাস অন্ধ; জ্ঞান উন্নতিশীল, বিশ্বাস স্থিতিশীল; জ্ঞান সত্যনিষ্ঠ, বিশ্বাস ভক্তিনিষ্ঠ"। গ্রন্থকার তুলনায় জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন বটে কিন্তু বিশ্বাসেরও গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। জ্ঞান চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য, বিশ্বাস অপামর সাধারণ লোকের জন্য।

আমরা প্রবন্ধের প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মানব কি, কোথা হইতে আইল, কোথায় যাইবে এবং তাহার কর্ত্তব্যই বা কি? এক্ষণে "মানবতত্ত্বে" এই সকল প্রশ্নের কি উত্তর পাইলাম, মানব কি? এই প্রশ্নের উত্তরে জানিতে পারিলাম, মানব জড়-পদার্থ গঠিত সক্রিয় যন্ত্র বিশেষ (Automatum) মানব কোথা হইতে আইল? মানব স্বয়ম্ভূ বা প্রকৃতি-প্রসূত—অজ্ঞাত প্রাকৃতিক-শক্তি সমুদ্ভূত। জড়-শক্তি অতীত স্বতন্ত্র "ঈশ্বর' দ্বারা সৃষ্ট নয়। মানব কোথায় যাইবে? মানব ব্যতীত অন্যান্য জড়-পদার্থের যে গতি যে পরিণাম, মানবেরও তাহাই। অন্যান্য জড় পদার্থ যদি ধ্বংস না হয় মানবও ধ্বংস হইবে না; আর ঐ সকল যদি নষ্ট হয়, মানব ও নষ্ট হইবে—মানবের কর্ত্তব্য কি? মানব যখন প্রকৃতি অতীত স্বতন্ত্র ঈশ্বরদ্বারা সৃষ্টি হয় নাই এবং তাঁহার সত্বা নাই প্রমাণিত হইল তখন মানব জীবনের উদ্দেশ্যত এ প্রকার ঈশ্বর উপাসনা বা তদীয় আদেশ পালন হইতে পারে না। তবে মানবের কর্ত্তব্য কি? সমস্ত বিশ্বই যখন ঈশ্বর তখন পার্থিবিক সুখই মানবের উদ্দেশ্য—তৎসাধনাই তাহার কর্ত্তব্য! জ্ঞান ও নীতির উৎকর্ষ সাধনই কর্ত্তব্য। জ্ঞানালোচনা, পরোপকার, বিশ্ব প্রেম, সমাজ কুশলতা, চরিত্র মাধুর্য্য অন্তর-সৌন্দর্য্য প্রকৃতির সাধনাই তাহার কর্ত্তব্য।" বীরেশ্বর বাবুর মতে এইটী কি হিন্দু ধর্ম্মের মত—হিন্দু সাধারণ কি এই মত মানিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। যদি তিনি এই মতটিকে হিন্দু ধর্ম্ম-মত বলেন তাহা হইলে বড় ভুল বলা হইয়াছে। এটী সর্ব্ব সাধারণ গ্রাহ্য বা আচ-

রিত হিন্দু ধর্ম্ম নয়, এটী একটী দার্শনিক মত মাত্র। বীরেশ্বর বাবু কি এই মতটীকে হিন্দু ধর্ম্মের মত বলিয়া বঙ্গ যুবককে অবলম্বন করিতে এত অনুরোধ করিতেছিলেন?

উপরোক্ত কয়েকটী পরিচ্ছেদে ধর্ম্মতত্ত্ব শেষ হইল। তাহার পর কয়েক পরিচ্ছেদে সমাজতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। সত্বসাম্য ও স্বাধীনতা, কর্ত্তব্য নিরূপণের উপায় শিক্ষা ও শাসন সভ্যতা স্ত্রীস্বাধীনতা, অন্তঃপুর, বিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি দক্ষতার সহিত লেখা হইয়াছে ইহার মধ্যে অনেকগুলি প্রতিবাদ-যোগ্য। সময়ন্তরে এ বিষয়ে সমীচীন সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু এক্ষণে এই মাত্র বলা যায় যে গ্রন্থকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ উদার ও কুসংস্কার বিরহিত, সমাজ সম্বন্ধে ততটা নয়। ধর্ম্ম প্রকরণগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে।

বীরেশ্বর বাবু এক জন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত। তাঁহার মানবতত্ত্ব বঙ্গভাষার মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। সংক্ষেপের মধ্যে পারিপাট্যের ও দক্ষতার সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন—দুরূহ ভাব সকল অতি সরল ও সুললিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থ খানিতে তাহার লিপিচাতুর্য্য ও স্বাধীন চিন্তার ভূরি ভূরি পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষায় এ বিষয়ে এরূপ পুস্তকের অভাব ছিল, বীরেশ্বর বাবু এই অভাব কতক পরিমাণে মোচন করিয়াছেন। তিনি যে গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে মত ভেদ হইবেই হইবে—পৃথিবীতে ধর্ম্ম ও সমাজ তত্ত্বের ন্যায় জটিল আর কিছুই নাই—বস্তুতঃ এবিষয়ে সর্ব্ববাদী সম্মত শেষ মীমাংসা হয় নাই ও হইবার সম্ভাবনাও নাই, অতএব মতভেদ থাকিলে গ্রন্থখানি মন্দ হইল এমন বিবেচনা করা নিতান্ত অসার বুদ্ধির কার্য্য। আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত—মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া স্বাধীন ভাবে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে পাঠকের অনেক কুসংস্কার দূর হইতে পারে।

মধুমক্ষিকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জীব জগতে শ্রমের মধ্যে মধ্যে বিরামের আবশ্যক; কোন প্রাণীই অবিরাম শ্রম করিতে সমর্থ নহে। মধুমক্ষিকাগণকেও অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় সময়ে সময়ে নিদ্রা যাইতে দেখা যায়। বহু পরিশ্রমী কর্ম্মকরগণ অবিরাম পরিশ্রমে ক্লান্ত হইলে কর্ম্মকরগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া পনের অথবা কুড়ি মিনিট কাল নিস্পন্দ ভাবে অবস্থান করে; তখন ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে কোন প্রকার জীবনের লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, কেবল মাত্র নিশ্বাস প্রশ্বাসে শরীরের পার্শ্বদ্বয় কিয়ৎপরিমাণে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে দেখা যায়; মধ্যাহ্নকালই ইহাদের বিশ্রামের প্রধান সময়। অলস পুংমক্ষিকাগণ সময়ে সময়ে আঠার অথবা কুড়ি

ঘণ্টাকাল নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে; কর্ম্মকর দিগের ন্যায় ইহারা কোন গৃহে প্রবেশ করে না; মধুচক্রের উপরিভাগে গৃহভিত্তিতেই সুখে নিদ্রা যায়। রাজ্ঞী কখন কখন পুংডিম্বগৃহে মস্তক ও বক্ষোদেশ প্রবেশ করাইয়া দিয়া বহুক্ষণ নিদ্রিত থাকে। তৎকালে কতকগুলি কর্ম্মকর, প্রহরী ও সহচরীরূপে চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক স্ব স্ব সম্মুখ পদদ্বয় দ্বারা সুষুপ্তা রাজ্ঞীর উদরের অনাবৃতাংশ অতি মৃদুভাবে স্পর্শ করিতে থাকে। রাজ্ঞীর সুষুপ্তির নিমিত্ত নিঃস্বার্থ কর্ম্মকর দিগের ঈদৃশ যত্ন সন্দর্শন করিলে কাহার না হৃদয় অভূতপূর্ব্ব পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হয়?

সুসভ্য মানব বায়ুমান যন্ত্রের পারদসমতলের সহসা উত্থান ও অধোগমনাদি সন্দর্শন করিয়া আগামী দিবসের বাতবৃষ্টি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে কথঞ্চিৎ সক্ষম। কিন্তু মধুমক্ষিকাগণ সংস্কারবলে ভবিষ্যৎদিবসের অবস্থা সুন্দররূপে জানিতে পারে। তাহারা আগামীদিন দুর্দ্দিন হইবে জানিতে পারিলে মধুসঞ্চয়ের নিমিত্ত বহুদূর গমন করে না; মধুচক্রের সন্নিহিত বৃক্ষাদি হইতেই মধুসঞ্চয় করিয়া থাকে। ডাক্তর ইভান্স বলেন, যে একদা আকাশ অতি নির্ম্মল ও মেঘশূন্য থাকিলেও একটীও মধুমক্ষিকা মধুসঞ্চয়ের নিমিত্ত দূরে গমন করিল না; ইহাতে তাঁহার মনে বিস্ময় ও সন্দেহের আবির্ভাব হইল, অনিমিষ নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিছুক্ষণ পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড আকাশের এক প্রান্ত হইতে উদিত হইয়া ক্রমে গগণমণ্ডল আবৃত করিয়া ফেলিল। এতদ্দর্শনে ডাক্তর ইভান্স অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। তৎকাল হইতে তিনি মধুমক্ষিকার এই সংস্কারকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

মানবগণের ন্যায় মক্ষিকাগণও আবশ্যক হইলে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে মধুক্রমে একাধিক রাজ্ঞীর আবির্ভাব হইলে মক্ষিকাসমাজ ক্ষণকালের নিমিত্ত ও শান্তভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না। কখন কখন উভয় রাজ্ঞীর মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, কখন কখন বা কতকগুলি মক্ষিকা অন্যতমা রাজ্ঞীর সহিত অন্যত্র উপনিবেশ সংস্থাপন করে। সচরাচর প্রাচীনারাজ্ঞীস্থাপিত উপনিবেশ অপেক্ষা নবরাজ্ঞীস্থাপিতউপনিবেশ আদি মধুচক্রের অধিকতর দূরে অবস্থিত হয়, কারণ কুমারী রাজ্ঞীর ন্যায় প্রাচীনারাজ্ঞী বহুদূর উড়িয়া যাইতে পারে না। এই সকল উপনিবেশের সংখ্যা তৎকালের ঋতু ও বিকসিত-পুষ্প বৃক্ষের সংখ্যানুসারে ন্যূনাধিক হইয়া থাকে। নিকটে উপনিবেশ স্থাপনের উপযুক্ত বা মনোমত স্থান প্রাপ্ত না হইলে মধুমক্ষিকাগণ সমুন্নত পর্ব্বতশ্রেণী ও বৃহৎ নদ নদী অতিক্রম পূর্ব্বক শতমাইল দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যে ইহারা কখন কখন নীলগিরির অভ্রভেদী শৃঙ্গ অতিক্রমপূর্ব্বক ক্রমাগত আট দশদিন কাল উড্ডয়ন করিয়া থাকে। অনেক জাতীয় মধুমক্ষিকা কোন কোন জাতীয় পক্ষীর ন্যায় বারমাস একস্থানে বাস করে না। ভারতবর্ষীয় এক প্রকার মধুমক্ষিকা (Apis Indica) এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। ইহারা গ্রীষ্মকালে সমতল ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করে এবং অগ্রহায়ণ মাসে প্রতিনিবৃত্ত হয়। এতদভিন্ন মকরন্দপূর্ণ কুসুমের অভাব হইলে, মধুক্রম লুণ্ঠিত হইলে, মধুপানে মধুভাণ্ডার

শূন্য হইলে, বহুশত্রুর প্রাদুর্ভাব অথবা আপনাদের সংখ্যা সমধিক বৃদ্ধি হইলেও মধুমক্ষিকাগণ স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে।

মধুমক্ষিকার একমাত্র অস্ত্র—হুল; —নিসর্গপণ্ডিত মধুমক্ষিকাগণ অসহায় শিশুদিগকে ও বহু পরিশ্রমে সংগৃহীত মহামূল্য মধু ভাণ্ডার রক্ষার নিমিত্ত প্রকৃতিদেবীর নিকট হইতেই এক ভীষণ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মহাস্ত্র আছে বলিয়াই ইহারা শত শত শত্রু পরিবৃত হইয়াও অনেকাংশে নিরাপদে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়; অন্য শত্রুর কথা দূরে থাকুক, মনুষ্যও সহসা অপরিচিত মধুচক্রের সমীপবর্ত্তী হইতে সাহসী হয় না। মধুমক্ষিকাদিগের এই মহাস্ত্র প্রচলিত ভাষায় "হুল" নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। সাধারণ লোকের এই প্রকার বিশ্বাস যে, মধুমক্ষিকা কুক্কুরাদি জীবের ন্যায় শত্রুকে দংশন করিয়া থাকে; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। মধুমক্ষিকা কাহাকেও দংশন করে না; নিতান্ত উত্তেজিত হইলে শত্রুর গাত্রে হুল ফুটাইয়া দেয়। এই হুলরূপ ভয়ঙ্কর অস্ত্র ইহাদের শরীরের পশ্চাদ্ভাগে, উদরের শেষাংশে অবস্থিত। ইহা পরস্পরের অতি সন্নিহিত কেশাপেক্ষা সূক্ষ্মতর দুইটী শলাকামাত্র। শলাকা দুইটীর গাত্র অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণ্টক দ্বারা আবৃত। কণ্টকগুলি এত সূক্ষ্ম যে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে তাহাদের সত্বার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; এবং এই সকল কণ্টকের শেষ ভাগ মধুমক্ষিকার শরীরের দিকে বক্রীকৃত। হুল একটী দৃঢ় কোশ দ্বারা সুরক্ষিত। হুলের সহিত সংযুক্ত এবং তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অভ্যন্তর ভাগে অবস্থিত, মধুমক্ষিকার একটী বিষ কোশ আছে। এই বিষকোশ আছে বলিয়াই হুলফুটান বিশেষ কষ্টদায়ক হইয়া থাকে; বিষ না থাকিলে শুদ্ধ হুল কোন কার্য্যকর হইত না। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, সর্প দূষিত বাষ্প ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং এই দূষিত বাষ্প হইতেই জগতের মহাহিতাহিতের কারণ তদীয় মহাবিষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু মধুমক্ষিকা কোন বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করে না; মধুই তাহার প্রধান আহার; সুতরাং মধু হইতে বিষের উৎপত্তি অতীব আশ্চর্য্য জনক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু মধুমক্ষিকার বিষ সম্বন্ধে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মধুমক্ষিকার বিষের এতদূর তেজ, যে বিন্দুমাত্র কপোতাদি প্রাণীদিগকে ভক্ষণ করাইলে অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহাদের মৃত্যু হয়। মধুমক্ষিকার হুল ফুটাইবার পরক্ষণেই তাহার বিষকোষ হইতে এক বিন্দু বিষ তীব্রবেগে বহির্গত হইয়া আহত স্থানে পতিত হয়। আহত স্থান দেখিতে দেখিতে স্ফীত হইয়া উঠে এবং আহত প্রাণী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে।

মধুমক্ষিকা সন্তানপালন ও মধুভাণ্ডার রক্ষার নিমিত্তই উক্ত মহাস্ত্র লাভ করিয়াছে, অকারণে জীবগণকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত তাহাকে উক্ত মহাস্ত্র প্রদত্ত হয় নাই। এই নিমিত্ত মধুমক্ষিকাগণ নিতান্ত উত্তেজিত না হইলে কাহাকেও হুল বিদ্ধ করে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে হুলের গাত্রে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদরের দিকে বক্রীকৃত কতকগুলি কণ্টক আছে; এই সূক্ষ্ম কণ্টকগুলি সময়ে সময়ে মধুমক্ষিকার সর্ব্বনাশের মূল হইয়া উঠে, কারণ হুল-বিদ্ধ-জীবশরীর হইতে অতি আস্তে

আস্তে তুলিয়া না লইলে উক্ত কণ্টকগুলি মাংসে বদ্ধগতি হইয়া ছিন্ন হইয়া যায়। হুল ছিন্ন হইলে মধুমক্ষিকার অচিরে অপমৃত্যু হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই বোধ হয় মধুমক্ষিকাগণ, সংস্কারবশে সহসা হুল ব্যবহার করিতে উদ্যত হয় না। যখন তাহারা কুসুম কাননে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন পূর্ব্বক মধু ও পরাগ সঞ্চয় করিতে থাকে, তখন কোন জীবকর্তৃক অতিশয় ত্যক্ত হইলেও তাহার গাত্রে হুল ফুটাইয়া প্রতিশোধ লইতে প্রায়ই যত্নবান হয় না। কিন্তু মধুচক্রের নিকট কোন জীব উপস্থিত হইলে তাহার আর নিস্তার থাকে না; অসংখ্য মধুমক্ষিকা তাহাকে হুল বিদ্ধ করিয়া অনতিবিলম্বে শমনসদনে প্রেরণ করে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে পুংমক্ষিকা দিগের হুল নাই; ইহাদের হুল থাকিবার আবশ্যকতাও দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ ইহারা মধুভাণ্ডার রক্ষণাদি কার্য্যে কখনও প্রবৃত্ত হয় না। কর্ম্মকর দিগের হুল সরল; কিন্তু রাজ্ঞীর হুল বক্রাকৃতি ও তীক্ষ্ণ। কর্ম্মকর দিগের জীবন অপেক্ষা রাজ্ঞীর জীবন যেমন অধিকতর মূল্যবান, সেইরূপ হুল প্রয়োগ বিষয়ে কর্ম্মকর অপেক্ষা রাজ্ঞীকে অধিকতর সতর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ্ঞী, আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্ঞী ব্যতীত অন্য কাহারও গাত্রে কদাচ হুল ফুটাইয়া থাকে। মধুমক্ষিকা শরীরের কোন কোমলাংশে হুল ফুটাইলে সেই স্থান অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে এবং জ্বালাও কিছু অধিক হইয়া থাকে। ইহা দেখা গিয়াছে যে সর্ব্বপ্রথম মধুমক্ষিকা কতৃক হুল বিদ্ধ হইলে যে প্রকার যন্ত্রণা হইয়া থাকে, কয়েকবার হুল বিদ্ধ হইলে আর সে প্রকার কষ্ট বেশি হয় না। যাহা হউক অসাবধানতা বশতঃ অথবা মধুলোভে মধুচক্রের উপর হটাৎ পতিত হইলে অথবা তাহা বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিবার চেষ্টা পাইলে অনেক সময় বিপদগ্রস্থ হইতে হয়। অনেকে দিবাভাগে মৌচাক ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়া মধুমক্ষিকাগণ কর্ত্তৃক এককালে আক্রান্ত ও অচিরে নিহত হইয়াছেন। অনেক সময় অসাবধানতা বশতঃ মধুচক্রের উপর পতিত হইয়া অনেক গরু, গর্দ্দভ ও অশ্ব প্রাণ হারাইয়াছে। কিন্তু সাবধান পূর্ব্বক মৃদুভাবে হস্ত চালনা করিয়া আস্তে আস্তে কার্য্য করিলে বিপদের তত আশঙ্কা নাই। থর্লি সাহেব বলেন (১) যে একদা এক ঝাঁক মৌমাছিকে কোন বৃক্ষ শাখা হইতে মধুমক্ষিকাগৃহে স্থাপন করিবার সময় তাঁহার সহায়তার জন্য এক পরিচারিকা তাঁহার সহিত আসিয়াছিল; সে ভয়ে মস্তক ও স্কন্ধদেশ এক খানি বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়াছিল। মধুমক্ষিকা দিগকে বৃক্ষ শাখা হইতে স্থানান্তরিত করিবার সময় ঘটনাক্রমে রাজ্ঞীমক্ষিকা ভীতা পরিচারিকার মস্তোকোপরি উপবেশন করিল এবং ক্রমে বস্ত্রের নিম্ন দেশে গমন পূর্ব্বক তাহার মস্তক ও মুখমণ্ডল ও বক্ষঃ আবৃত করিয়া ফেলিল। আবক্ষঃমস্তক মক্ষিকাবৃতা পবিচারিকা প্রাণ ভয়ে ভীতা হইয়া দৌড়াইবার উপক্রম করিল; থর্লি তাহাকে স্থির হইয়া থাকিতে আদেশ করিলেন এবং ক্ষণ বিলম্ব

(1) Thorley.

ব্যতিরেকে রাজ্ঞীকে চিনিয়া লইয়া মধুমক্ষিকা গৃহে স্থাপন করিলেন; তুই তিন মিনিটের মধ্যে সকল মক্ষিকা তাহার গাত্র হইতে উড্ডীয়মান হইয়া রাজ্ঞীর নিকট গমন করিল! পরিচারিকা পরিত্রাণ পাইল—তাহার গাত্রে একটীও মক্ষিকা হুল ফুটায় নাই। কিন্তু যদি সে স্থিরভাবে অবস্থান না করিয়া ভয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্ষেপপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিত তাহা হইলে সে কখনই নিস্তার পাইত না।

ট্যালবট্ সাহেব লিখিয়াছেন (২) যে ১৮২০ খৃঃঅব্দে ক্যানেডা প্রদেশে কোন মক্ষিকা পালকের বিংশতি মধুমক্ষিকাগৃহ উদ্যান মধ্যে স্থাপিত ছিল। গ্রীষ্মকালে একদিন কোন প্রতিবেশীর অশ্ব সমীপস্থ মাঠে ঘাস খাইতেছিল। ঘাস খাইতে খাইতে অশ্বটি একটী মক্ষিকা গৃহের সমীপবর্ত্তী হইল, এবং অল্পক্ষণ মধ্যে পদচালনা করিতে করিতে গৃহটি উল্টাইয়া ফেলিল; অমনি দলে দলে মধুমক্ষিকা বহির্গত হইয়া অশ্বের পদে হুল ফুটাইতে লাগিল; অশ্ব যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বেগে পদচালনা করিতে করিতে আর একটী মক্ষিকা গৃহ স্থানচ্যুত করিলে, তাহা হইতেও শত শত মধুমক্ষিকা বহির্গত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। অশ্ব ভূমে পতিত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল এবং পাঁচ মিনিটের অনধিক কাল মধ্যে মধুমক্ষিকাবিষে জর্জ্জর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

বিখ্যাত স্কচ্ ভ্রমণকারী মঙ্গোপার্ক আফ্রিকাভ্রমণ কালে মধুমক্ষিকা কর্ত্তৃক কয়েকবার অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। (৩) একদা তাঁহার অনুচরবর্গ মধু অন্বেষণ করিতে করিতে দুর্ভাগ্যক্রমে এক বৃহৎ মধুচক্র প্রাপ্ত হইল। কিপ্রকারে মধুচক্র ভঙ্গ করিয়া মধু আহরণ করিলে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে কার্য্য সমাধা হইতে পারে, তাহা তাহারা জানিত না; সুতরাং বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক মধু আহরণ করিতে উদ্যত হইল। অবিলম্বে সহস্র সহস্র কর্ম্মকর ক্রোধভরে মধুচক্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। অনতিদূরে কতকগুলি ভারবাহী গর্দ্দভ ও কয়েকটী অশ্ব চরিতেছিল, মধুমক্ষিকাগণ তাহাদিগকেও আক্রমণ করিল। মনুষ্য, অশ্ব, গর্দ্দভ যে যেদিকে পাইল, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই নিরাপদে পলাইতে পারিল না, সকলেই অল্প বা অধিক পরিমাণে আহত হইল। সন্ধ্যাকালে মক্ষিকাগণ কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিলে সাহেবের অনুচরবর্গ পলায়িত অশ্ব ও গর্দ্দভদিগকে একত্র করিবার অবসর পাইল; অনেক অনুসন্ধানেও তাহারা তিনটি গর্দ্দভের কোন সন্ধান পাইল না। এতদ্ব্যতীত তুই দিনের মধ্যে তিনটী গর্দ্দভও একটী অশ্ব বিষের জ্বালায় প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপ সময়ে সময়ে মনুষ্য ও ইতর প্রাণিদিগের অনবধানতা অথবা অজ্ঞানতা বশতঃ বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

মধুমক্ষিকার হুলফুটানর জ্বালা ও স্ফীততা নিবারণের নিমিত্ত বিবিধ প্রকার সামান্য ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং সকলগুলি হইতেই প্রায় অল্প বা অধিক পরিমাণে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। অ্যামোনিয়া, গোময় অথবা তামাক ক্ষত স্থানে লেপন করিলে

(2) Five years' Residence in the canadas.
(3) The life and Travels of Mungo Park, American Edition. P P 148, 178, 179.

অনেক সময় যন্ত্রণার উপশম হয়। খসিয়াপর্ব্বতবাসীরা ক্ষতস্থানে পান লাগাইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের মতে মর্দ্দিত তেঁতুল পত্র চতুর্গুণ ওজনের জলে সিদ্ধ করিয়া, সেই জলে স্নান করিলে সকল জ্বালা ও স্ফীততা নিবারণ হয়। হোমিওপ্যাথি মতে গুয়ে বাবলার ((Acacia Farnesiana.) W. শিকড়ের রস হুলফুটানর এক মহৌষধ; কোন কোন কবিরাজের মতে সৈন্ধব লবণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিলে উপকার দর্শিয়া থাকে। জ্বালার প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া তাহা ভুলিয়া যাওয়াই আমেরিকানদিগের মতে জ্বালা নিবারণের এক মহৌষধ!

ক্রমশঃ

শ্রীকালীকৃষ্ণ বসাক।

আর্য্যজাতির ন্যায়শাস্ত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ন্যায় শাস্ত্রের মতে গুণবিশিষ্ট বা গুণ ও কর্ম্ম বিশিষ্ট যাহা তাহাই দ্রব্য শব্দ বাচ্য। এস্থলে কেহ কেহ কহিতে পারেন যে আমরা যদিও দ্রব্য ও গুণকে পরস্পর স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিতেছি ও তদনুসারে সংসারের সমুদায় কার্য্য চালাইতেছি তথাপি যখন আমরা গুণকে দ্রব্য হইতে বা দ্রব্যকে গুণ হইতে পৃথক্ দেখি নাই, সুতরাং তাহা ভাবিতেও পারিনা। তখন ইহাদিগকে পরস্পর নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র পদার্থদ্বয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারিনা। প্রত্যুত একরূপ বিবেচনা করিলে গুণকেই পদার্থ বলা যাইতে পারে। দ্রব্যকে পদার্থান্তর বলিয়া স্বীকার করার প্রয়োজন নাই। এ বাক্যের উত্তর এই যে গুণাতিরিক্ত দ্রব্যের প্রতীতি হওয়া স্বতঃ সিদ্ধ। কোন একটি গুণকে বা গুণের সমষ্টিকে দ্রব্য বলা যায় না, কিন্তু যাহার গুণ আছে তাহাকেই দ্রব্য বলা গিয়া থাকে। এই দ্রব্য জ্ঞান এরূপ স্বভাব সিদ্ধ যে "কাহার গুণ" "কাহার সংখ্যা" ইত্যাদি বাক্যে দ্রব্যেরই প্রাধান্য ও তাহার সহিত গুণের সম্বন্ধ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। দ্রব্য ব্যতিরিক্ত গুণের প্রতীতিই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

বৈদান্তিকেরা গুণেরও বাস্তবত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন গুণের প্রতীতি হওয়া বা না হওয়া কেবল আত্মারই ভাব। আত্মার অস্তিত্বে অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব ভ্রম হইতেছে। অর্থাৎ কোনও বস্তু না থাকিলেও কেবল আত্মার ভাবান্তর হেতুক বস্তু আছে বলিয়া বোধ হইতেছে। অর্থাৎ আত্মার ভাব সকলই আত্মাতে বস্তুরূপে আভাসমান হইতেছে। আত্মাতিরিক্ত পদার্থান্তর নাই। কিন্তু বৈদান্তিক দিগের এই মত স্বীকার করা যায় না। কারণ আত্মার এইরূপ ভাবান্তর যে স্বাধীন নহে, বা অকস্মাৎ উৎপন্ন নহে তাহা দেখা যাইতেছে, অন্যথা এক এক অবস্থায় একইরূপ প্রতীতি নিয়ত কখনই হইত না। যেমন যখন যখন গৃহের অভ্যন্তরে যাই তখন তখন একরূপ

প্রতীতি হয়; আবার যখন যখন বাহিরে যাই, তখন তখন আরএকরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। যখন যখন বাণ বিদ্ধ হই তখন তখন একরূপ প্রতীতি ও যখন যখন কোমল-করপল্লব গাত্রোপরি সঞ্চালিত হয় বা দুইয়ের কিছুই না হয় তখন তখন আর এক এক-রূপ প্রতীতি হয়। এরূপে দেখা যায় যে আত্মাতিরিক্ত পদার্থ আছে যাহার সন্নিকর্ষে ও অসন্নিকর্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব আত্মাতিরিক্ত পদার্থ আছে স্বীকার করিতে হয়। এখন সেই পদার্থ কি ইহা দেখিতে গেলে প্রথমতঃ দ্রব্যের উপর দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু দ্রব্য ও গুণ স্বতঃসিদ্ধ ও পরস্পর অভিন্ন ভাবে সংবদ্ধ। তাহা-দিকে প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করা ও তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত দুরূহ। যেমন বৃক্ষের সহিত মূল পত্র ত্বক্ সার ও তদীয় পরমাণু প্রভৃতি অভিন্ন ভাবে থাকে ও সেই মূল পত্রাদি সমুদায় ছাড়িয়া বৃক্ষ কি ইহাকে কেহ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারে না কিন্তু উহারা কি তাহা সকলেই জানে। আবার বৃক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন মূল পত্র প্রভৃতিকে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারা যায় না কিন্তু বৃক্ষের সহিত ঐ সকল সকলেই বুঝিতেছে। সেইরূপ দ্রব্য ছাড়িয়া গুণ ও গুণ ছাড়িয়া দ্রব্য কখনই বুঝা যায় না, কিন্তু গুণের সহিত দ্রব্যকে বুঝা যায়। এই জন্যই নৈয়ায়িকেরা কহেন "গুণবত্বং দ্রব্যত্বং"।

এস্থলে কোলব্রুক্, রো, ব্যালেণ্ট্যাইন্ প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইউরোপীয় বাক্য ও চিন্তা প্রণালীর অনুসারে প্রণোদিত হইয়া এক বাক্যে গুণ ও দ্রব্যের লক্ষণ অন্যোন্যা-শ্রিত হওয়াতে ন্যায়শাস্ত্রকে দূষিতেছেন। কিন্তু তাহাদের এটী বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে উপরিউক্ত বিষয়টীই অন্যোন্যাশ্রিত সুতরাং তাহার লক্ষণও অন্যোন্যাশ্রিত হইবে। পরন্তু যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে যাহাকে বুঝান যাইবে সে বৃক্ষ বা পত্রাদির দ্রব্য বা গুণের একটীকে জানে তবে তাহার পক্ষে তদনুসারে লক্ষণ করা যাইতে পারে ও সেই লক্ষণ অন্যোন্যাশ্রিত হয় না। কিন্তু শিষ্যের নিকট না শুনিয়া শিক্ষকের সেরূপ স্বীকার করার অধিকার নাই। অন্যথা গ্রন্থেরই প্রয়োজন হয় না ফলতঃ ন্যায়শাস্ত্রকার পদার্থ বোধনের নিমিত্ত উচ্চারিত পদের অর্থ (পদ দ্বারা বোধনীয় বস্তু) কয় প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে ও সেই প্রকার কি কি ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাকে স্বতঃ-সিদ্ধ বা স্বতোজ্ঞাত বস্তুকেও বাক্যদ্বারা বুঝাইয়া দিয়া শ্রেণীবিভাগ করিতে হইতেছে। তাঁহার উদ্দেশ্য যে একজন নৈয়ায়িক অপরোচ্চারিত পদের অন্যার্থ গ্রহণ করিয়া বৃথা তর্কে প্রবৃত্ত না হন। দ্রব্য পদে কি বুঝিব, গুণ পদে কি বুঝিব, কর্ম্ম পদে কি বুঝিতে হইবে ইত্যাদি কহিলে যেমন প্রত্যেকেরই নিমিত্ত এক একটী লক্ষণ বা সূত্র করিতে হয়, ন্যায়শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাই করিয়াছেন। অনুভাবকের প্রতীত বিষয়ের সহিত উচ্চারিত পদের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের কার্য্য। তদনুসারেই ন্যায়-শাস্ত্রকার গুণ ও কর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থকে দ্রব্য বলিয়া শেষে সত্তা ও কর্ম্ম ব্যতিরিক্ত দ্রব্যের যে অপর ধর্ম্ম তাহাকেই গুণ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। গুণ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়।

দ্রব্য নয় প্রকার। পৃথিবী (মাটী) জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা,

ও মনঃ। কেহ কেহ অন্ধকারকেও দ্রব্যান্তর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা কহেন অন্ধকার প্রত্যক্ষ দেখা যায় ইহার কাল রূপ ও গমনাগমনাদি ক্রিয়া দেখা গিয়া থাকে। পরন্তু ইহার প্রত্যক্ষে আলোকেরও প্রয়োজন হয় না। ইহা গন্ধশূন্য হেতুক পৃথিবী নয়, কালরূপ হেতুক জলাদিও নয়। অতএব ইহাকে অবশ্যই নয়টী দ্রব্যাতিরিক্ত অপর একটী দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু অপরেরা তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা কহেন তেজঃ সকল দ্রব্যের প্রকাশক, ইহা আপনাকে ও পরকে ও প্রকাশিত করে। দ্রব্যান্তর হইলে সেই তেজ ইহাকে অবশ্যই প্রকাশ করিত। যেখানে তেজ নাই সেখানেই অন্ধকার, অথবা তেজ না থাকা বা তেজের অভাবই অন্ধকার ইহা কহিলে ইহা অভাবেরই অন্তর্নিবিষ্ট হইতেছে। ইহাকে দ্রব্যাং স্তর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তবে যে ইহাকে কাল রূপ দ্রব্য বলিয়া বোধ হয় সে কেবল আলোকাভাবে বুদ্ধিতে দ্রব্যান্তর ভ্রম মাত্র, অপসারণ, ব্যাপনাদি কর্ম্মও তেজের ক্রিয়ার অভাবে অন্যের ক্রিয়ার ভ্রম হয়। অতএব অন্ধকারের রূপ বা অন্ধকারের অপসারণ আগমনাদি বুদ্ধি ভ্রম ব্যতিরিক্ত অন্য নহে। ফলতঃ অন্ধকারের দ্রব্যত্ব স্বীকার করিলে অনর্থক আরও বহু গৌরব স্বীকার করিতে হয়।

গুণ ২৪ প্রকার। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রব্যত্ব, বেগ, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট ও শব্দ।

ইহা দিগের বিষয় আর যাহা কিছু বক্তব্য পরে বলা যাইবে।

সংযোগ ও বিভাগের অনপেক্ষ কারণকে কর্ম্ম কহা যায়। কর্ম্ম পাঁচ প্রকার। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। ক্ষরণ জলনাদি গমনেরই অন্তর্নিবিষ্ট হওয়াতে তাহাদিগকে পৃথক্ প্রকার ক্রিয়া বলা যায় না।

নৈয়ায়িকেরা যে দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়াতিরিক্ত জাতি বিশেষ ও সমবায়কেও পদার্থ মধ্যে স্বীকার করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই কহা গিয়াছে। এক্ষণে ঐ তিনটীর লক্ষণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

নিত্য হইয়া যে ধর্ম্ম অনেকে সমবেত থাকে তাহাকে জাতি কহা যায়। অর্থাৎ যে ধর্ম্ম সাধারণে থাকে ও যাহা তাহাকে পরিত্যাগ করে না; নিত্যরূপে সাধারণেই থাকে দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মবৃত্তি সেই ধর্ম্মকে জাতি বলা যায়। যেমন সত্তা, দ্রব্যত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি। জাতি পরা অপরা ও পরাপরা ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে এক সঙ্গে দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মবৃত্তি সত্তাকে পরা ও তদ্ভিন্ন অপর জাতিকে অপরা বলা যায়। আর দ্রব্যত্বাদি জাতি পৃথিবীত্বাদি হইতে পরা ও সত্তা জাতি হইতে অপরা বলিয়া তাহাদিগকে পরাপরা বলা গিয়া থাকে।

আকাশ অনেক না হওয়াতে তদ্গত ধর্ম্ম নিত্য হইবেও জাতি নয়, সমবায়ে ও অভাবে সমবায় সম্বন্ধ অসম্ভব এজন্য সমবায়ত্ব ও অভাবত্ব জাতি নয়, আনন্ত্য দোষ প্রযুক্ত জাতিত্ব জাতি নয়। একই বস্তুর কেবল হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব ভেদ প্রযুক্ত উহাদিগের

দুটীতে পৃথক্ পৃথক্ জাতি স্বীকার করা যায় না। যেমন ঘটত্ব, কলসত্ব এ দুয়ের একটীকে জাতি বলিয়া স্বীকার করিলে অপরটীকে জাতি বলা যায় না। পরস্পর বিসদৃশ ও বিভিন্ন ধর্ম্মের বস্তু যেখানে এক বর্গে ধরা গিয়াছে তাহাকেও জাতি বলা যায় না। যেমন ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব জাতি নয়। বিশেষ স্বয়ংই জাতীয় একটী হইতে অপরটীকে বিশেষিত করে, তাহাকে আর কেহ বিশেষ করিতে পারে না তাহার প্রয়োজনও হয় না। যেমন আলোক দর্শনের নিমিত্ত আলোক অসঙ্গত তেমনই বিশেষের বিশেষক অসঙ্গত।

নিত্য দ্রব্য বৃত্তি অন্তিম বিশেষের নাম বিশেষ। অর্থাৎ জাতি যেমন সাধারণ বৃত্তি নিত্য ধর্ম্ম, ইহা সেরূপ সাধারণ বৃত্তি ধর্ম্ম নহে। আকাশত্বাদি যেমন অননুরূপ একমাত্র বৃত্তি নিত্যধর্ম্ম, ইহা সেরূপ নহে ইহা অবসানে অর্থাৎ সদৃশ বহুলের মধ্যে অন্ত্য অবিভাজ্য ও নিত্য যে এক, তদ্‌বৃত্তি নিত্য ধর্ম্ম। যেমন যে অসাধারণ ধর্ম্ম একটী পরমাণুকে অপর পরমাণু হইতে বিশেষ করে তাহার নাম বিশেষ।

অবয়ব অবয়বী, জাতি ব্যক্তি, গুণ গুণী, ক্রিয়া ক্রিয়াবান্, বিশেষ নিত্যদ্রব্য এই এক এক যুগলের যে পরস্পর নিত্যসম্বন্ধ তাহার নাম সমবায়। সমবায় স্বীকার সম্বন্ধে নৈয়ায়িকেরা কহিয়াছেন যে গুণী, ক্রিয়াবান্, অবয়বী ইত্যাদিতে গুণবিশিষ্ট, ক্রিয়াবিশিষ্ট ইত্যাদিরূপে আমাদিগের একটী বিশিষ্টতাবুদ্ধি হইতেছে। অর্থাৎ অমুক গুণবিশিষ্ট, অমুক ক্রিয়াবিশিষ্ট এরূপ কহিলে অমুক পদবাচ্য ব্যক্তি একটী ও গুণাদি পদের বাচ্য অপর একটী, এই দুইটী পদার্থের অবগম্য হইয়া থাকে এবং এই বুঝা যায় যে ঐ দুইটির এক অপরটীকে, নিত্য সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইয়া, বিশেষিত করিতেছে। কিন্তু এই সম্বন্ধ সংযোগাদির দ্বারা কৃত হয় নাই, যে হেতু গুণাদির সংযোগ সম্ভব হয় না। কারণ গুণাদি নির্গুণ এবং সংযোগ গুণ। গুণ যে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় তাহা পূর্ব্বেই কহা গিয়াছে। অতএব গুণাদি গুণী প্রভৃতির সহিত যে নিত্য সম্বন্ধে সংবদ্ধ তাহা সমবায় নামে স্বীকৃত।

অভাব পদে দ্রব্যাদি ছয়টীর একটীও নয় যাহা তাহাকে বুঝায়। [এতদ্দ্বারা পূর্ব্বের ছয়টী ভাব বলা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বের তিনটী ভাব সত্তা বিশিষ্ট, পরের তিনটী সত্তা মাত্র সুতরাং তাহাদের আর সত্তা নাই ও অভাব অসত্তা তাহার সত্তা সম্ভবই নয়।]

অভাব প্রথমতঃ দুই প্রকার। সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। অন্যোন্যাভাব ভিন্নতা বা ভেদ মাত্র, এজন্য ইহাকে ভেদাভাব কহে। যেমন ঘটে পটের অভাব। অথবা ঘট পটাভাব। অর্থাৎ ঘট যে সে পট নয়। এই ন অর্থে যে অভাব সূচিত হইতেছে সে অন্যোন্যাভাব। অন্যোন্য অর্থে পরস্পর, অভাব অর্থ বিভিন্নতা। পরস্পর বিভিন্ন দুই বস্তুতে পরস্পরের যে এইরূপ অভাব অর্থাৎ বিভিন্নতা তাহার নাম অন্যোন্যাভাব যেমন ঘটে পটাভাব ও পটে ঘটাভাব। অর্থাৎ ঘট পট হইতে ভিন্ন ও পট ঘট হইতে ভিন্ন।

উপরি লিখিত অন্যোন্যাভাব ভিন্ন যে অভাব তাহার নাম সংসর্গাভাব। এই সংসর্গাভাব তিন প্রকার। প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। যাহা পূর্ব্বে ছিলনা, তাহা হইলে যে অভাব দূরীভূত বা নষ্ট হয় তাহার নাম প্রাগভাব। প্রাক্ অর্থ পূর্ব্বে, অভাব

অর্থ না থাকা বা না হওয়া কোন বস্তুর উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার যে অভাব ছিল, সেই অভাব তাহার প্রাগভাব। যেমন ঘট হওয়ার পূর্ব্বে ঘটের প্রাগভাব ছিল।

যাহা হইয়াছে তাহার শরীর নষ্ট হইলে যে তাহার না থাকা তাহাকে তাহার ধ্বংস বা ধ্বংসাভাব কহে। যেমন উৎপন্ন ঘটের শরীর নাশ হইলে ঐ ঘটশরীর নাশকে ঘটের ধ্বংসাভাব কহা গিয়া থাকে।

একের সংসর্গে অর্থাৎ সম্পর্কে যে অন্যের না থাকা তাহাকে তাহার অত্যন্তাভাব বলা যায়। অতি অতিক্রম, অন্তসীমা, অভাব না থাকা। যে অভাব কোন বস্তুর সীমা অতিক্রম করিয়া হয়, সেই অভাব তাহার সম্পর্কে অত্যন্তাভাব। যেমন গৃহ হইতে ঘট অপসারিত হইলে গৃহসম্বন্ধে বা গৃহে ঘটের অত্যন্তাভাব হয়।

নৈয়ায়িকেরা জাতি, বিশেষ, সমবায় ও অভাবকে পদার্থ বলিয়াছেন বলিয়া ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা আপত্তি উথপন করিয়াছেন। আমারা ঐ সকল আপত্তিকে নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া থাকি এবং ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষীয় দার্শনিকদিগের প্রতিপাদিত পদার্থের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই আমাদের বোধ হয়। স্বজাতীয়-দিগের প্রতিও এখানে আমার বক্তব্য এই যে নৈয়ায়িকদিগের পদার্থ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, জাতি, বিশেষ, সমবায়, অভাব প্রভৃতির অনুবাদ স্থলে ইংরাজিতে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক দিগের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত Category, Substance, Quality, Action, Generality, Particularity, Intimate relation, Negation প্রভৃতি শব্দ ও এই সকল শব্দ বুঝাইবার নিমিত্ত ইংরাজি ভাষা শব্দকৃত ভিন্নার্থক লক্ষণ সকল দর্শন করিয়া যেন তাঁহারা সেই ভ্রমে পতিত না হন। সাত সাদৃশ্যে যেন দুগ্ধকে কাস্তিয়া বলিয়া বোধ না করেন। একজন বিজ্ঞলোক একটী জন্মান্ধকে দুগ্ধ বুঝাইবার নিমিত্ত লক্ষণ করিলেন—যাহা গড়াইয়া যায়, যাহা খাইলে মোটা হয় ও যাহা বকের ন্যায় শ্বেতবর্ণ তাহাই দুগ্ধ। ইহাতে অন্ধ জিজ্ঞাসিলেন বক কি প্রকার? বিজ্ঞ, জন্মান্ধের হস্তে একখানি কাস্তিয়া দিয়া কহিলেন বাপু হে বক এইরূপ। জন্মান্ধ কাস্তিয়ার চতুর্দ্দিকে হস্তামর্ষণ করিয়া কহিলেন হাঁ আমি দুগ্ধ উত্তমরূপ বুঝিয়াছি। ফেলিয়া দিলে ইহা গড়াইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু জগৎশুদ্ধ লোকে যদি একবাক্যে বলে ইহা খাওয়া যায় তথাপি আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারিব না। আমাদিগের পাঠক মহাশয়দিগের ইংরাজি অনুবাদ দেখিয়া যেন তাদৃশ বিশ্বাস না হয়। স্বয়ং মনোযোগ পূর্ব্বক সংস্কৃত দর্শনাদির তাৎপর্য্য অবলোকন করিয়া পশ্চাৎ যাহা বক্তব্য হয় যেন তাহাই বলেন।

শ্রীপ্যারীমোহন সেন গুপ্ত।

উদ্ভিদ জীবন প্রক্রিয়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জন্তু সকল যে প্রকার আপন ভক্ষ্যদ্রব্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে, উদ্ভিদদিগের সেইরূপ ক্ষমতা আছে কি না এই বিষয় নিরূপণ করা দুঃসাধ্য, কারণ মৃত্তিকার ভিতর শিকড় সকল যখন রস আকর্ষণ করে তখন তাহা আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না। কেবল অনুমান দ্বারা যাহা নিরূপণ হইতে পারে তাহা এই স্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে। যদি উদ্ভিদদিগকে উৎপাটন করিয়া তাহাদিগের শিকড় সকলের অবস্থান দর্শন করাযায় তবে কোন বৃক্ষের শিকড়সকল কাণ্ডের চতুর্দ্দিক হইতে বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে সমপরিমাণে গমন করিয়াছে, কোন বৃক্ষের শিকড় সকল তিন দিক হইতে বাহির হইয়া তিনদিকে গিয়াছে অপর দিকে কিছুমাত্র নাই, কোন বৃক্ষের শিকড়সকল একদিক হইতে উদ্ভব হইয়া মৃত্তিকার ভিতর দিয়া বহুদূর গমন করিয়াছে, অপর তিনদিকে কিছুই দেখা যায় না। মূলশিকড় যখন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া গমন করিতে থাকে তখন বহুঅংশে বিভক্ত হয় না। এবং কাণ্ডকেও শাখাবিশিষ্ট হইতে দেয় না। পরে মৃত্তিকার ভিতর কিয়দ্দূর যাইয়া আর প্রবেশ করিতে না পারিলে ইহা দৈর্ঘ্যে আর বৃদ্ধি হইতে পারে না, সেই স্থানে স্থির হইয়া থাকে। এই সময় ইহা হইতে অসংখ্য শিকড় বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিতে থাকে কিন্তু ইহারা একহস্ত মৃত্তিকার অধিক নীচে প্রায় গমন করিতে পারে না। যদি এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় তবে এই নিরূপণ হইবে যে, শিকড় সকল যে দিকে, যে পরিমাণে ভক্ষ্যদ্রব্য পায় সেই দিকে সেই পরিমাণে ধাবিত হইতে থাকে, আর যে দিকে ভক্ষ্যদ্রব্য কিছু মাত্র না থাকে সেই দিকে শিকড় সকল কখন গমন করে না। যখন মূলশিকড় মৃত্তিকার নিম্ন দিয়া গমন করে, তখন যে পর্য্যন্ত ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হয় সেই অবধি গমন করিয়া থাকে। পরে নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া শিকড় রূপ শাখা বিশিষ্ট হয়। ইহা যে পর্য্যন্ত যাইয়া ক্ষান্ত হয় তৎপরবর্ত্তী মৃত্তিকা দৃষ্ট করিলে তাহার যে যোগ ভঙ্গ হয় নাই তাহা স্পষ্ট জানা যায়। এবং এই জন্যই অর্থাৎ ভক্ষ্য দ্রব্যের প্রাপ্তির অভাব হওয়াতেই মূলশিকড় শাখা বিশিষ্ট হয়; আর সেই সকল শাখা যে দিকে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হয় সেই দিকেই গমন করে তদ্ভিন্ন অন্য দিকে গমন করে না। উদ্ভিদদিগের শিকড়সকল জন্তু দিগের ন্যায় ভক্ষ্য দ্রব্য নির্ব্বাচনের বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, ভিন্ন ভিন্ন জন্তুদিগের যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভক্ষ্যদ্রব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইরূপ নানাজাতি উদ্ভিদেরও ভক্ষ্য দ্রব্য নানাপ্রকার। যদি বল ভিন্ন ভিন্ন জাতি বৃক্ষের ভক্ষ্যদ্রব্য এক প্রকার তাহাও সঙ্গত হয়না, কারণ কোন বৃক্ষে ক্ষার পদার্থের ভাগ অধিক, আর কাহাতেও বালির ভাগ অধিক, (যথা শোণ) এবং কাহাতেও বা গন্ধকের ভাগ অধিক, ইহার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্র বলা যায় যে ইহারা

মৃত্তিকার ভিতর হইতে শিকড় দ্বারা ঐ ঐ পদার্থ গ্রহণ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। যখন বৃক্ষ বিশেষে ভক্ষ্য বিশেষ গ্রহণ করে তখন ইহাদিগের ভক্ষ্যদ্রব্য নির্ব্বাচনের ক্ষমতা বিলক্ষণ আছে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কোন স্থানে এক বৃক্ষ বহুকাল থাকিয়া যদি মরিয়া যায় তবে তথায় সেই জাতীয় বৃক্ষের চারা পুঁতিলে কখন বর্দ্ধিত হয় না। যেমন মৃতপ্রাচীন আম্রবৃক্ষের স্থলে আম্রচারা রোপণ করিলে কখনই বর্দ্ধিত হয় না, মরিয়া যায়; ইহার কারণ ঐ চারার ভক্ষ্যদ্রব্য পূর্ব্ব বৃক্ষ নিঃশেষিত করিয়া মরিয়া গিয়াছে, এজন্যই তথায় আম্রচারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না পরন্তু মরিয়া যায়। কিন্তু যদি তৎপরিবর্ত্তে অন্য বৃক্ষের চারা রোপণ করা যায় তবে অবশ্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এই সকল দেখিয়া সপ্রমাণ করা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন ভক্ষ্য দ্রব্য আছে তাহাই ইহারা নির্ব্বাচন করিয়া লয়। কখনই অন্য বৃক্ষের ভক্ষ্য দ্রব্য গ্রহণ করে না। মৃত্তিকার এক প্রকার রস হইতে উদ্ভিদ সকল কি প্রকারে আপন আপন ভক্ষ্যদ্রব্য নির্ব্বাচন করে তাহা নিরূপণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে।

কোন উদ্যানে বৃক্ষসকল অত্যন্ত পুরাতন হওয়াতে যদি তাহাদিগের ফলোৎপত্তি না হয় তবে তথায় পুনশ্চ উদ্যান স্থাপন করিবার আবশ্যক হইলে ঐ বৃক্ষ দিগকে কাটিয়া ফেলিবে, পরে আম্র বৃক্ষের স্থলে নারিকেল বৃক্ষ ও নারিকেল বৃক্ষের স্থলে আম্র বৃক্ষ রোপণ করিবে। এই প্রকার পরিবর্ত্তিত নিয়মে রোপিত চারা সকলের বর্দ্ধিত হইবার কোন প্রতিবন্ধক হয় না। কিন্তু চারা পুঁতিবার পূর্ব্বে যে স্থানে যে বৃক্ষ ছিল তাহার চিহ্ন রাখিয়া কিয়দ্দূরে এক হস্ত পরিমাণে খনন করত মৃত্তিকা বিলোড়ন করিয়া দেওয়া উচিত, কারণ তথায় পূর্ব্বস্থিত শিকড়ের দ্বারা এমত আবৃত থাকে যে এক হস্ত অবধি খনন করিলে চারা উৎপত্তি হইবার ব্যাঘাত হয়।

(উদ্ভিদ রস সঞ্চালন)

যে সকল জন্তু কেবল রস পান করিয়া জীবন ধারণ করে তাহাদিগের একপ্রকার শোষক যন্ত্র আছে, যেমন মধু মক্ষিকার মধুপান এবং মশকের রুধির পান করিবার জন্য শুণ্ডবৎ একপ্রকার যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া বায়ু ও রুধির শোষণ করিয়া থাকে। নর জাতি অধরোষ্ঠ সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা বায়ুকে টানিলে মুখের ভিতর পানীয় দ্রব্য আসিয়া প্রবেশ করে সেই সময় প্রসারণ দ্বারা পান করিয়া থাকে তদ্বৎ যদি উদ্ভিদ দিগের মূল পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, তবে এইরূপ শোষক যন্ত্রের অস্তিত্ব কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না কেবল মুখের স্বরূপ শিকড়ের অগ্রভাগে যে কোষসমষ্ঠি আছে তাহার সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া রসপান করিবার শক্তি ধারণ করে না। কেবল অন্তর্ব্বাহ ও বহির্ব্বাহ ক্রিয়া দ্বারা মৃত্তিকার রস ইহার ভিতর প্রবেশ করিলে উর্দ্ধগত হইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। জল স্বাভাবিক নিম্নগামী কিন্তু উদ্ভিদদিগের ভিতরে ইহা কোন বিশেষ শক্তি অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে।

সূর্য্যের কিরণ বৃক্ষপত্রে পড়িলে ইহা উত্তেজিত হইয়া রসাকর্ষণে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে এক শোষণ শক্তির উৎপত্তি হইয়া পত্র হইতে শিকড়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে সেই আকর্ষণ বলে আকৃষ্ট রস উর্দ্ধগামী হইতে থাকে কিন্তু নিশাগমে তাদৃশ শক্তি না থাকায় রস অতি মৃদুভাবে সঞ্চালিত হয় এই জন্যই অনেক বৃক্ষের পত্র এই সময়ে নত হইয়া পড়ে।

উদ্ভিদসকল কোষময় পদার্থ বটে কিন্তু হইতে ছিদ্র নাই পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাদিগের ভিতর দিয়া রস গমনাগমন করিতে পারে। জলের এক বিশেষ ক্ষমতা আছে যেস্থলে ইহা বহুপরিমণে একত্রিত হয় সেই স্থানকে বিদারণ করে। যদি বিদারণ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করে তবে তাহাকে অন্তর্ব্বাহ আর যদি বাহির হইয়া যায় তবে তাহাকে বহির্ব্বাহ কহে। যদি আর একটী চামড়ার থলিতে চিনির পানা পরিপূর্ণ করিয়া দৃঢ়রূপে মুখ বন্ধন করতঃ এক গাম্‌লা জলে ডুবাইয়া রাখা যায় তবে কিছুকাল পরে গাম্‌লার জল ঐ থলির ভিতর প্রবেশ করিয়া চিনির পানাকে পাতলা করিয়া ফেলিবে আর ঐ থলিস্থ চিনির পানা গাম্‌লার জলে মিশিয়া যাইবে। জলের এইরূপ অন্তর্ব্বাহ ও বহির্ব্বাহ ক্রিয়া দেখিয়া অনুমান হইতেছে যে বৃক্ষের আকৃষ্ট রস এককোষের ভিতর আসিয়া পরিপূর্ণ হইলে তৎপরে নিকটস্থ কোষে গমন করিয়া তাহাকেও পরিপূর্ণ করে এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে উর্দ্ধগত হইতে থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে কোষ সকল প্রথম অবস্থায় গোলাকার হইয়া থাকে পরে বহুসংখ্যককোষ উপর্য্যুপরি একত্রিত হইলেই ইহাদিগের আবরণ স্থানের লোপ হইয়া নলাকারে পরিণত হইয়া যায়। আকৃষ্ট রসের গমন জন্য উদ্ভিদদিগের এই নলি দুই প্রকার হয়। প্রথম প্রকারকে কাষ্ঠস্তরনলী ও দ্বিতীয়প্রকারকে বিবরাঙ্কিত স্তরনলী কহে। যে সকল বৃক্ষ প্রথম অবস্থায় রসেতে পরিপূর্ণ থাকে তাহাদিগের ভিতর বিবরাঙ্কিত স্তরনলী সকলকে অতি প্রবল অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই ইহাদিগের ভিতর দিয়া বহুপরিমাণে রস অতিবেগে গমন করিতে থাকে কিন্তু বৃক্ষ সকল বৃহৎ হইলে কাষ্ঠস্তর অধিক হয় তন্নিবন্ধন বৃক্ষ কঠিন হইয়া যায় কাজেই এই রস সঞ্চালন ক্রিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ বেগবতী থাকে না। চারা অবস্থায় শালবৃক্ষ কাটিলে এক ব্যক্তির পিপাসা নিবারণ উপযোগী রস বহির্গত হয় কিন্তু পরিপক্ক হইয়া উঠিলে আর পাইবার সম্ভাবনা থাকে না কারণ তখন কাষ্ঠস্তরে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

জড়জগতের নিয়ম আকর্ষণ।

পদার্থ প্রধানতঃ দ্বিবিধ। সজীব এবং নির্জীব। যাহাদের জীবন আছে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আপন ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়, তাহাদিগকে সজীব কহে; আর যাহাদের জীবন নাই যেস্থানে স্থাপিত হয় সেইস্থানেই অবস্থান করে বা চালিত হইলেই চলিতে থাকে, তাহাদের সাধারণ নাম নির্জীব বা জড় পদার্থ। এই জড় পদার্থ সমূহের অধিষ্ঠান-ভূত অখিল ব্রহ্মাণ্ড জড়-জগৎ নামে অভিহিত। আকর্ষণ এই জড়-জগতের প্রধান সাধন। এই এক আকর্ষণ প্রভাবেই সমুদয় সুসম্পাদিত হইতেছে। সর্ব্বত্রেই সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্র পুনঃ ভূতল স্পর্শ করিতেছে। মেঘের জল, ছাদের ইষ্টক, বৃক্ষের পত্র যথাকালে পৃথিবীতে নিপতিত হইতেছে। লৌহ তপ্ত অগ্নি সহকারে দ্রবীভূত করিলে, পুনরায় কঠিন হইতেছে; জলকে বাষ্প করিলে পুনরায় জলই হইতেছে; বস্তুর যেশক্তি প্রভাবে এই অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সমূহ সম্পাদিত হইতেছে. তাহার নাম আকর্ষণ। কি প্রকারে জড়পদার্থের এতাদৃশ গুণ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা অদ্যাপিও নির্ণীত হয় নাই, তবে ইহাদের কার্য্য নির্ব্বাহক প্রণালীগুলি, পণ্ডিতগণ এক প্রকার স্থির করিয়াছেন। তাহাই এস্থলে সংক্ষেপতঃ বর্ণন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য।

সমুদয় জড়পদার্থ—পরমাণু সমষ্টি। এই যে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি সম্বলিত আশ্চর্য্য জগৎ ইহা কেবল পরমাণু পুঞ্জ মাত্র। বস্তুর আয়তন অনুসারে কোনটীতে অধিক কোনটীতে বা অল্পপরিমাণে পরমাণু বিদ্যমান আছে এই পরমাণু সমূহ এত ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্ম যে চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয় না; ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করা যায় না; এমন কি কোন ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ও প্রত্যক্ষ হয় না। পক্ষান্তরে, পরমাণু সমূহ উত্তাপ প্রভাবে দ্রব হয় না; অগ্নি সংযুক্ত হইলে দগ্ধ হয় না; কি বিকৃত ভাবাপন্ন হয় না। ইহারা যেমন সৃষ্ট হইয়াছিল, তেমনই রহিয়াছে। এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য্য কলাপই কেবল ইহাদের সংযোগ বিয়োগ দ্বারা সংঘটিত হইতেছে। ইহারই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের এক মাত্র কারণ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইহারাই সময়ে জীবরূপে, সময়ে উদ্ভিদরূপে পরিণত হইতেছে; কারণ নিত্য পরিবর্ত্তনই সমুদায় বিশ্বের স্বাভাবিক লক্ষণ।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনা করিলে আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবীকে অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এমন কি একটী ক্ষুদ্র বিন্দু বলিলেও বলা যায়। অথচ পৃথিবীস্থ যে সমুদয় ব্যাপার দিন দিন সম্পাদিত হইতেছে তাহাই ধারণা করিতে গিয়া আমাদের চিত্ত বিহ্বল ও বিভ্রান্ত হইতেছে, তখন এই অনন্ত বিশ্বমণ্ডলের বিষয় ধারণা করা কি সামান্য বুদ্ধি মনুষ্যের সাধ্য! কি নভোমণ্ডলে, কি ভূমণ্ডলে, কি নক্ষত্র লোকে, কি অপার বারিধি বক্ষে, সর্ব্বত্রেই, সর্ব্বাবস্থাতেই জগদীশ্বরের অভাবনীয় মহীয়সী

কীর্ত্তি কলাপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সকলেই তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী ঐশী শক্তির পরিমাণ স্বরূপ সমুদায়ই আকর্ষণ বিকর্ষাণাদির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহারই সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে।

সাধারণের অনায়াস বোধগম্যার্থ পণ্ডিতগণ এই আকর্ষণ-শক্তি নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, ক্রমে তাহাদিগেরই বিষয় বিবৃত করা যাইতেছে।

বৃক্ষের পত্র, মেঘের জল, ছাদের ইষ্টক, ভূতল স্পর্শ করিতেছে; উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্র পুনরায় ভূমিতে নিপতিত হইতেছে; নদী সমূহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। দ্রব্যমাত্রেই মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করিলে ভার বোধ হয়; সেই ভার দ্রব্যের আয়তনানুসারে স্থানবিশেষে কখন অল্প কখন বা অধিক হইতেছে। যে দ্রব্যের ভার পৃথিবীতে পাঁচসের অনুমিত হইল, তাহাই কোন অত্যুচ্চ গিরি শৃঙ্গে লইয়া গেলে অনেকাংশে ন্যূন হইবে, কারণ সেস্থান পৃথিবী হইতে অনেক দূরে অবস্থিত; পৃথিবীর প্রভাব তথায় অবশ্যই অপেক্ষাকৃত অল্প। সুতরাং ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, যে দ্রব্য যত বৃহৎ, তাহার আকর্ষণ শক্তিও তত প্রবল, আরও, দ্রব্য সমূহ পরস্পর যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে তাহাদের আকর্ষণ সূত্র * ও সমধিক দৃঢ় হয়; কিন্তু দূরবর্ত্তী হইলে শ্লথ হইয়া পড়ে। যে শক্তি প্রভাবে এই সমুদয় কার্য্য অপ্রতিহতরূপে চলিতেছে তাহার নাম মাধ্যাকর্ষণ বা কেন্দ্রাভিকর্ষণ; মাধ্যাকর্ষণ শব্দের অর্থ মধ্য বা কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ। পৃথিবী যে শক্তি প্রভাবে যাবতীয় পদার্থকেই তাহার মধ্যস্থ বা কেন্দ্রস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই অনির্ব্বার্য্য শক্তি বা চেষ্টার নাম "মাধ্যাকর্ষণ" সুতরাং যদি কোন পদার্থ কোন প্রকারে কেন্দ্রস্থ হইতে পারে তাহা হইলে পুনরায় তাহাকে এতাদৃশ আকর্ষণাধীন হইতে হয় না এবং তাহার কিছুই ভারও থাকে না।

পৃথিবী যেমন যাবতীয় পদার্থকেই তাহার কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে; যাবতীয় পদার্থও স্ব স্ব প্রভাব অনুসারে তাহার প্রতিবন্ধক হইতেছে; সকলেই দূরে পলাইতে চেষ্টা পাইতেছে। পদার্থের যে শক্তি দ্বারা এই কার্য্য সংসাধিত হইতেছে তাহার নাম "কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি"—এই কেন্দ্রাপসারিণী ও কেন্দ্রাভিকর্ষিণী উভয় শক্তিই যেমন ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় পদার্থে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য প্রতিপাদন করিতেছে; নভোমণ্ডলেও ঠিক সেইমত পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি লইয়া সৌরজগৎ; এই জগতের কেন্দ্র সূর্য্য, সুতরাং সূর্য্য মধ্যস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক ইহার চতুর্দ্দিকস্থ গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদিকে ভয়ানক বেগে আকর্ষণ করিতেছে। গ্রহ, উপগ্রহগণ ও নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে তাহাদের কেন্দ্রস্থানীয় সূর্য্যকে আকর্ষণ করিতেছে; এতদ্ব্যতীত তাহাদের পরস্পরে আকর্ষণতো আছেই; এই হেতুই গ্রহ, উপগ্রহগণ সূর্য্য হইতে প্রায়ই দূরে অপসৃত হইতে পারিতেছে না; ঐই হেতুই তাহারা সূর্য্যে নিপতিত হইতেছে না। অপিচ সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি

* আকর্ষণের নিয়ম—দূরত্বের বর্গ পরিমাণের তত ভাগের একভাগ যথা—পৃথিবী হইতে ৪ ক্রোশ দূরে উহার আকর্ষণ ১/১৬ ; ৩ ক্রোশ দূরে ১/৯ এই মত ইত্যাদি।

পৃথিবীর অপেক্ষা প্রায় একবিংশতি গুণ অধিক; সুতরাং সৌরজগৎ হইতে ক্ষিপ্ত কোন বস্তু প্রতিসেকেণ্ডে ন্যূনকল্পে ৩৮০ মাইল পথ গমন করিতে না পারিলে সৌর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে পতিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, তাহারা ইহা অপেক্ষা হ্রস্বগতি হইলে পুনরায় সৌরজগতেই নিপতিত হইবে।

জগৎ একটী নহে। এক একটী নক্ষত্র এক একটী সূর্য্য তুল্য। কোন কোন নক্ষত্র আবার সৌরজগতের কেন্দ্রস্থানীয় সূর্য্য অপেক্ষাও বৃহৎ। প্রত্যেক নক্ষত্র এক একটী জগতের কেন্দ্র স্বরূপ। সুতরাং নক্ষত্র লোকের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে অতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। আপাততঃ নভোমণ্ডলে দৃষ্টি করিলে নক্ষত্র সমূহকে সূর্য্যাপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু পৃথিবী হইতে সূর্য্য এবং কোন কোন নক্ষত্রের দূরত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে, আর এ প্রকার সন্দেহ মনোমধ্যে উদিত হয় না। অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী যে লুব্ধক এবং ধ্রুবতারা, তাহারাই পৃথিবী হইতে যথাক্রমে ৪৪ শ নিখর্ব্ব যোজন এবং দুইশত এক নিখর্ব্ব যোজন দূরে অবস্থিত। আর পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব ৪ কোটী ১৮ লক্ষ ক্রোশ; সুতরাং এতাদৃশ বৃহৎকায় নক্ষত্র সমূহ যে আপাততঃ ক্ষুদ্র বোধ বলিয়া হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কোন বৈজ্ঞানিক কহিয়াছেন যে "সূর্য্য আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা সমীপস্থ নক্ষত্র।" বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ জন্ হারশেল বলেন যে, যে গোলা প্রতিসেকেণ্ডে ১২০০ ফিট গমন করে তাহা সমান বেগে সমভাবে গমন করিলে, সূর্য্যমণ্ডলে উপনীত হইতে ১৩ বৎসরেরও অধিককাল লাগিবে। এতাদৃশ দূরস্থ নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহাদির গতির বিষয় বিবেচনা করিলে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দ রসে আপ্লুত হইতে হয়। আমরা অশ্বের গতি, কামানের গোলার গতি, শরের গতি, বাষ্পীয় পোত বা রথের গতি দেখিয়াই চমৎকৃত হই। কামানের গোলা প্রতি ঘণ্টায় ৩৫০ ক্রোশের অধিক গমন করিতে পারে না। বাষ্পীয় রথ ঘণ্টায় ৪০ ক্রোশের অধিক চলিতে পারে না। কিন্তু আমাদিগের অধিষ্ঠান ভূতা পৃথিবী ঘণ্টায় ২৯,৯০৭ ক্রোশ চলিতেছে। বৃহস্পতিগ্রহ ঘণ্টায় ১২,৭৬০ ক্রোশ ভ্রমণ করিতেছে; কোন কোন গ্রহ ইহা অপেক্ষায় দ্রুত বেগে পরিভ্রমণ করিতেছে।

নক্ষত্র সমূহকে আপাততঃ নিশ্চল বলিয়া বোধ হয়, আর প্রাচীন পণ্ডিতবৃন্দও ইহাদিগকে গতিবিহীন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আধুনিক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে তাহারা সবল; অতিশয় বেগ সহকারে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। আরও দেখা যাইতেছে যে, যে সমুদয় নক্ষত্রাদি প্রাচীন কালে যে স্থানে অবস্থিত ছিল, এক্ষণে তাহাদিগকে আর সে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না তাহারা স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে। আবার যে নক্ষত্র পূর্ব্বে কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই, এখনও কোন কোনটী আবির্ভূত হইয়াছে; সুতরাং তাহারা যে সবল তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। কোন পণ্ডিত গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে যদ্যপি ভূমণ্ডল স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, আর সৌরজগতস্থ যাবতীয় গ্রহ, উপগ্রহাদি মধ্যের তুল্যরূপ বাহুবলসম্পন্ন হইয়া যদি পুনঃ উহাকে সঞ্চালন করিতে চেষ্টা পায়, তথাপি

উহাকে অঙ্গুলি প্রমান স্থানও চালনা করিতে সমর্থ হইবে না, অথচ উহা এক অচিন্ত্য অননুভূত শক্তি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া ঘণ্টায় ২৯,৯০৭ ক্রোশ চলিতেছে। ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে। একবার চালিত হইলে চলিতে থাকে, কদাপি ক্ষান্ত হয় না, জড়পদার্থের এটী প্রধান ধর্ম্ম। এই হেতুই কি সূর্য্য, কি চন্দ্র, কি গ্রহ, কি উপগ্রহাদি সকলেই চলিতেছে, ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। কিন্তু পৃথিবীতে আমরা জড়পদার্থের ঈদৃশ ধর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতে পাইনা। মাধ্যাকর্ষণ বায়ুর গতি ইত্যাদি ইহার প্রধান অন্তরায়। একগাছি লম্বমান রজ্জুতে যদি একখণ্ড ইষ্টক বাঁধিয়া দোলাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা, বায়ুর প্রতিবন্ধকতা এবং অবলম্বন বিন্দুর সহিত দোলদণ্ডের ঘর্ষণ, এই দুই কারণ বশতঃ অচিরকাল মধ্যেই স্থির হইবে। বায়ুরগতি যে ইহার প্রধান অন্তরায় তাহা ঘটিকাযন্ত্রের পরিদোলেকের (পেণ্ডুলমের) বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্টই অনুভূত হয়। যাহাতে পরিদোলকের গতি উত্তরোত্তর হ্রাস হইতে না পারে এই আশয়ে ঘটিকা মধ্যে স্প্রিং অথবা কোন ভারী দ্রব্য কৌশল পূর্ব্বক নিবেশিত থাকে। মাধ্যাকর্ষণ ও অন্যতম অন্তরায়। ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সর্ব্বদাই আকর্ষণসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া নিত্য আকৃষ্ট হইতেছে। সহসা ইহা আমাদিগের বোধগম্য হয় না। কিন্তু সমুদ্র বারির উচ্ছ্বাস ও অনুচ্ছ্বাস সন্দর্শন করিলে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র থাকে না। অতি সহজেই অনুমেয় হইতে পারে। আমরা দেখিতেছি প্রতিনিয়তই সমুদ্র বারি উচ্ছ্বসিত হইতেছে, কখন বা স্বাভাবিক সীমা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বহুদূর উৎসর্পিত হইয়া ভয়ানক তরঙ্গমালা উৎপাদন করিয়া অনেক স্থান প্লাবিত করিতেছে। পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা দিবসেই এতাদৃশ ভয়ানক উচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়। ইহার কারণ, আকর্ষণের প্রাবল্য। এই সময়ে চন্দ্র এবং সূর্য্য উভয়ের আকর্ষণ শক্তির সংযোগ হয়। চন্দ্রের ছয়গুণ এবং সূর্য্যের একগুণ এই সপ্তগুণ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে থাকে, তাই উচ্ছ্বাস পরিমাণ সমধিক প্রবল হয়। এই নৈসর্গিক নিয়ম অপ্রতিহত রূপে চলিতেছে, এবং অহোরাত্র মধ্যে দুইবার হইতেছে, সুতরাং প্রত্যেক ১২ ঘণ্টা অন্তর ঈদৃশ ভয়ানক বিপ্লব একবার সঙ্ঘটন হইতেছে। অনেকে এ প্রকার বলিতে বা মনে করিতে পারেন যে, সমুদ্র বারির ন্যায় মৃত্তিকাও কেন আকৃষ্ট হইয়া স্ফীত না হয়? মৃত্তিকা জলের ন্যায় তরল পদার্থ হইলে নিশ্চয়ই ঐরূপ হওয়া সম্ভব হইত; কিন্তু ইহা কঠিন পদার্থ, ইহার শরীরগত পরমাণু সমূহ আকর্ষণ প্রভাবে বিচ্ছিন্ন এবং বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পায় না; সুতরাং বিচলিত হয় না; তবে আকর্ষণ সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া যে নিত্য আকৃষ্ট হইতেছে তাহার আর সংশয় নাই।

ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কদাপি একজাতীয় এবং সমধর্ম্মী দ্বিবিধ পদার্থের মিলন সম্ভবে। প্রত্যেক সূর্য্যের, প্রত্যেক জগতের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট গতি এবং বিশেষ পথ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, সকলেই সেই বিশ্বাধিপের বিশ্ব জনীন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে ফিরিতেছে। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমরা একটী অতি সূক্ষ্ম বিন্দু সম ও হইতে পারি কি না সন্দেহ, তাই ইহাদিগের গতিবিধি আমাদিগের অনন্নভবা।

পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থকে প্রধান তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন যথা, তরল, দৃঢ় এবং বাষ্পীয়। এই দৃঢ় বা কঠিন বস্তুর মধ্যে কোনটী অধিক কঠিন, কোনটী অপেক্ষাকৃত কোমল; আবার তরল দ্রব্যের মধ্যে কোনটী ঘন এবং গাঢ় এবং কোনটী অপেক্ষাকৃত তরল। ঈদৃশ তারতম্য হইবার কারণ কি? ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থই পরমাণু সমষ্টি, যে শক্তি প্রভাবে এই পরমাণু পুঞ্জ একত্র সংযুক্ত হয়, সেই অনিবার্য্য নিত্য শক্তিই এতাদৃশ বিভিন্নতা উৎপাদনের মূল কারণ। পণ্ডিতেরা তাহাকে "যোগাকর্ষণ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। সমীপবর্ত্তী দ্রব্য সমূহের পরমাণুপুঞ্জ সংযুক্ত করাই ইহার কার্য্য। ইহা এক প্রকার নির্ণীত হইয়াছে যে, যে বস্তু যে পরিমাণে পরমাণু সমষ্টি, এই আকর্ষণ প্রভাব ও তাহার উপর তদনুরূপ। কঠিন অপেক্ষা তরল দ্রব্যের পরমাণু সমষ্টি অল্প, সুতরাং কঠিন অপেক্ষা তরলদ্রব্যের যোগাকর্ষণ-শক্তিও অল্প; এবং বায়ু ও বায়ুবৎ দ্রব্যের যোগাকর্ষণ তাহা অপেক্ষা আরও অল্প। এই ন্যূনাধিক্য হেতুই কাষ্ঠ খণ্ড অপেক্ষা লৌহদণ্ড, বায়ু অপেক্ষা জল, তৈল অপেক্ষা পারদ কঠিন।

বস্তু সকল যখন এত নিকটবর্ত্তী হয় যে, দেখিলেই বোধ হয় যেন স্পর্শ করিতেছে, তখনই এই আকর্ষণের প্রভাব প্রত্যক্ষ বা অনুভূত হইয়া থাকে; সুতরাং মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় এই শক্তি দূর ব্যাপিনী নহে।

ক্রমশঃ

শ্রীরাধিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তত্ত্বসংগ্রহ।

পরীক্ষিত মেলেরিয়া জ্বর নাশক ভাঁট পাতা। "ভাঁটী-গাছ" (ঘেঁটু-গাছ) বসন্ত কালে গ্রাম্য বালক বালিকারা ঘেঁটুপূজা, ইটা কুমার পূজা করিবার জন্য কাঁদি কাঁদি ঘেঁটুপুষ্প ব্যবহার করিয়া থাকে। ঘেঁটু দেবতা (ইটা কুমার দেবতা) অতিপ্রভাব শালী। ইনি খোস, পাঁচড়া, স্ফোটক, গাত্রকুণ্ড ইত্যাদি রোগের অধিপতি। এই পুষ্প ঝোঁপে ঝাঁপে ও জঙ্গলে জন্মে, ইহা দ্বারা ঘণ্টাকর্ণ ভিন্ন অপর কোন দেবতার পূজা হয় না। ঘেঁটুপুষ্প দ্বারা ঘণ্টেশ্বর দেবতার পূজা করিলে খোস পাচড়া ইত্যাদি চর্ম্মরোগ নিবারিত হয়। ভাণ্ডি এবং ভাঁটী এক নহে। দুই প্রকার গাছ। ভাঁটীর পাতার রং প্রায় ঘাসের ন্যায় সবুজ। ভাণ্ডির পাতার রং ফিঁকা, ফ্যাকাসে ও ঈষৎ হলদে। ভাঁটীর ফুল কাঁদি কাঁদি সাদাটে পাতলা ও লম্বা শিস্‌যুক্ত। ভাণ্ডির ফুল থোপা থোপা সাদাটে রঙ্গ, কতকটা মতিয়া বেলের ন্যায়, কিন্তু মতিয়া বেল অপেক্ষার বড় পুষ্ট ও দৃঢ় পয়ের যুক্ত শিস্‌ বিহীন। ক্রিমি, মুখ দিয়া জল

উঠা, পেট কামড়ানির জন্য গৃহ কর্ত্তীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুণ ভাঁটীর কুশী (মকমলের নরম লোমের ন্যায় ইহার উপরে এক প্রকার পাতলা লোম থাকে) একটুকু জল দিয়া বাটিয়া কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া, বালক বালিকা দিগকে প্রত্যূষে খাওয়াইয়া থাকেন। ভাঁট ক্বমি রোগের এক প্রসিদ্ধ মহৌষধ বলিয়া এদেশে প্রসিদ্ধ। তিক্ত মাত্রই ক্বমি নাশক জ্বরঘ্ন ও দুর্ব্বলাবস্থায় বল প্রদায়ক।

কোন ডাক্তার ভাঁটী পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ "ডিককসন ভাঁটী" নাম দিয়া ম্যেলেরিয়া জ্বরে ব্যবহার করেন এবং তিনি বলেন ম্যেলেরিয়া জ্বরের পক্ষে ইহা একটী প্রধান ঔষধ।

অপর একজন ডাক্তার বলেন যে ভাঁটীর ক্বাথ (ডিককসন ভাঁটী) যখন যে অবস্থায় জ্বররোগে ব্যবহার করিয়াছেন, তখনই প্রত্যাশাতীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। কুইনাইন সেবন করিয়া জ্বর নিবারণ করিলে জ্বর কিছুদিন পরে পুনরায় ফেরে ইত্যাদি। পূর্ব্বে বিষ প্রয়োগ করিয়া, রসান করিয়া জ্বর দমন করিলে যে প্রকার শরীর ভগ্ন অর্থাৎ শরীরের প্রকৃতাবস্থার ব্যতিক্রম হইত, জ্বর নিবারণার্থ অতি মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার করিলে শরীরে যে, সে প্রকার অসুখকর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় না, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করিতে পারি না। কুইনাইন এদেশে জ্বর নিবারণার্থে আসিয়াছিল, কিছু দিন ইহাঁকে সেবন করামাত্রেই জ্বর পলায়ন করিত বলিয়া ডাক্তর, কবিরাজ, মুদি, বাকালি, ভদ্রলোক, ইতর লোক প্রায় সকলেই কুইনাইন সেবন করিতে শিক্ষা করিল। কিন্তু গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এ দেশীয় লোকের শরীরে এত অশুভ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে যে, কুইনাইন সেবনে আর তত উপকার হয় না এবং কুইনাইন সেবন করিয়া জ্বর দমন করিলে আবার দিন কয়েক পরে পুনর্ব্বার সে জ্বর ফিরিয়া উপস্থিত হয়। পুনরায় কুইনাইন সেবন করিয়া তাহাকে দমন করিলে দিনকতক পরেই জ্বর আবার ফেরে। কুইনাইন আমাদিগের শরীর নষ্টের এক প্রধান ঔষধ। পূর্ব্বে বিষ প্রয়োগে বা রসানে যে প্রকার স্বাস্থ্যহানি হইত আজ্‌কাল কুইনাইনে তদপেক্ষা অধিক পরিমান স্বাস্থ্য হানি হইতেছে।

এলোপ্যাথিক ডাক্তার মহাশয়েরা কুইনাইনের নিন্দা গুরু নিন্দাপেক্ষা অধিক মনে করেন। জ্বর হইয়াছে, এ জ্বর ত্যাগ হইয়া পুনরায় জ্বর আসিবার সম্ভাবনা এ সময়ে কুইনাইন মিকশ্চার কুইনাইন পিল বা কুইনাইন পুরিয়া জ্বর নিবারণার্থ ব্যবস্থা করা অতি সহজ। কুইনাইন ব্যতীত অন্য ঔষধের দ্বারায় জ্বর নিবারণের চেষ্টা করিতে হইলে চিকিৎসককে অনেক ভাবিতে হয়। পাঁচটা ঔষধের মধ্যে একটা বাছিয়া লইতে হয়। সময়ে সময়ে আবিষ্কিয়া করিবার ও চেষ্টা করিতে হয়। এ সমস্ত কষ্ট ও যন্ত্রণার হাত কুইনাইন ব্যবস্থা করিয়া চিকিৎসকেরা বাঁচিতে চাহেন। কুইনাইনের "কেরামত" অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তি বুঝিতে পারিয়াছেন। কুইনাইন জ্বর বিশেষে প্রকৃত মাত্রায় যে প্রকার মহোপকারী, অতি মাত্রায় অব্যবস্থা পূর্ব্বক সেবিত হইলে বা সে জ্বরে সেবিত হইলে ভয়ানক অপকার করে। ইহার অপকার ম্যালেরিয়া

ডিষ্ট্রীক্টের লোকে বিশেষ বুঝিতে পারিয়াছেন। ম্যালেরিয়া ডিষ্ট্রীক্টের অনেক চিকিৎসকের নিকটে আমরা শুনিয়াছি, অনেক দিন পর্য্যন্ত কুইনাইন ব্যবহারের দ্বা। জ্বর নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে ভাঁটীর ক্বাথ (ডিককসন ভাঁটী) ব্যবহারের দ্বারা জ্বর নিবারণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এদেশীয় চিকিৎসকদিগকে আমরা অনুরোধ করি যে, ভাঁটী পত্র চূর্ণ বা ভাঁটীর ক্বাথ বা সংশোধিত সুরা দ্বারা টিংচার ভাঁটী প্রস্তুত করিয়া জ্বর রোগে ব্যবহার করিলে নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইতে পারিবে যে, ভাঁটী কত মহোপকারী। গোটাকত ভাঁটী পাতা খানিকটা জলে সিদ্ধ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইয়া এক তোলা দেড় তোলা পরিমাণ, দিবা মধ্যে তিন চারি বার সেবন করাইলে হইতে পারে। শুষ্ক ভাঁটী পত্র চূর্ণ করিয়া এক রতি পরিমাণ, দিবসে তিন চারিবার ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে। জ্বর বিশেষে যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এক আদ ফোটা ভাইনম ইপিকাক কিম্বা টিংচার একোনাইট বা টিংচার বেলাডোনা বা টিংচার নক্‌স ভমিকা বা লাইকর আরসেনিক্ ভাঁটীর ক্বাথের সহিত মিলাইয়া দিলেও উপকার দর্শিতে পারে। এই ঔষধের দ্বারা জ্বর আরোগ্য হইলে, রোগীর ঔষধ কিনিয়া ইন্‌সলভেণ্ট লইবার আশঙ্কা দূর হইবে।

আর এক জন লিখিয়াছেন যে, শরীরের কোন স্থান হইতে কোন প্রকারে রক্তপাত হইলে ভাঁটী পাতার রস বা ঐ পাতা বাটিয়া উহার উপর সংলগ্ন করিলে অতি শীঘ্র রক্ত রোধ হয়। এবং শরীরের কোন স্থানে আঘাত লাগিলে ঐ আহত স্থানে ভাঁটী পাতা বাটিয়া সংলগ্ন করিলে আঘাত জন্য বেদনা নিবারণ হয়। দন্তমূল ফুলিলে বা বেদনা হইলে ভাঁটীগাছ সিদ্ধ করিয়া ঐ ক্বাথে কুলি করিলে সে বেদনা এবং ফুলা আশু নিবারণ হয়। ভাঁটী পাতার রস সেবন করিলে কৃমিরোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

১। করলার পত্র বা আস্‌সেঁড়ার পত্রের রস দ্বারা নাশ গ্রহণ করিলে পালা জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়।

২। মোম রকম(Cold cream কোল্ডক্রীম) শীতকালে সহজেই বালক বালিকাগণের ঠোঁট ও গাল ফাটিয়া যায় এবং তজ্জন্য তাহারা কষ্ট পাইয়া থাকে; কিন্তু নিম্ন লিখিত সহজ উপায়ে এই মলম প্রস্তুত করিয়া গালে অথবা ঠোঁটের ফাটায় লাগাইলে ঐ কষ্ট নিবারিত হয়। এমন কি ইহাদ্বারা সামান্য ক্ষতও আরোগ্য হইয়া থাকে।

দশ আনা আন্দাজ সাদা ফুল মোম, এক কাঁচ্চা ফুলেল তৈল ও এক কাঁচ্চা ভাল গোলাব জল লইবে। উক্ত তৈল ও মোম একটা পিতলের বাটীতে করিয়া অল্প অগ্নির উত্তাপে গলাইবে, যখন মোম উত্তমরূপে গলিয়া যাইবে তখন তদুপরি অল্প অল্প করিয়া গোলাব জল ঢালিবে ও একটী ছোট খুন্তি দ্বারা নাড়িতে থাকিবে। পরে ঐ জল সম্পূর্ণরূপ মিশ্রিত হইলে (মলমের মত হইলে) নামাইয়া কাঁচের কৌটা বা বাটীতে ঢাকা দিয়া রাখিবে এবং প্রয়োজন মত লইয়া ব্যবহার করিবে।

৩। পল্লিগ্রামের পুষ্করিণীর অপরিস্কৃত ও দূষিত জল পান করিয়া সাধারণ লোককে পীড়াগ্রস্থ হইতে হয়। তথাকার লোকেরা যদি নিম্নলিখিত উপায়ে ঐ জল পান করেন তাহা হইলে তাহাদিগকে পীড়ায় ভুগিতে হয় না।

কলসীর তলদেশে একটী ছিদ্র করিয়া ঐ ছিদ্র স্পঞ্জ দ্বারা বন্ধ করিবে, পরে ঐ কলসীর ভিতর এক ইঞ্চ পরিমাণ কয়লার গুঁড়াদ্বারা একটী স্তবক করিবে এবং তদুপরি পরিষ্কার বালুকার একইঞ্চ পরিমাণ অপর একটী স্তবক করিয়া তদুপরি ছোট ছোট নুড়ি দ্বারা ঢাকা দিবে। ইহা প্রস্তুত হইলে যে কোন জল হউক না কেন, (দূষিত হইলে গরম করিয়া লইতে হইবে) ঢালিয়া, ঐ কলসীর মুখ বাঁধিয়া নিম্নে একটী পাত্র দিয়া ঠাণ্ডা স্থানে রাখিবে। ফোঁটা ফোঁটা করিয়া যখন জল নিম্নের পাত্রে জমিবে তখন ঐ জল পান করিবে। ইহাতে সহজে দেশীয় ফিলটার বা পরিশ্রুত যন্ত্র প্রস্তুত হইবে।

৪। ঘোলা নদীর জল যে পাত্রে থাকে তাহাতে একটা কাবুলি বাদামের শাঁশ থেঁতো করিয়া দিলে, জল অতি পরিষ্কার হয়।

৫। মাথা ভার, মাথা বেদনা, মাথা ঘোরা প্রভৃতির আশু প্রতিকারক ঔষধ। ঘৃত কুমারির রস মস্তক মুণ্ডন করিয়া লেপন করিলে সর্ব্ব প্রকার শিরঃরোগ আরোগ্য হয়। এমন কি পাগল আরাম হইতে দেখা গিয়াছে।

৬। প্রায় দেখা যায় আগ্নেয় ক্রিয়ায় অনেকের পরিধেয় বস্ত্রাদি অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হইয়া থাকে। এমন কি সময়ে সময়ে ইহাতে অনেকেরই জীবন সংশয় হয়। সালফেড্ অফ এমোনিয়া কিম্বা ক্লোরাইড্ অফ্ জিন্‌ক অথবা টাইন্ ষ্টেট্ অফ সোডা জলের সহিত মিশাইয়া দিয়া ঐ জলে পরিধেয় বস্ত্রাদি ডুবাইয়া লইয়া শুষ্ক করতঃ ব্যবহার করিলে উক্ত দহন কার্য্য হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৭। সুন্দররূপে মুকুল বিকশিত করিবার উপায়—অর্দ্ধসের উষ্ণ জলে সালফেড্ অফ এমোনিয়া অর্দ্ধপোয়া, সোরা একছটাক, চিনি অর্দ্ধছটাক উত্তমরূপে মিশাইয়া একটী বোতলে ছিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে। ফুলগাছে জল দিবার সময় জলের সহিত উক্ত দ্রব পদার্থ কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিশাইয়া দিলে মুকুল উত্তমরূপে বিকশিত হয়।

৮। সর্পবংশ ধ্বংস করিবার উপায়। ভারতবর্ষে বৎসর বৎসর অনেক লোকের সর্পাঘাতে প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। মহাভারতে লিখিত আছে যে পুরাকালে মহারাজ জনমেজয় তক্ষক দংশনে পিতৃ মরণ শোকে অধীর হইয়া সর্পসত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সর্পবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে কদ্রুকুল নির্ম্মূল করিবার বিশেষ আয়োজন দেখা যায় না। মার্কিন দেশীয় সায়েণ্টিফিক আমেরিকান নামক বৈজ্ঞানিক পত্র বলেন যে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, ভারতবর্ষীয়েরা সর্পকুল ধ্বংস করিতে বিশেষ যত্নবান না হইয়া সর্পাঘাতের ঔষধ আবিষ্করণ করিতেই ব্যস্ত থাকিবে, কারণ ভারতবর্ষে তরুগুল্ম লতার এত প্রাচুর্য্য এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের এত প্রাবল্য যে সর্পগণ লোকালয়ের অনতিদূরেই সহজে নিরাপদ আশ্রয় ও প্রচুর আহার প্রাপ্ত হইয়া অতি অল্প কালের মধ্যেই অসংখ্য হইয়া উঠে। লোক-

সংখ্যার আধিক্য, অধর্ম্ম ভয়ে সর্প বিনাশে উদাসীনতা, শূন্যপদে ভ্রমণ, উত্তম ঔষধের অভাব ও সাধারণ লোকের ঔষধ উপেক্ষা করিয়া মন্ত্রে নির্ভর প্রভৃতি দোষে অসংখ্য লোক সর্পাঘাতে প্রাণ হারাইয়া থাকে। কোনপ্রকার কল পাতিয়া বা বিষ প্রয়োগ দ্বারা সর্পকে ধৃত বা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা, বিশেষ ফলপ্রদ হইবে না এবং তদ্দ্বারা সমূহ অনিষ্টও হইবার সম্ভাবনা। বোধহয়, সর্পভয়যুক্ত স্থানে এক বৃহদাকার পাত্র ভূমিসমতলের কিঞ্চিৎ নিম্নে বসাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ জল, ভেক কতকগুলি পিঞ্জরাবদ্ধ ইন্দুর বা ক্ষুদ্র হরিণ শাবক স্থাপন করিলে তদ্দ্বারা সর্প ধরিবার ও বিনাশ করিবার বিশেষ সুবিধা হইতে পারিবে। হরিণ ও ইন্দুর এরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে যে সর্প ব্যতীত কোন প্রাণী তাহাদিগকে ধরিতে না পারে। ব্রেজিল দেশে কোন সাহেবের এক বৃহৎ জল রাখিবার পাত্র ছিল; তাহাতে ছিদ্র হওয়াতে তিনি তাহা বাটীর নিকট এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখিলেন। ছিদ্র থাকিলেও তাহা হইতে জল সম্পূর্ণরূপে বাহির হইয়া যাইত না; সুতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ জল থাকাতে একদল ভেক আসিয়া তথায় বসতি করিল; মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশুপক্ষী আসিয়াও তাহাতে জল পান করিত। আহারান্বেষণে অনেক সর্প ঐ স্থানে আসিত এবং তাহার ভিতর পড়িয়া যাইত; পাত্রের গাত্র মসৃণ ছিল বলিয়া তথা হইতে আর পলাইতে পারিত না। পাত্রে পতিত হইলে সর্পকে সহজে বিনাশ করিতে পারা যাইবে; কিম্বা জীবন্ত ধরিতে ইচ্ছা করিলে তাহার গলায় ফাঁস লাগাইয়া উপরে তুলিলে সে কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না; তখন তাহাকে যথা ইচ্ছা রাখা যাইতে পারিবে। পর্ব্বতগুহা ও উষ্ণ অথচ আর্দ্র সুরক্ষিত স্থান সকলে অর্থাৎ যে সকল স্থান সর্পের ডিম্ব প্রসব করিবার উপযুক্ত স্থান—সেই সকল স্থান মধ্যে মধ্যে অন্বেষণ করিয়া ডিম্ব নষ্ট করাও কর্ত্তব্য। যে সকল প্রাণী সর্প বিনাশ বা ভক্ষণ করে তাহাদিগের দ্বারাও বিশেষ উপকার হইতে পারিবে। একদা স্কটলণ্ডের পশ্চিমস্থ কোন দ্বীপে সর্পের উপদ্রব হইয়া দ্বীপটী লোকশূন্য হইয়াছিল; পরে তথায় ছয় যোড়া ময়ুর প্রেরিত হইলে দ্বীপটী সর্প শূন্য হইয়া পুনঃ মনুষ্যের আবাস যোগ্য হইল। বেজি, গন্ধগোকুলা, বনশূকর, ময়ুর, সারস, বক এবং কোন কোন জাতীয় গৃধ্র দ্বারা অনেক সর্প নষ্ট হইতে পারে।

সম্পাদকের বক্তব্য।

বিগত অগ্রহায়ণ মাসে "হানিমান" সম্পাদক সমালোচন স্থলে লিখিয়াছেন, "বিজ্ঞান-দর্পণের "ভেষজ" প্রবন্ধে হোমিওপেথিক মত সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক" শুদ্ধ এই মাত্র বলিয়াই শেষ করিয়াছেন, কিন্তু সম্পাদকের আপন মত-সমর্থণকারী কোন প্রমাণ দেখান নাই; শুদ্ধ "ভ্রান্তি মূলক" বলিলেই যে সমালোচনা করা হইল বলা যাইতে পারেনা। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য ভেষজের কোন্ কোন্ স্থলে ভ্রম প্রকাশিত হইয়াছে? তিনি অনুগ্রহ করিয়া প্রমাণসহ সেই ভ্রমগুলি বাহির করিয়া দিলে আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব।

আলোক-বিজ্ঞান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কোন দ্রব্য উত্তপ্ত হইলে তদীয় উত্তাপের কিয়দংশ পরিতোবর্ত্তী ঐ থরীয় (বা অতীব সুক্ষ্মতম বায়বীয়) যানে (Medium) নীত হয়। এই তাপের শক্তি ঐ থরীয়যানে উর্ম্মিবৎ-স্পন্দন স্বরূপ সঞ্চালিত হইয়া, প্রতি সেকেণ্ডে ৯৩,০০০ ক্রোশ প্রচণ্ড বেগে গমন করে। উত্তপ্ত পদার্থের তাপপরিমাণ সমধিক না হইলে উর্ম্মিবৎ স্পন্দন দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না, কেবল জ্যোতিঃহীন তাপের অদৃশ্য রশ্মিরূপে উপলব্ধি হইতে থাকে; যথাঃ—ফুটন্ত জল হইতে বিনির্গত তাপের রশ্মি; কিন্তু যেমন তাপাংশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কতিপয় লোহিত রশ্মি নয়নগোচর হইতে আরম্ভ হয় এবং এ অবস্থায় দ্রব্যটী লোহিত বর্ণে উত্তপ্ত বলিয়া অভিহিত হয়। তাপাংশ আরো উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দ্রব্যটী প্রথমে পীত, তৎপরে শুভ্রবর্ণে উত্তপ্ত হইয়া পরিশেষে সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান ভাবে প্রজ্জলিত হইতে থাকে।

এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে রশ্মি দ্বিবিধ; যথা—১ম—জ্যোতিঃহীন তাপ রশ্মি, ইহা অদৃশ্য বা দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যাতীত। ২য়—জ্যোতির্ম্ময় আলোক রশ্মি, ইহা দৃশ্য বা দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য।

পদার্থ-বিদ্যার যে বিভাগ দ্বারা এই জ্যোতির্ম্ময় রশ্মির তত্বাদি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে আলোক-বিজ্ঞান কহে।

দ্রব্য সমূহ আলোক সম্বন্ধে দুই ভাগে বিভক্ত—১ম—স্বচ্ছ, যাহার মধ্যদিয়া আলোকাংশু গমনাগমনে সমর্থ। ২য়—অনচ্ছ (Opaque) যাহার মধ্যদিয়া ইহা গমনাগমনে অসমর্থ।

দীপ্তিরশ্মি একই মার্গ মধ্যদিয়া যাতায়াত কালে ঋজু রেখায় গমন করে, কিন্তু এক হইতে অপর ঘন বা বিরলতর মার্গে (মিডিয়ম) প্রবেশ কালীন ইহার কিয়দংশ প্রতিফলিত হয় আর অবশিষ্টাংশ পূর্ব্বানুসৃত পথ নির্দ্দেশক রেখার দিক পরিত্যাগ করিয়া অন্তবিধ দিকে, এই অপর পদার্থ মধ্যদিয়া গমন করে; ইহাকেই আলোকাংশুর তির্য্যক্ বা বক্রগতি কহা যায়।

দীপ শিখাদিরূপ সন্নিহিত জ্যোতির্ব্বিন্দু হইতে বিকিরণ কালে রশ্মিচয় বিস্তৃত হইয়া নয়নোপরি পতিত হয়, কিন্তু নক্ষত্রাদি রূপ সুদূর জ্যোতির্ব্বিন্দু হইতে বিকীর্ণ [illegible]বিন্দু সমান্তরাল রেখায় আসিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে।

দীপ্তি-প্রবলতা।—দূরত্বের [illegible]

[illegible]

লোমে দীপ্তি প্রবলতার হ্রাস হয় অর্থাৎ কেন্দ্র হইতে ১ পাদ দূরে দীপ্তির প্রবলতা যত, ২ দুই পাদ দূরে দুয়ের বর্গ সংখ্যা ৪ চারি গুণ হ্রাস বা ¼ হইবে।

জ্যোতির্গমন বেগ।—দিনেমার জ্যোতির্ব্বেত্তা রোমার, বৃহস্পতি গ্রহের চন্দ্রগ্রহণ দৃষ্টে জ্যোতির্গমন বেগ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। চন্দ্র আমাদের আবাস ভূমণ্ডলের একটী মাত্র পারিপার্শ্বিক; কিন্তু বৃহস্পতি গ্রহের এইরূপ চারিটী পারিপার্শ্বিক চন্দ্র আছে। বৃহৎ দূরবীক্ষণ সহকারে বৃহস্পতির প্রথম পারিপার্শ্বিক চন্দ্র এতচ্ছায়া মধ্য দিয়া গমনকালীন অবিকল ৪২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট্ ৩৬ সেকেণ্ড্ পর অন্তর্হিত হইতে দেখা যায়।

পৃথিবী যখন বৃহস্পতির সাতিশয় সমীপবর্ত্তী হয়, তখন উভয়েই সূর্য্যের একই পার্শ্বে ও একই রেখায় (সমসূত্রে) অবস্থিত থাকে। আর যখন বৃহস্পতি হইতে অতি দূরবর্ত্তী হয়, তখন উভয়েই সূর্য্যের সমসূত্রে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পার্শ্বে অবস্থিত থাকে; ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এতদবস্থা দ্বয়ে দূরত্বের প্রভেদ পৃথিকক্ষের ব্যাসের পরিমাণ তুল্য; (১ম চিত্রে—প=পৃথিবী, স=সূর্য্য, ব=বৃহস্পতি)।

পৃথিবী বৃহস্পতি হইতে সুদূরে অবস্থান সময়ে ইহারে প্রথম পারিপার্শ্বিক চন্দ্রের গ্রহণ ১৬ মিনিট্ ৩৬ সেকেণ্ড বিলম্বে সংঘটিত হয় দেখিয়া রোমার জ্যোতিরশ্মি পৃথিকক্ষের ব্যাস-পরিমাণ-দূরতা ভ্রমণ করিতে ১৬ মিনিট্ ৩৬ সেকেণ্ড কাল আবশ্যক করে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। ইহা হইতে জ্যোতির্গমন বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৯৫,০০০ ক্রোশ স্থিরীকৃত হইয়াছে।

যদিও আমরা সূর্য্য হইতে ৪,৫৬,০০০০০ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত তথাপি ৮ মিনিটের মধ্যে সূর্য্যালোক আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, আর যদি কোন উপায়ে সৌরজ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত করার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলেও জ্যোতিঃ নির্ব্বাণের ৮ মিনিট্ অগ্রে আমরা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতাম না।

দূরে তোপ বা বন্দুক ছুড়িলে আদৌ তদীয় জ্যোতিঃ নয়ন পথে আবির্ভূত হয়, এবং কতিপয় সেকেণ্ড পর শব্দ কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, শব্দ, জ্যোতির পশ্চাৎ পড়িয়া থাকে; বস্তুতঃ জ্যোতিঃ ও শব্দ একই মুহূর্ত্তে কামান হইতে বহির্গত হইয়া প্রত্যেকে আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিতে কিছু সময় আবশ্যক করে, জ্যোতিঃ জয়ী হইয়া অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয় আর শব্দ পশ্চাৎ ভাগে

পড়িয়া থাকে, কারণ জ্যোতির্গমন বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৯৫,০০০ ক্রোশ, আর শব্দ গতি বেগ ঐ সময়ে ১০০০ পাদ মাত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আলোক প্রতিবিম্বন।

১। সামতলিক দর্পণ হইতে আলোক রশ্মি সামতলিক দর্পণ বা অতীব নির্ম্মল ও মসৃণ ধাতুখণ্ডের উপর পতিত হইলে ইহার অধিকাংশ তৎপৃষ্ঠ হইতে প্রতিফলিত হয়। আলোক প্রতিবিম্বনের নিয়ম অবিকল শব্দ প্রত্যাবর্ত্তনের অনুরূপ অর্থাৎ প্রতিবিম্বন কোণ পাতন কোণের তুল্য এবং উভয় পাতিত ও প্রতিফলিত রশ্মি-পথ নির্দ্দেশক রেখা দর্পণ পৃষ্ঠোপরি লম্বভাবে অঙ্কিত সমতলে অবস্থিত। ২য় চিত্রে মনে করুন দ দ´ একখানি দর্পণ, ক জ্যোতিষ্মান্ বিন্দু হইতে ক খ রশ্মি এতদুপরি পড়িতেছে, দর্পণ ও রশ্মি পথ নির্দ্দেশক রেখা ক খ এর সম্পাত বিন্দু খ হইতে খ গ লম্ব উত্তোলিত হউক। ক খ রশ্মি দর্পণ পৃষ্ঠ হইতে খ ঘ রেখায় প্রতিফলিত হওন কালীন ক খ ও খ গ অন্তর্গত ক খ গ কোণ খ ঘ ও খ গ অন্তর্গত ঘ খ গ কোণের তুল্য হইয়া থাকে; ক খ গ পাতিত কোণ ও ঘ খ গ প্রতিফলিত বা পুনরাবর্ত্তিত কোণ নামে অভিহিত; এবং উভয় পাতিত ও প্রতিফলিত রশ্মি পথ নির্দ্দেশক রেখাদ্বয় ক খ ও খ ঘ দর্পণ পৃষ্ঠোপরি লম্ব ভাবে অঙ্কিত ক খ গঘ সমতলে অবস্থিত।
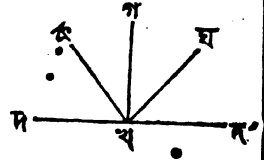
সূর্য্য বা তাড়িতালোক অন্ধকার গৃহে, কোন রন্ধ্র মধ্যদিয়া প্রবেশ করাইয়া দর্পণোপরি পাতিত করিলে, দর্পণোপরি আলোক রশ্মির প্রতিফলনের অগ্রে ও পরে, তদীয় পথ প্রদীপ্ত ভাসমান ধূলিকণাদ্বারা স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষীভূত হইবে। আর্শি চাক্রবালিক (Horizontal) সমতলে সংস্থাপিত হইলে, পাতিত ও প্রতিফলিত রশ্মি উর্দ্ধাধঃ (Vertical) সমতলে পরিলক্ষিত হয়।

কোন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সামতলিক দর্পণের সম্মুখে রাখিলে, তদীয় প্রতিরূপ আর্শির পশ্চাতে আছে এরূপ ভাবে জ্যোতিরশ্মি চক্ষুতে আসিয়া সংলগ্ন হয়। কিন্তু বাস্তবিক আর্শির পশ্চাতে কিছুই নাই।

জ্যামিতি ব্যতিরেকে প্রতিবিম্বনের নিয়ম সম্যক প্রকারে হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসাধ্য, তথাপি সামতলিক দর্পণ হইতে প্র[illegible]রূপ উৎপন্ন হওয়ার নিয়ম পার্শ্বস্থ প্রতিকৃতিটী দ্বারা কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইতে পারে।

৩য় চিত্র।
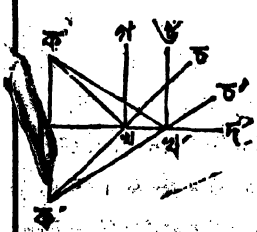
এই প্রতিকৃতিটীতে ক জ্যোতিষ্মান্ বিন্দু, এতদ্‌রশ্মি ক খ ও কার্য্য রেখায় খ খ´ বিন্দুদ্বয়ে দর্পণোপরি পতিত হইতেছে। রশ্মিপথ নির্দ্দেশক রেখাদ্বয় দর্পণের খ খ´ বিন্দুদ্বয় হইতে প্রতিফলিত হইয়া খ চ ও খ´ চ´ রেখায় চ, চ´ বিন্দুদ্বয় দর্শক চক্ষুতে গিয়া সংলগ্ন হইতেছে অর্থাৎ চ, চ´ বিন্দুদ্বয় হইতে দর্শক চক্ষু-ক জ্যোতিষ্মান্ বিন্দুর প্রতিবিম্বন অবলোকন

করিতেছে। এস্থলে ক খ এর পতন অবনতি খ চ এর পতন অবনতির তুল্য ও ক খ´ এর পতন অবনতি খ´ চ´ এর পতন অবনতির তুল্য অর্থাৎ গ খ ও ঙ খ´ লম্ব স্বরূপ খ ও খ´ বিন্দু হইতে অঙ্কিত হইলে ক খ গ পাতিত কোণ গ খ চ প্রতিফলিত কোণের এবং ক খ ঙ পাতিত কোণ ঙ খ´ চ´ প্রতিফলিত কোণের তুল্য হয়। এখন খ চ ও খ´ চ´ প্রতিফলিত রশ্মির পথ-নির্দ্দেশক রেখাদ্বয় দর্পণের অপর পার্শ্বে বৃদ্ধি করিলে ক´ বিন্দুতে গিয়া সম্মিলিত হয়। জ্যোতিষ্মান্ ক বিন্দু দর্পণের যতদুর উচ্চে অবস্থিত, এই ক´ বিন্দু তাহার ততদুর নিম্নে নিপতিত সুতরাং রশ্মিচয় দর্পণের অপর পার্শ্বস্থ ক´ বিন্দু হইতে দর্শকের চক্ষুতে আসিয়া সংলগ্ন হইতেছে এরূপ বোধ হয় এবং জ্যোতিষ্মান্ বিন্দু ক দর্পণের যতদুর সম্মুখে সংস্থাপিত, প্রতিবিম্বিত প্রতিরূপ ক´ বিন্দু তাহার ততদুর পশ্চাতে অপসারিত।

সামতলিক দর্পণোপরি প্রতিমূর্ত্তি উৎপাদন নিয়মের জ্যামিতিক প্রমাণ—মনেকরুন (পূর্ব্বাঙ্কিত প্রতিকৃতি) ক একটী জ্যোতিষ্মান্ বিন্দু দ দ´ একখান সামতলিক দর্পণ এবং দর্শক চক্ষু চ, চ´ হইতে জ্যোতির্ম্ময় ক বিন্দুর প্রতিবিম্বন দৃষ্টি করিতেছে অপিচ ক ক´ ও ও গ খ রেখাদ্বয় দর্পণোপরি লম্বভাবে পাতিত।

যে হেতু খ চ, ক খ এর প্রতিবিম্বন, পূর্ব্বোক্ত প্রতিফলন নিয়মানুসারে ক খ গ কোণ গ খ চ কোণের সমান ; কিন্তু ক খ গ কোণ, খ ক ক´ কোণের সমান কারণ ক ক´, খ গ এর সমান্তরাল (১ম অধ্যায়, ২৮। ২৯ প্রতিজ্ঞা) ; অপিচ প্রোক্ত হেতুতে গ খ চ কোণ, খ ক´ ক কোণের তুল্য, সুতরাং খ ক ক´ কোণ, খ ক´ ক কোণের তুল্য। এখন ক খ দ ও ক´ খ দ ত্রিভুজদ্বয়ের খ ক দ কোণ খ ক´ দ কোণের সমান, খ দ ক ও খ দ ক কোণ প্রত্যেকে সমকোণ এবং খ দ বাহু উভয় ত্রিভুজে সাধারণ অতএব ক দ বাহু দ ক এর সমান (১ম অধ্যায় ২ প্র) অর্থাৎ ক জ্যোতিষ্মান্ বিন্দু দর্পণের যতদুর উপরে বা সম্মুখে অবস্থিত থাকে ক প্রতি ফলিত বিন্দু তাহার ততদুর নিম্নে বা পশ্চাতে অপসারিত হয়।

এতন্নিবন্ধন দর্পণে কেহ নিজ প্রতিরূপ দেখিবার কালীন স্পষ্টই বোধ হয় যেন দর্শক যতদূর দর্পণের সম্মুখভাগে অবস্থিত, প্রতিরূপ ও তাহার ততদুর পশ্চাৎভাগে অপসারিত অর্থাৎ দর্শক, উত্তরোত্তর আর্শির দিকে যত সমীপবর্ত্তী বা তাহা হইতে যত দূরবর্ত্তী হইতে থাকেন পশ্চাদ্ভাগস্থ প্রতিরূপ ও ক্রমে তৎসমীপাগত বা দূরাপসৃত হয়।

যদিও প্রতিফলিত, মূর্ত্তিদর্শকের অবিকল প্রতিরূপ, তথাপি এতদুভয়ে এই প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়—দর্শকের দক্ষিণ হস্ত প্রতিবিম্বের বামহস্ত এবং সমস্ত দক্ষিণ পার্শ্বই প্রতিবিম্বের বাম পার্শ্ব বলিয়া অনুভূত হয়। যদিও উর্দ্ধাধোভাবে সংস্থাপিত দর্পণে মানবীয় প্রতিরূপ ঋজু দেখায়, তথাপি দর্শকের দক্ষিণ চক্ষু প্রতিরূপের বামচক্ষু ও দক্ষিণ হস্ত বামহস্ত বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ সংস্থাপিত দর্পণের সম্মুখীন ভিত্তিতে যদি রীতিমত বাম হইতে দক্ষিণে ক খ গ ঘ ঙ প্রভৃতি কতিপয় অক্ষর অঙ্কিত করা যায়, তবে দর্পণে ইহার প্রতিবিম্বন দক্ষিণ হইতে বামদিকে যেন অঙ্কিত হইয়াছে এরূপ দেখায়।

কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দু আর্শির সম্মুখে যতদূরে অবস্থিত, তৎপ্রতি বিম্বিত মূর্ত্তি তাহার ততদূর পশ্চাদ্ভাগে অপসৃত, এই মূল সূত্র স্মরণ রাখিলে প্রতিফলিত মূর্ত্তির এই সমস্ত বৈলক্ষণ্য অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

২। কটাহবৎ (Concave) মধ্য নিম্ন দর্পণ হইতে আলোক প্রতিবিম্বন।—

দুইখান উজ্জ্বল কটাহবৎ মধ্য নিম্ন দর্পণ, পাঁচ ছয় পাদ অন্তর সম্মুখাসম্মুখি ভাবে সংস্থাপিত রাখিয়া, এক স্থানের অধিশ্রয়ণে একটী লোহিত বর্ণোত্তপ্ত গোলা ও অপর স্থানের অধিশ্রয়ণে হস্ত রাখিলে শীঘ্রই তাহা অত্যুত্তপ্ত বোধ হইবে। এই প্রকার দুই খান বৃহৎ দর্পণ, পরস্পর হইতে পঞ্চাশ পাদ অন্তর সংস্থাপিত হইলেও, একস্থানের অধিশ্রয়ণে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি রাখিয়া, অপর স্থানের অধিশ্রয়ণস্থ মাংসের শিক্‌কবাব প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহার যুক্তি এই যে—প্রথমোক্ত দর্পণের অধিশ্রয়ণস্থ অগ্নির তাপের রশ্মি তদুপরি বিক্ষিপ্ত ও তাহা হইতে সমান্তরাল রেখায় প্রতিফলিত হইয়া দ্বিতীয় দর্পণোপরি নিপতিত হয়, পরে রশ্মিচয় পুনঃ প্রতিফলিত হইয়া এতদ্ অধিশ্রয়ণে একত্রীভূত থাকে, তদ্‌হেতু এই স্থানে শিক্ উপরিস্থ মাংসের কাবার পক্ক হয়। এইরূপে একের অধিশ্রয়ণস্থ জলন্ত অগ্নির প্রতিবিম্ব অপরের অধিশ্রয়ণে নীত হইয়া মাংসের শিক্‌কবাব রন্ধনে সক্ষম হয় (৪র্থ চিত্র, অ=অগ্নি, ম=মাংস)।
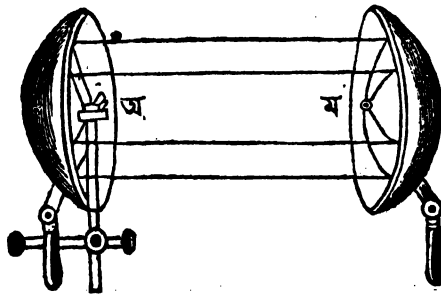
শ্রীশ্রীনাথ সিকদার।

ক্রমশঃ

সামুএল হানিমান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মহত্ব—চিত্তের ব্যাপকতা মাত্র। আকর্ষণী শক্তি তাহার মানদণ্ড। যাহার যত আকর্ষণী শক্তি আছে এজগতে তিনি তত বড়। যাহার সে শক্তি নাই তাঁহার মহত্বতার প্রকাশ নাই। এখিলুল বিশ্বকে যাহার আত্মজ্ঞান তিনিই মহত্তম। এটী মহত্তের চরম কল্পনা মাত্র। যেমন অনন্ত আকাশের উপলব্ধি হয় না, এ মহত্তম ভাবেরও সেইরূপ উপলব্ধি

নাই। ফলে নিখিল সংসারে সেই চরম কল্পনাকে সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। প্রকৃতি সুন্দরী প্রতি নিয়তই নাচিতে নাচিতে সেই উচ্চমুখে ছুটিতেছে; তাহার সেই পথ—সেই গতি—সেই শক্তি—সেই নিয়তি—সেই উপাস্য দেবতা। কেহ বলিলেও যাহা, কেহ না বলিলেও তাহা। ইহার পক্ষাপক্ষ নাই—অনুকূল প্রতিকূল নাই। আমরা সকলেই জ্ঞানত বা অজ্ঞানত সেই উপাস্য দেবতার অনুসরণ করিয়া থাকি। ইহা স্বভাবের একটী অপরিহার্য্য নিয়ম। সুতরাং প্রকৃতির তন্ময় জীবনে সার ও সত্যই স্থায়ী; অসার ও অসত্য অস্থায়ী। সার মিছ্রীর দানার মত জমিয়া যায়। মনুষ্যের কর্ম্মসূত্রের চতুর্দ্দিকে সারত্ব বর্ত্তে—সৎ ও সত্য কৃতসংলগ্ন হইতে থাকে। দানার উপর দানা—স্তরের উপর স্তর—সৌন্দর্য্যের উপর সৌন্দর্য্য অনবরত সাজিতে থাকে। অসার ও অসত্য ক্রমে ঝরিয়া পড়ে। যে দেশ, যে সময়, যে অবস্থাই হউক না কেন, মনুষ্যকে সত্যের পূজা, সতের সেবা, শক্তির আরাধনা করিতেই হইবে। এ স্বভাবের বেগ কেহ কখন সম্বরণ করিতে পারেনও নাই, পারিবেনও না। শাক্য সিংহ, ইষা, মুসা, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য, প্লেটো, সেনেকা, ভল্‌টেয়ার, কোম্ত, ডার্বীন প্রভৃতি সকলেরই তত্ত্বমূলে সেই একই কথা—একই ভাব। তত্ত্বের সেই আদি, তত্ত্বের সেই অনন্ত। তত্ত্বসন্ধিৎসু মাত্রেরই সেই একই লক্ষ্যস্থল।

স্বভাবের অন্যান্য শক্তির মত হৃদয়—শক্তিরও বিনাশ নাই। ইহাও কারণবশতঃ এক পথ হইতে অন্যপথে চলিয়া যাইতে পারে; কিন্তু কখনও একবারে বিনষ্ট হইতে পারে না। কখন কোথাও বা সাম্যভাবে থাকে, আবার অবসর পাইলেই বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার মৃত্যু নাই—নির্ব্বাণ নাই; তাহা সতত সজীব, কার্য্যকর, ও কার্য্যদক্ষ। যে শক্তিরও তাড়িতের মত প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক দুইটী বাহু আছে—চুম্বক শলাকার মত তাহার ও সীমাদ্বয়ে দ্বিবিধ কার্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে। সেই জন্য যাহাতে মনের উচ্চতা জন্মে, সীমান্ত প্রযুক্ত তাহাতেই নীচতা বর্ত্তিতে দেখা যায়। ভক্তিতে মন ত উত্তেজিত করে, অতিরেক দোষে ততই হৃততেজ করিয়া ফেলে। দিবানিশি পূজা করিতে গেলে পূজক হইয়া পড়িতে হয়—হৃদয়ের প্রভুত্বশক্তি একবারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। বোধ হয়, অষ্টপ্রহর ভজনপূজনই আর্য্যজাতীর পতনের একমাত্র না হউক, একটী প্রধান কারণ বটে। "বড়র" নিকট অনবরত বিনত হইয়া থাকিতে হইলে লোকে ত্বরায় অধম ও অপকৃষ্ট হইয়া পড়ে। সৌন্দর্য্যে চিরন্তন মুগ্ধ হইয়া থাকিলে হেয় ও অপদার্থ হইতে হয়। সকল বিষয়েরই মাত্রা আছে। মাত্রাহীন জীবনে পর্দ্দা নাই; পর্দ্দাহীন জীবনে সুর থাকিতে পারে না; বেসুরা জীবনেও ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম মনুষ্যচরিত্রের সুর বিশেষ। অভ্যাসদোষে কার্য্যের মাত্রা থাকে না—হৃদয়ের হৃদয়ত্ব যায়—বিবেচনা লোপ পায়—ধর্ম্ম, বার, ব্রত ও কথাচ্ছটা হইয়া পড়ে। আমরা অভ্যস্ত পথ দেখিয়া চলি না; অভ্যস্ত কার্য্যে বুদ্ধি খেলাই না; অভ্যস্ত সুখদুঃখে সুখদুঃখ অনুভব করি না। বরং অভ্যাসস্থলে বিবেককে অনেকটা বলি [illegible] অভ্যাস আফীমের মত অনায়াসে বাড়িয়া যায়, অথচ সেবক বিশের

জানিতে বা বুঝিতে পারে না। স্থতরাং যেখানে হৃদয় নাই, বিবেচনা নাই, স্বাবলম্বন নাই, মনুষ্য কাষ্ঠপুত্তলির মত, সেখানে কার্য্যের মাত্রা কোথায়—পর্দ্দা কোথায়? এই হেতু লোকে সত্যের পূজা করিতে করিতে মিথ্যার পূজা করিয়া বসে, সতের আরাধনা হইতে অসতের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়; শিবের অর্চ্চনা হইতে যণ্ডের অর্চ্চনায় পরিণত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমরা দেবতার হৃদয় পূজা না করিয়া চরণ পূজায় চরিতার্থ হই। নিয়ত বিনত, ভূপতিত, গলবস্ত্র, মন হৃদয় অবধি উঠিতে সাহস পায় না; চরণারবিন্দে লুণ্ঠিত থাকে। "বড়র" এই নিমিত্তই সকলই বড় দেখায়। ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে কল্পনার সীমান্তে লইয়া যাইতে প্রয়াস পায়। তাঁহার সকলই অমানুষিকত্বে বরণ করে। সাধারণ মনুষ্যের মত তখন আর তাঁহার কিছুই থাকে না। এইরূপ নিয়ত মনকে সীমান্তে টানিয়া বাড়াইতে বাড়াইতে তাহার স্থিতিস্থাপক গুণ একবারে লোপ পায়। কল্পনার সীমান্তে উঠিয়া দর্শন-বিজ্ঞানের ন্যায্যপথে আর আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চায় না। এই জন্য আমরা যাহাকে "বড়" বলিতে চাই অগ্রেই তাহার সকলি অমানুষিক প্রত্যাশা করি। তাঁহার আর সাধারণ মনুষ্যের মত ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকিবে না—কেননা তিনি বড়! অনশনে না থাকিতে পারিলে মহাপুরুষ হয়না! তাঁহার হস্তপদ থাকিলে সাধারণের মত ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য;—তিনি ঊর্দ্ধবাহু, গৃহে থাকিলেও তাঁহাকে বনে বাস করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার মহত্ব কোথায়? যখন একবার মনে সেইরূপ ধারণা হইল, ভক্তি তখনই বদ্ধমূল হইতে লাগিল; বিমুগ্ধ মনুষ্য তখন দোষের ও পূজা করিতে তৎপর; তখন অপকর্ম্ম সমস্ত লীলা হইয়া পড়িল; কুটিলতা সরল পথে দাঁড়াইল; অন্ধকার আলোকময় বোধ হইল; কালিমমূর্ত্তিও চন্দ্রত্ব পাইল; অসত্য সত্যের সিংহাসনে আরূঢ় হইল। *

আমাদের হানিমান একজন মনুষ্য—দেবতা নহেন। তিনি নির্গুণেরও নহেন—নির্দ্দোষেরও নহেন। আমরা তাঁহার গুণকে গুণ এবং দোষকে দোষ বলিব। একাধারে মনুষ্যের সকলই গুণ থাকিতে পারে না। মনুষ্য দোষগুণের সমষ্টি। "বড়" মানুষ— 'বড়" মানুষ। মানুষের পূজা অবিধি। হানিমান সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা করিবার কিছুই নাই। জীবনচরিত কাব্য নহে। চরিতাখ্যায়ক অর্থে পূজক নহে। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লোপ করিয়া দেবত্বে বরণ করায় সত্যের অপমান। যিনি যেমন তাঁহাকে তেমনই ভাবে দেখা উচিত। গুণ অপহরণ করা ও দোষ গোপন করা সমান পাপ। ক্রমওয়েল্ বলিয়াছিলেন, "আমি যেমন আমাকে সেইরূপ চিত্র করিও।" রামের নাম ধরিয়া শ্যামকে ডাকা মূঢ়ের কর্ম্ম। হানিমানের নামে শাক্যসিংহের জীবনী পর্য্যবসিত করার ফল? হানিমানের হানিমানত্ব সপ্রমাণই আবশ্যক। ঘটের ঘটত্ব নাই—পটের পটত্ব; ঘটের পটত্ব প্রমাণে প্রয়াস পাওয়া নিষ্প্রয়োজন। পার্থক্য লোপ করা জীবনীর উদ্দেশ্য নহে। চরিতা-খ্যায়ক ও আলেখ্য লেখকের কার্য্য সমান।

* The Gods of fable are the shining moments of great men.—Emerson's Representative men.

যেমনটী দেখিবে, তেমনটী লিখিবে। কল্পনাবলে নূতন জীবন সৃজন করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিবার আবশ্যক নাই।

হানিমান সম্বন্ধে আমাদের নূতন কিছুই বলিবার উদ্দেশ্যও নাই—সঙ্গতিও নাই। প্রায় সর্ব্বদেশেই স্বজাতীয় ও বিজাতীয় লেখকে তাঁহার জীবন-চরিত লিখিয়াছেন ও সমালোচন করিয়াছেন। নিজেও তিনি পরিষ্কার ভাবে কিয়দংশ আত্মবৃত্তান্ত জগতে রাখিয়াগিয়াছেন। আমরা এইরূপ কয়েক খানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সংক্ষেপে এই ক্ষুদ্র জীবনী লিখিলাম। সংগ্রহের দোষ ব্যতীত অন্যকোন দোষ আমাদিগের দোষ নহে। তবে যতদূর পারিয়াছি বাছিয়া লইয়াছি। পরস্পর বিবরণ মধ্যে মধ্যে এতাদৃশ বিসদৃশ যে হটাৎ বাছিয়া লওয়াও সুকঠিন। হানিমান সম্বন্ধে যে সকল কথা সর্ব্ববাদীসম্মত ও সঙ্গত তাহাই এস্থলে বিবৃত হইল। তিনি আশৈশব বিলক্ষণ সুস্থ ও সবল ছিলেন। কিন্তু তাঁহার গঠন দেখিতে বলিষ্ঠ ছিল না। তাঁহাকে দেখিলেই বুদ্ধিমান কর্ম্মঠ বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার আকার ও অবয়ব দীর্ঘ ও প্রশস্ত ছিল না। ললাট উচ্চ ও বিশাল; মস্তকটী বর্দ্ধিতায়তন, এমন কি তাঁহার মস্তিষ্ক-শক্তি জানিবার অগ্রেই তাঁহাকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা হইত। লোচনদ্বয় নীলিম, বিস্ফারিত, স্বচ্ছ, এবং তীব্র অথচ সরলতামাখা। কিন্তু শ্রমজীবী লোকের মত তাঁহার মূর্ত্তি কতকটা রূঢ় ছিল। মুখ লাবণ্যহীন, দেখিতে কর্কশ; কিন্তু সেই রূঢ়মূর্ত্তিরূপ উপল খণ্ডের মধ্যে যিনি প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন তিনি সেই নির্ম্মলসলিল হৃদয়স্রোত দেখিয়া অবশ্যই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি কর্কশ ছিল বটে; কিন্তু উগ্র নহে—বিনীত ও নম্র প্রকৃতি স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার মুখে দেখা যাইত। তাঁহার বাল্যাবধি ব্যায়ামাদির বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল। বৃদ্ধাবস্থাতেও তিনি প্রত্যহ নিয়মিত পাদচারণ করিতেন। হানিমান সন্তরণ, অশ্বারোহণ প্রভৃতিতেও পটু ছিলেন। তাঁহার অগ্নিশক্তিও বিলক্ষণ ছিল—প্রচুর পরিমাণে আহারাদি করিতে পারিতেন। জীবনের মধ্যে তামাক ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন বিষয়ে অমিতাচার দেখা যায় না। এই সকল কারণবশতঃই এতাদৃশ মস্তিষ্ক চালনেও তাঁহার কখন কোন স্নায়োবীয় রোগ জন্মে নাই। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চক্ষের ও মনের জ্যোতিঃ সমান প্রবল ছিল। বৃদ্ধাবস্থায় এক দিনের জন্যও কখন চস্‌মা ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার চালচলন "সাদাসিদা" ছিল। "সাদা সিদে" অর্থে কেমন এক রকম নহে। যে পরিচ্ছদ দেখিলে "অমুক যাইতেছে" বলা যায় তাহা "সাদাসিদা" অন্যায্যপারিপাট্যশূণ্যকে "সাদাসিদা" বলা যায়। ল্যাপলেণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে মোটা চাদর ও তালতলার চটী সাদা চাল নহে। হানিমানের পিতার গঠন, ভাব, ইঙ্গিত, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি তাঁহাতে বর্ত্তিয়াছিল; এবং বিশেষ সেই গঠনের পারিপাট্য তাঁহার শেষাবস্থা পর্য্যন্তও ছিল। শারীরিক ক্লান্তি কাহাকে বলে, তাহা তিনি এক দিনের জন্যও জানিতেন না। তাঁহার শরীরের বড় বড় অস্থি ও পেশীগুলি পরিষ্কার দেখা যাইত। কখনও মেধাবৃত হয় নাই। পরিশ্রমের নিকট মেধ আসিতে পারে না। যখন পলিত কেশ, গলিত দন্ত, তখনও তিনি উন্নত; তাঁহার গলা পরিষ্কার; মতের পরিষ্কার; কিপ্রকারে তিনি যে শরীরধর্ম্ম রীতিমত পালন করিয়াছিলেন তাহার আর

অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুস্থ শরীরে ৯০ ই বৎসর কয়জন লোক জীবিত থাকে? স্বল্পায়ু দুঃখের কথা বটে, কিন্তু অসুস্থ দীর্ঘজীবনে সুখ কোথায়? আলিবার্ট বলেন, বুদ্ধিজীবী লোকেই দীর্ঘজীবী হয়। ফলে জীবনশক্তির আতিশয্য প্রতিভা, কি না, একথা আমরা বলিতে সাহস পাইনা।

হানিমানের অদ্ভুত কার্য্যশক্তি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন কোন লোকের কখন কখন অমানুষিক কার্য্যশক্তি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু উহা বিকারের বলের মত অনায়ত্ত, অস্বাভাবিক ও অস্থায়ী। হানিমানের সেরূপ নহে। তাঁহার কার্য্যশক্তি সমবায়ী; অত্যন্ত অধিক, অথচ একসুরে, এক তানে আজীবন প্রকাশ পাইয়াছিল। সে শক্তি গুপ্ত (Latent) ও প্রত্যক্ষ (Activo) দ্বিবিধই ছিল। গুপ্তশক্তি তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়কে অবরোধ সৌন্দর্য্যে পরম রমণীয় করিয়াছিল, এবং তাঁহার সেই নীলিম লোচনদ্বয়ে অন্যবিধ শক্তি যেন সতত লীলা করিত। ভাবিয়া দেখ, ত্রয়োদশ বৎসরের বালক গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় এতদূর পারদর্শী যে তদ্বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেছেন; বিংশতি বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সময় অষ্ট প্রকার ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন কেশরী। তিনি ৯০ই বৎসর জীবিত ছিলেন; তন্মধ্যে ৮০ বৎসর অনর্গল মানসিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। মধ্যে কয়েক বৎসর নিজ অভিষ্টসিদ্ধির জন্য প্রতি তৃতীয় রজনী জাগরণে গিয়াছিল। স্বয়ং ভিন্ন ভিন্ন ৯০ই টী ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছেন। রসায়ন ও ঔষধ সম্বন্ধে সপ্ততির অধিক নূতন গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে অনেকগুলি বৃহদাকারেরও আছে। এতদ্ভিন্ন কৃষি, রসায়ন, ভৈষজ্য প্রভৃতি নানা বিষয়ক ২৪ খানি গ্রন্থ ইটালী, ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, লাটিন ও গ্রীক হইতে অনুবাদ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অনেকগুলি এক বালামের অধিক। এতদ্ব্যতীত কত সহস্র রোগীর যে চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। আবশ্যক মত সেই সকল চিকিৎসিত রোগের লক্ষণাদি লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঐরূপ ৩০ খানি স্বহস্ত লিখিত পুস্তক আছে, তাহার এক এক খানি ৫০০ শত পৃষ্ঠার ন্যূন নহে। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসকদিগের সহিত পরামর্শ ও লিপি দ্বারায় ব্যবস্থা ও ছিল। আর যেরূপ তন্ন তন্ন করিয়া তিনি রোগী দেখিতেন, তাহাতে যে কতদূর পরিশ্রম ও যত্ন আবশ্যক তাহা সদৃশমতাবলম্বী মাত্রই বুঝিতে পারেন। বিশেষতঃ তাঁহার মত ধর্ম্মভীত লোকের পক্ষে ইহাপেক্ষা আর কিছুই গুরুতর ভার হইতে পারে না। যিনি কর্ত্তব্যের জন্য চিকিৎসাবিদ্যায় প্রথম সংশয় উপস্থিত হইবামাত্রই একবারে ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন, অন্নকষ্টে ওষ্ঠাগতপ্রাণ তথাপি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবেন না, এবং যিনি বলেন "যাঁহাদের হস্তে মনুষ্যের জীবন, তাঁহাদের তদ্বিষয়ে ছন্দাংশে ক্রটী হইলে মহাপাপ" তাঁহার যে তদ্বিষয়ে কতদূর যত্ন করিতে হইত তাহা তিনিই জানিতেন—অন্যে কি জানিবে?' এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ চিকিৎসক কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়? হানিমান ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ ছিলেন। উদ্ভিদ, জ্যোতিষ, ভূগোল, আবহ-বিজ্ঞান প্রভৃতি অনেকগুলি বিজ্ঞানেও তাঁহার এক প্রকার অধিকার ছিল। ইহা ব্যতীত নূতন গবেষণা, নূতন চিন্তা—নূতন পরীক্ষা—নূতন কল্প—নূতন মতের সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা;

এসকল দেখিয়া কে না তাঁহার কার্য্যশক্তি ও পরিশ্রমে স্তম্ভিত হইবেন? হানিমানের মনের স্বর প্রায় সর্ব্ববিষয়েই উচ্চ ছিল। তন্মধ্যে ধীশক্তি ও স্বাধীন-প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী। সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার নিগূঢ় দর্শন, গভীর চিন্তা, সূক্ষ্ম প্রবেশ ও গাঢ় মনঃসংযোগ করিবার শক্তি ছিল। লোকে তাঁহার মুখ দেখিলেই তাঁহার গভীর চিন্তাশক্তি, তীব্র দৃষ্টি এবং তীক্ষ্ণ অনুভূতি জানিতে পারিত। কখনও তাঁহার মনে কোন বিষয় ভাসিয়া বেড়ায় নাই; তিনিও কখন কোন "ভাসা কথা" কহেন নাই। তাঁহার কথাবার্ত্তা অত্যন্ত সার ও জ্ঞানগর্ভ ছিল;—ভাব পরিষ্কার—জটিলতাশূন্য। এমন কোন বিষয়ই নাই যে তাঁহার কোন নূতন কথা বলিবার ছিল না। তিনি কখন "বড়র দোহাই" দেন নাই। বরং স্বভাবতঃই দরিদ্রের স্বাপক্ষ ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ নির্ভীক ছিল, এমন কি, মৃত্যুকালেও তাহার কোন বৈলক্ষণ্য জন্মে নাই। স্বাবলম্বন তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃত ধর্ম্ম ছিল; এবং তৎসহ মনের স্থিতিস্থাপক গুণ থাকাতে, তিনি সর্ব্বাবস্থাতেই সুখী হইতে পারিতেন। সদাই উদ্যোগী—কখনও গালে হাত দিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া ভাবিতে জানিতেন না;—চেষ্টা ও কার্য্য তাঁহার জীবনের জীবন ছিল। হানিমানের দয়াধর্ম্মাদিও উচ্চদরের ছিল। কিন্তু এসকল কথা আর অধিক বিবৃত করিবার আবশ্যক নাই। হানিমানকে ধীমান বলায় সকলি বলা হইয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এক তন্ত্রীয়। বুদ্ধি না থাকিলেও ধর্ম্ম থাকে না; ধর্ম্ম না থাকিলেও বুদ্ধি খুলে না। অগম্য বনে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকা যদি ধর্ম্ম হয়, তবে তাহার সহিত বুদ্ধির কোন সংস্রব না থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু ধর্ম্মে স্বার্থপরতা নাই—যাহা নিখিল সংসারের মুখ তাকাইয়া থাকে—যাহাতে শুদ্ধ আপনার স্বর্গসুখ কামনা নাই—যাহার ন্যায়, যুক্তি, সত্য, তত্ত্ব ও সৎ অস্থি মজ্জাগত, যে ধর্ম্ম মনুষ্যচরিত্রের স্বর স্বরূপ—তাহা বুদ্ধি ব্যতীত সম্ভাবিত নহে; বুদ্ধির পর্য্যায় ধর্ম্মের পর্য্যায়, বুদ্ধির তারতম্য সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধি বৃত্তিরকোন সংস্রব নাই; আমরা সে কথা মান্য করি না। ইতর জন্তুতেও বুদ্ধির প্রাবল্য গুণের প্রাবল্য দেখা যায়। মনুষ্যের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণই বুদ্ধিশক্তি বা বুদ্ধিশক্তির কারণই ধর্ম্ম প্রবৃত্তি। এ দুইটীর সমবায়ী সম্বন্ধ—একটী না থাকিলে অপরটী থাকিতে পারে না। * কেহ বলিবেন দয়াময় হাওয়ার্ডের ধীশক্তির পরিচয় কোথায়? যাঁহারা ধীশক্তির পরিচয় গ্রন্থরচনায় বা "ঘটত্ব—পটত্ব তর্কে" ব্যতীত দেখিতে না পান, তাঁহাদের নিকট পরাস্ত মানিলাম। হাওয়ার্ডের ধীশক্তির পরিচয় তাঁহার কার্য্যকলাপে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। তবে বেকনের কি করিবে? কেন?—তাঁহার অপবাদের অর্দ্ধেক কবি পোপের কল্পনা-প্রসূত বলিব। মেকলেও তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আতিশয্য স্বীকার করিয়াছেন। বেকনের

* Most crimes are committed by the lower classes and are generally the consequences of a defective education, or intellectual weakness.

Büchner's Force and Matter

গ্রন্থমধ্যে তাঁহার হৃদয় অঙ্কিত। মানুষময়, সত্যময় অন্তঃকরণ ব্যতীত সে রচনা—সে চিন্তার উত্তালতরঙ্গ বাহির হয়না। যে লেখায় মস্তিষ্ক আছে, তাহাতে অন্তঃকরণও আছে। কৌম্ত বলেন মস্তিষ্ক অন্তঃকরণের আজ্ঞাবহ। প্রতি অক্ষর যাঁহার অন্তঃকরণের শোণিতে লেখা—তাহাই যথার্থ লেখা—তাহাই প্রতিভা। ' প্রতিভা মস্তিষ্ক ও অন্তঃকরণের সমকালীন উচ্ছ্বাস মাত্র। যাঁহার হৃদয়ে লাগে নাই, তিনি অক্ষর সাজাইতে জানেন—লিখিতে জানেনা; তাঁহার কথাও কাহার হৃদয়ে লাগে না। লোকে কথায় বলে "যদি কাঁদাইতে চাও তো আগে কাঁদ।" যে কাঁদে নাই, সে কখন কাঁদায় নাই। কেহ বলেন অন্ধের যেমন স্পর্শশক্তি প্রবল হয়, অধার্ম্মিকের সেইরূপ ধীশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অবশ্য নদীস্রোত এককূল ছাড়িলে অপর কূলে বল প্রকাশ করিয়া থাকে। স্নায়বীয় স্রোত ও ইন্দ্রিয়ান্তরে শক্তি প্রকাশ করে বটে। পর্ব্বতের চূড়া যতই উচ্চ হইবে উপত্যকা ততই গভীর হইতে থাকিবে; সুতরাং মস্তিষ্কের কোন স্ফীতির সহিত তৎসংলগ্ন অপরাংশের নীচতা বর্ত্তায়, এ কথা প্রমাণ্য বটে। কিন্তু মস্তিষ্কের স্ফীতির উপর শক্তির তারতম্য নির্ভর করে না—বীজের (Cells) ঘনত্বে, শক্তির আতিশয্য লক্ষিত হয়। সে যাহা হউক, ফলে ধীশক্তির সহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সেরূপ পার্শ্ব সম্বন্ধ নাই।

হানিমানের হৃদয়ে অপরিমেয় তেজ ছিল। সেই তেজ পর পর কেমন সুন্দররূপে পরিপুষ্ট হইতে দেখা যায়। প্রথমতঃ যেরূপ সকল প্রকার বিদ্যা তাঁহার নয়নপথে পড়ায় তিনি কিয়দংশে সকলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আদৌ প্রাচীন ভাষায় তাঁহার বিশেষ আস্থা জন্মিয়াছিল, পরে বিজ্ঞানকে সম্মুখে পাইয়া আপন সামগ্রী করিয়া বাছিয়া লইলেন। ক্রমে সেই অতুল প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হইল। হৃদয়তেজও তাঁহার সেইরূপ পর পর পরিপক্ক ও পরিস্ফুট হইয়াছিল। প্রথমতঃ পিতার বিদ্যানুশীলনে অনভিমত প্রভৃতি সামান্য সামান্য প্রতিবন্ধক অতিক্রম করায় সে তেজ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, পরে সিংহের মত বিপদরাশিকে গাত্রসংলগ্ন ধূলারাশির মত তিনি ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। অনাহারী, নির্ব্বাসিত, রুগ্ন, দৈবদুর্য্যোগে ওষ্ঠাগত প্রাণ, দণ্ডিত, অপমানিত; অবস্থা প্রতিকূল, মনুষ্য প্রতিকূল, দেবতা প্রতিকূল, তথাপি যে তেজের হ্রাস হয় নাই—হানিমান তথাপি হানিমান ছিলেন। নেপলিয়নের মত তিনি বলিলেন, "There shall be no Alps" প্রতিবন্ধক আবার কি? দুঃখ, দারিদ্র, বিপদ, ব্যাঘাতে কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না? বাল্যাবধি বিজ্ঞানালোচনায় হৃদয়ের বল দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কাব্যামোদ জনিত স্ত্রীজনসুলভ কোমলতা জন্মে নাই। সত্যনিষ্ঠা প্রযুক্ত বালকের মত সরলতা ছিল; কিন্তু বালস্বভাবসুলভ চাচালতা জন্মে নাই। নির্ব্বিশেষ (Abstract) অপেক্ষা বিশেষ (Concrete) তাঁহার [illegible]ির অধিক স্ফূর্ত্তি ছিল। সামান্যতাপাতে (Generalization) তাঁহার মেধা য[illegible]র দেখা যায় শ্রেণীপাতে (Classification) ততদূর নহে; বিশ্লেষে (Analysis) যত সম্প্রসারণে (Co-ordination) তত নহে। চিন্তাশক্তি অপেক্ষা তাঁহার দর্শন-

শক্তি প্রবল ছিল। কোম্তের মত চিন্তাশক্তি বা গালিলিওর মত দর্শনশক্তি ছিল না বটে; কিন্তু এতদুভয় অপেক্ষা তিনি শ্রমপটু ও কার্য্যক্ষম ছিলেন। তাঁহার মানসিক ও কার্য্যশক্তিতে জাতীয় ভাবের প্রাবল্য দেখা যায়। চিন্তা ও দর্শন শক্তিতে তিনি কান্ত ও কার্ণভতের মধ্যস্থল। তাঁহার রচনাচাতুর্য্য মধ্যমরাশির ছিল। যাঁহার লেখনী অত্যন্ত দ্রুত তাঁহার নিকট মিষ্টতা বা লালিত্য প্রত্যাশা করা যায় না। লেখার সৌন্দর্য্য বা মসৃণত্ব যতদূর থাকুক আর নাই থাকুক প্রাঞ্জলত্বই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ফলে তাহাতেও বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার তর্কশক্তির ও বিশেষ প্রাবল্য দেখা যায় না, তবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকাতে অনায়াসে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিতেন। সার আইজাক নিউটনের মত হানিমানের মহত্ত্ব অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের সমষ্টি। একে চিত্রকরের পুত্র তাহাতে রমণীয় স্থানে জন্ম ও বসতি; তাঁহার যে বিলক্ষণ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অনুভূতি থাকিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কবি বা চিত্রকরের যতদূর আবশ্যক তাঁহার ততদূর ছিল না। হানিমানের বিলক্ষণ স্মরণশক্তিও ছিল; কিন্তু সূক্ষ্মে যত স্থূলে তত নহে। বাল্যাবধি গ্রন্থ-সহবাসে থাকায় ও চিরজীবন বিজ্ঞান সেবা করায় তাঁহার অনেকটা উপস্থিত বুদ্ধি জন্মিয়াছিল—এবং এক সময়ে একবারে অনেক বিষয়েই দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন। তাঁহার গ্রন্থ গুলিতে যে প্রকার দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত বিরল। শারীরিক ও মানসিক শক্তির সমতাহেতু তাঁহার চিত্তফলক সরোবর সদৃশ স্থির ছিল—কখনও চঞ্চল হয় নাই; সুতরাং আভ্যন্তরিক ধারণা শক্তি প্রযুক্ত তদুপরি যখন যে ছায়া পড়িয়াছে তাহা প্রায়ই পলাইতে পারে নাই; প্রতিবিম্বগুলি অধিকাংশই ফটগ্রাফ্ হইয়া গিয়াছে। হানিমানের প্রতিভা যে যথার্থ উচ্চদরের ছিল তাহার আর দ্বিরুক্তি নাই। আমাদিগের বিবেচনায় আবিষ্কারক প্রতিভাপক্ষে প্রথম শ্রেণীর, নির্ম্মাতা (Inventor) দ্বিতীয় শ্রেণীর, নৈয়ায়িক বা দার্শনিক (Speculative Philosopher) তৃতীয় শ্রেণীর, এবং কবি চতুর্থ শ্রেণীর লোক। হানিমানের আবিষ্কারের নূতনত্ব আছে— বিভা ও আছে। তাঁহাকে প্রতিভার উচ্চতম শৃঙ্গে বসাইতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই। তাঁহার সংগ্রহ করিবার শক্তি, উৎপন্ন করিবার শক্তি অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক ছিল। তিনি এত শীঘ্র লিখিতে পারিতেন যে যেসকল গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন, বোধ হয়, সে সকল ভালরূপ বুঝিবারও অবসর পান নাই। সাহিত্য সংসারে স্কট, গুইটে, হুগো প্রভৃতি যেমন বিপুল লেখক, বিজ্ঞান-সংসারে হানিমান সেইরূপ। বোধ হয়, তিনি যতগুলি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ নকল করিতে গেলে এক জনের অর্দ্ধেক জীবন কাটিয়া যায়। প্লেটো, বেকন, বার্কে, হিউম প্রভৃতির চিন্তাপেক্ষা রচনাকৌশল উচ্চদরের; আরিষ্টটল, কাম্তে, কেণ্ডি, মিল প্রভৃতির রচনা সৌন্দর্য্যাপেক্ষা চিন্তাস্রোতের রমণীয়তা অধিক। হানিমান রচনাচাতুর্য্যে ও সারত্বে দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। তাঁহার অপর্য্যাপ্ত দর্শনশক্তি ছিল। বাল্যাবধি গ্রন্থালোচনায় তাহার কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই। জন্ ইষ্টয়ার্টমিল এপক্ষে হানিমানের বিপরীত। তাঁহার বিপুল দর্শনশক্তি সত্বেও গ্রন্থা-

লোচনায় দর্শনের অনেক ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার রত্নগর্ভা স্মৃতি একটী অপূর্ব্ব বিদ্যাভাণ্ডার ছিল; তন্মধ্যে সকল রত্নগুলি নির্ব্বাচিত, মার্জ্জিত, সুসজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ, চিহ্নিত, লিপিবদ্ধ (Lebelled) অনায়াস প্রাপ্য ছিল; ইচ্ছামতে তিনি কটাক্ষ মাত্রেই আবশ্যকীয়টী হস্তগত করিতে পারিতেন। হানিমানের যতদূর দর্শন-শক্তি ছিল, তর্কশক্তি তাহার তুলনায় অতি সামান্যই বলিতে হইবে।

হানিমানের যে ভয়ঙ্কর অধ্যবসায় ছিল এক্ষণে তদ্বিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। তবে তৎসহ অপরিমেয় স্বাতন্ত্রবৃত্তি থাকায় বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছিল। নিজের বিবেচনায় যাহা ভাল বোধ হইত, তাহা হইতে প্রাণান্তেও নিবৃত্ত হইতেন না। যাহা অভিপ্রেত তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনায় সহস্র প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়াও অনুসরণ করিতেন। শৈশবে জনকের অমতে নিশীথে গোপনে বিদ্যানুশীলন, 'বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম, স্বীয় মতপ্রচার জন্য সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হওয়া;—অনাহার, উৎপীড়ন, নির্ব্বাসন, শারীরিক পীড়া, মর্ম্মবেদনা, শোক, তাপ, তথাপি অভিষ্ট সাধনে অটল—ধৈর্য্যের সম ধীর শান্তির ন্যায় স্থির—মার্শালনী সদৃশ বীর, যাঁহার অভিধানে মৃত্যু ছিল—পরাস্তমানা ছিলনা। একদিনের নিমিত্তও সুখ নাই, কোথাও দাঁড়াইবার স্থান নাই—সংসারে কীট পতঙ্গের মত অবস্থান—তথাপি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইপ্সিত বিষয়ে হতোদ্যম বা শিথিল-যত্ন হন নাই।

হানিমানের আজীবন চরিত্রসৌন্দর্য্য দেখা যায়। তাদৃশ দীর্ঘ জীবনে কলঙ্কের লেশ মাত্রও নাই। কখনও প্রাণান্তে কোন দুষ্যকর্ম্ম করেন নাই। যদি কেহ নিজ বক্ষঃ-স্থলে হস্ত রাখিয়া বলিতে পারেন "এই একজন ভদ্রলোক" তবে সেই ব্যক্তি হানিমান বলিয়াই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার অনুভূতি(Feelings) অপেক্ষা ধীশক্তি প্রবল বলিতে হইবে। তাঁহার বিপর্য্যয় ইচ্ছাবল ছিল, সেইহেতু বিপর্য্যয় কার্য্যশক্তিও দেখা যায়। ইন্দ্রিয়সুখে অতিরেক রতি ছিলনা। অস্মদ্দেশে ইন্দ্রিয় সংযমাপেক্ষা মনুষ্যের উচ্চ প্রশংসা হইতে পারেনা। ফলে হানিমান কঠোর তপস্বীও ছিলেন না। অশিতি বৎসর বয়সে নবযুবতীর পাণিগ্রহণ করা তপস্বীর কার্য্য নহে। ফলে উচ্চদরের সুখের ব্যাঘাত যাহাতে না জন্মায় মনুষ্যেরএরূপ ইন্দ্রিয় সুখ আবশ্যক। অগ্রসর হও উর্দ্ধে উঠিও না। বেলুনে চাপিয়া দিবারাত্র স্বর্গের দ্বার ঠেলিয়া বেড়াইলে জীবনের স্বার্থকতা হয় না। পৃথিবীতে বিচরণ করাও আবশ্যক। সহজ চক্ষু দূরবীক্ষণ অপেক্ষা সহস্র গুণে ভাল। আসঙ্গলিপ্সা ও অপত্য স্নেহ হানিমানের প্রবল বলিতে হইবে। সঙ্গীত প্রভৃতিতে বৃদ্ধাবস্থার পূর্ব্বে তাঁহার বিশেষ আস্থা দেখা যায় নাই। তিনি সুপ্রে-মিক ছিলেন বটে, বরং কিঞ্চিদতিরক্ত মাত্রায় স্ত্রী পরবশ বলিতে হইবে। তাঁহার দয়ামায়া মধ্যমরাশির ছিল; দর্শনেন্দ্রিয় প্রবল, বর্ণপ্রিয়তা, দৃশ্যপ্রিয়তা ও বিলক্ষণ ছিল। সুন্দর দৃশ্যে বা রূপে সহজেই মোহিত হইতেন। কিন্তু তাহা চিত্রকর বা কবির মত উচ্চদরের ছিল না। বিনয়ী, নম্র ও ধীর প্রকৃতি সত্ত্বেও তিনি প্রকৃত লোকরঞ্জক ছিলেন

না। নেতার উপযুক্ত হৃদয় বিনোদন শক্তিও তাঁহার ছিল না। যাহাকে ভালবাসিতেন তাহাকে অত্যন্তই ভাল বাসিতেন; কিন্তু একবার যাহার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিত তাহা আর ইহ জন্মে যাইত না। সামান্য কথায় তিনি ভয়ানক চটিয়া যাইতেন। সুতরাং তাঁহার সামাগুণ সামান্য ছিল বলিতে হইবে। অনেকের সহিত তাঁহার শীঘ্র গাঢ় আলাপ হইত বটে; কিন্তু তাহা প্রায়ই ভাঙ্গিয়া যাইত। তাঁহার ক্রোধও ভয়ানক ছিল। লুথর বলেন "আমি ক্রুদ্ধ হইলে ভালরূপ প্রার্থনা ও বক্তৃতা করিতে পারি।" হানিমানের ক্রোধ প্রতিহিংসায় তৎপর ছিল। তর্ক বিতর্কে তিনি সামান্যে জ্বলিয়া উঠিতেন। নানা প্রকার জ্বালা যন্ত্রণায় তাঁহার জীবন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল পাছে লোককে সহসা রুষ্ট কথা বলিয়া ফেলেন, এই ভয়ে তিনি একেবারে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং দিবানিশি উৎপীড়নে তিনি শুদ্ধ মনুষ্যের কালমূর্ত্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কাব্যাদি কখনই বিশেষরূপ আলোচনা করিতে দেখা যায় নাই। ফলে কাব্যাদির রস যে তিনি অনুভব করিতে পারিতেন না, এমন নহে; কখন কখন তাঁহাকে গ্রীক কবিতা প্রফুল্লবদনে আবৃত্তি করিতে দেখা গিয়াছে। তিনি কখন গুণ গুণ স্বরে গানও গাহিতেন। সুতরাং এসকল রসে বা আনন্দে তাঁহাকে একেবারে বঞ্চিত করিতে পারিলাম না।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায়।

চিত্র বিদ্যা।

উপক্রমণিকা।

চিত্র বিদ্যা সূক্ষ্ম শিল্পের একটী প্রধান অঙ্গ। সভ্য অসভ্য সকল জাতিই ইহার সৌন্দর্য্য বুঝে। নিতান্ত অসভ্যজাতীয় নর নারীরাও শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজ নিজ দেহ চিত্রিত করিয়া থাকে। যদিও তাহাদের চিত্রে চিত্রবিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, তথাপি তাহাই যে চিত্রের আদি, এবং তাহা হইতেই যে সভ্যতম প্রদেশ সমূহে চিত্রবিদ্যার এতদূর উন্নতি হইয়াছে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

চিত্রবিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্য, দৃষ্টবস্তুর প্রতিরূপ এরূপ অঙ্কিত করা যে সকল দেশে—সকল সময়ে—সেই প্রতিরূপ দর্শনে সকলেই চিত্রকরের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—কোন কল্পনা মনে উদিত হইলে (বাস্তব না হইলেও) তাহা অঙ্কিত করিয়া সাধারণের বোধগম্য করা যাইতে পারিবে।

চিত্রবিদ্যার দ্বারা এই উদ্দেশ্য দুইটি যতদূর সুসম্পাদিত হইতে পারে, এমন আর কোন উপায়েই হইবারও সম্ভাবনা নাই। কবি বিংশপৃষ্ঠা পরিমিত গ্রন্থে দৃষ্ট বা কল্পিত নিসর্গের শোভা বর্ণন করুন; ভাবুক পাঠক স্বীয় প্রতিভা বলে তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবেন বটে কিন্তু সেই পদার্থটি কিরূপ (যদি স্বয়ং না দেখিয়া থাকেন) কখনই যথার্থ অনুভব করিতে পারিবেন না। সম্ভবতঃ তদনুরূপ একটি বিভিন্ন পদার্থ তাঁহার অন্তরে প্রতিফলিত হইবে। আবার কবির বর্ণনা তদ্ভাষান-ভিজ্ঞের বুঝিবার ক্ষমতা নাই; কিন্তু চিত্র সার্ব্বজনিক্ ভাষা। চিত্রকর কোন নৈস-র্গিক শোভা চিত্রিত করুন—লাপলাণ্ডের তুষার ক্ষেত্রবাসী হইতে আফ্রিকার মরু-দেশ বাসী পর্য্যন্ত—সভ্যতম ইংলণ্ড-বাসী হইতে অসভ্যতম গারো পর্ব্বত-বাসী পর্য্যন্ত—সকলেই সেই চিত্র দর্শনে, আদি বস্তু দর্শনের আনন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। চিত্রের এতদূর ক্ষমতা—সুতরাং চিত্রবিদ্যা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় উৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সকল উন্নত জাতির মধ্যেই চিত্রবিদ্যার বহুল চর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা স্বীকার করেন, এই বিদ্যা উন্নতির একটী প্রশস্ত সোপান। জর্ম্মণি দেশের প্রত্যেক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে সাহিত্য গণিত প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ফ্রান্সে সকলেই অল্পাধিক চিত্রবিদ্যা অভ্যাস করে, কিন্তু আমা-দের দেশে এই বিদ্যার অতি শোচনীয় অবস্থা। এই কেরাণী প্রধান বঙ্গদেশে, স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রচুর উন্নতি যে কতদিনে হইবে, তাহা বলা মনুষ্যের অসাধ্য। আনন্দের বিষয় কলিকাতার কোন কোন বিদ্যালয়ে এই বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য এক একটী বিভাগ স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু শিক্ষা দান পদ্ধতির প্রণালী পরিষ্কৃত না করিলে আশানুরূপ ফল লাভ হওয়া দুষ্কর। আমাদের বিবেচনায় কার্য্যতঃ (Practical) শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে উপদেশ (Theoritical) প্রয়োজন আছে।

অনেকের বিশ্বাস, সকলে চিত্রবিদ্যা শিখিতে পারেনা। চিত্রবিদ্যা শিখিবার জন্য বিশেষ ক্ষমতার (Genius) প্রয়োজন। একথা আমরা বিশ্বাস করিনা। বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা(Genius) বলিয়া কোন একটী গুণের সত্বা আমরা অনুভব করিতে পারিনা। ইহার স্বত্বা স্বীকার করিতে গেলে ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলিতে হয়। গর্ভ-ভূমিষ্ঠ শিশু মাত্রেই কোন না কোন এক প্রকার গুণে পরিপক্ক থাকে (রোগাদি কারণ স্বতন্ত্র) বয়ঃ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কোন গুণ চালনায় বর্দ্ধিত হয়। কোন গুণ চালনাভাবে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই আমরা এক এক বংশে এক একটি বিশেষ গুণের প্রাধান্য দেখিতে

পাই। যাহা হউক চেষ্টা করিলে যে সকলেই অল্পাধিক চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। চেষ্টা দ্বারা হস্তকে বশকরা কখনই কঠিন কার্য্য নহে। এমন কি চেষ্টা করিলে নিজে নিজেই কতকপরিমাণে শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায়।

আমরা এই প্রবন্ধ পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া, প্রথম অধ্যায়ে অঙ্কন (Elementery Drawing & Shading) দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যবহারিক পরিপ্রেক্ষিত (Practical Perspective)তৃতীয় অধ্যায়ে শারীরস্থান (Artistic Anatomy) চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণরেখা (Colouring) পঞ্চম অধ্যায়ে প্রকৃতি ও প্রতিকৃতি চিত্র (Landscape & portrait Painting) বিষয়ের অবতারণা করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীশরৎ চন্দ্র দেব।

প্রকৃতি পরিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বাষ্প সামান্য মিশ্রণে মিশ্রিত হইয়া আছে। আরও দেখান হইয়াছে যে এই দুইটী বাষ্পের মধ্যে একটি অর্থাৎ নাইট্রোজেন দহন সহায় নহে, কেননা তাহাতে জ্বলন্ত বাতি প্রবিষ্ট হইবা মাত্র নিবিয়া গিয়াছিল। এবং অপরটি অর্থাৎ অক্সিজেন দহন সহায় ইহাও অনুমান করা হইয়াছিল, কেন না পরীক্ষার পূর্ব্বে যখন অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন একত্রে বায়ুতে বিদ্যমান ছিল তখন বাতি শিশির মধ্যে জ্বলিয়াছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আর কিছু বিশেষ আলোচনা করি নাই, এবং এস্থলে ততদুর করিবারও আবশ্যক নাই, তবে তৎসম্বন্ধে আরও দুইচারিটী কথা বলিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে।

আমরা পূর্ব্ব লিখিত পরীক্ষায় বায়ু হইতে নাইট্রোজেন ভাগকে বিশ্লিষ্ট করিয়াছিলাম, কিন্তু অক্সিজেন ভাগকে আলাহিদা বাষ্পাকারে প্রাপ্ত হই নাই,—তাহা লোহাচুরের সহিত রাসায়নিক সংযোগে মিলিত হইয়া মরিচায় পরিণত হইয়াছিল। বায়ু হইতে যেরূপ নাইট্রোজেন ভাগকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, ঐরূপ অক্সিজেন বাহির করিয়া লইবার একটি উপায় আছে; সেটি যদিও ততদুর সহজ উপায় নহে, তথাপি বেশ শিক্ষাপ্রদ উপায় বলিয়া এস্থলে সংক্ষেপে তাহার বিবরণ লেখা যাইতেছে।

পাঠক অবশ্যই পারা দেখিয়া থাকিবেন। ইহা কেমন তরল অথচ পরিষ্কার রূপার ন্যায় উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ। অনেক দিন বাতাসে খোলা পড়িয়া থাকিলেও পারার এই উজ্জ্বল চাকচিক্যের কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে এই পারা যদ্যপি একটা সরু ও লম্বা মুখ বিশিষ্ট কাচের পাত্রে রাখিয়া, সেই পাত্রটির মুখ খুলিয়া, পাত্রটিকে বালির উপর বসাইয়া তিন চারি দিন অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করা যায় তাহা হইলে ক্রমে সেই অত্যুজ্জ্বল পারদ সিঁদুরের ন্যায় লালবর্ণ একপ্রকার পদার্থে পরিণত হইতে থাকে। এইরূপে সমুদায় পারাটিকে ঐ রক্তবর্ণ পদার্থে পরিণত করা যাইতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে এই রক্তবর্ণ পদার্থটি কিরূপে উৎপন্ন হইল? প্রকৃত প্রস্তাবে এই রক্তবর্ণ পদার্থটি পারার "মরিচা"; পূর্ব্বের পরীক্ষায় যেরূপ লোহাচুর হইতে বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সংযোগে লোহার মরিচা উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহাতেও ঠিক সেইরূপ পারার মরিচা উৎপন্ন হইয়াছে। যে পাত্রে পারা রাখিয়া উত্তপ্ত করা হইয়াছিল, তাহার মুখ খোলা থাকায় বায়ুর সংস্পর্শে বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া এই সুন্দর রক্তবর্ণের পদার্থ জন্মিয়াছে; ইহাতে পারদ ও অক্সিজেন ভিন্ন আর কিছুই নাই। অল্পবয়স্ক পাঠক মনে করিতে পারেন,—"তাইতো, লোহার মরিচা এমন অপকৃষ্ট মেটে রঙ্গের, আর পারার মরিচা রাঙ্গা টুকটুকে! ইহাদের বীজ যে লোহা ও পারা তাহাদের রূপ অনুসারে মরিচার রূপের ও তারতম্য ঘটিল না কি?" বাস্তবিক তাহা নহে; লোহা কি পারার রূপের সহিত তাহাদের মরিচার রূপের, কি অন্য কোন ধর্ম্মেরই, কিছুমাত্র সংস্রব নাই। রসায়ন শাস্ত্রে এরূপ কোন নিয়ম নাই বরং সচরাচর তাহার বিপরীতই লক্ষিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান দৃষ্টান্তটি কেবল একটি অনিয়ত সংঘটন (Accident) মাত্র; কোন বিশেষ নিয়মের ফল নহে।

ঐ যে রক্ত বর্ণের পারার মরিচার কথা বলিলাম উহা অন্য উপায়ে এবং আরও অনেক সহজে প্রস্তুত করা যায় এবং করিয়া থাকে। ইহাকে চলিত ইংরাজিতে (Red precipitated) অর্থাৎ রক্তবর্ণের গুঁড়া বলিয়া থাকে। এই রক্তবর্ণ পদার্থ হইতে আবার অক্সিজেন বাহির করিয়া লওয়া যায়, এবং পারদও আলাহিদা হইয়া পড়ে। এই পরীক্ষাটি নিম্ন-লিখিত রূপে করিতে হয়।

পরীক্ষা। একটু পূর্ব্বোল্লিখিত রক্ত বর্ণের পদার্থ লইয়া একটি কাঁচের পরীক্ষা নলের মধ্যে রাখ। * ঐ পরীক্ষা নলের মুখে কর্কের ছিপি দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া দাও, এবং এ ছিপির মধ্যে ছিদ্র করিয়া তাহাতে একটি কাচের বাঁকান সরু নলের এক মুখ চালাইয়া দিয়া অপর মুখ একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ডুবাইয়া রাখ।

* রাসায়নিক পরীক্ষাদি করিবার জন্য শিশির ন্যায় এক মুখ খেলা সোজা নল ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহাকে পরীক্ষা নল (Test Tube) কহে।

এখন পরীক্ষা নলটির তলায় স্পিরিট ল্যেম্প * জ্বালিয়া উত্তাপ দিতে থাকে। তারপর একটী ফাঁদাল শিশিকে জলপূর্ণ করিয়া, যে পাত্রে জল আছে সেই পাত্রের জলে মগ্ন কাচের নলের খোলা মুখের উপর, জলের মধ্যে শিশিটিকে ঘুরাইয়া অধোমুখ করিয়া ধর। ক্রমে দেখিতে পাইবে শিশির ভিতর বুদ্বুদ উঠিতেছে, এবং ওদিকে পরীক্ষা নলের মধ্যস্থিত রক্তবর্ণ পদার্থটী কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসিতেছে। আরও দেখিতে পাইবে পরীক্ষানলের শীতল ভিতরের গায়ে এক প্রকার উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণের বিন্দু জমিতেছে। এই বিন্দুগুলি পারার বিন্দু এবং ঐ শিশিতে যে বুদ্বুদ উঠিতেছে উহা অক্সিজেন বাষ্প। পার্শ্বের চিত্র দেখিলে এই পরীক্ষাটী বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঐ চিত্রে ক পরীক্ষানল, ও খ অক্সিজেন বাষ্প জড় করিবার শিশি। দেখিতে পাইবে ঐ শিশির মধ্যে যে বাষ্প জমিতেছে তাহা স্বচ্ছ ও বর্ণহীন এবং তজ্জন্য অদৃশ্য। শিশিটী অক্সিজেনে পরিপূর্ণ হইয়া আসিলে, একটা দেশালাই কিম্বা শলিতা
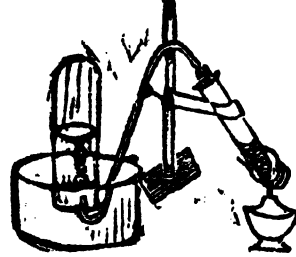
জ্বালিয়া তাহার শিখা নিবাইয়া দিয়া দেশালাই কি শলিতাটি লাল থাকিতে থাকিতে, ঐ অক্সিজেন পূর্ণ শিশিটীকে শীঘ্র জল হইতে তুলিয়া তাহার মধ্যে ঐ অগ্নিময় দেশালাই কি শলিতাটিকে প্রবিষ্ট করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে এবং পুনরায় শিখা উৎপন্ন হইবে। পুনরায় একটা তেলের পলায় যদ্যপি একটু গন্ধক রাখিয়া ঐ গন্ধক জ্বালিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ গন্ধক ঈষৎ নীলাভ ক্ষীণ শিখার সহিত জ্বলিতে থাকিবে। এই অবস্থায় যদ্যপি ঐ পলার ডাণ্ডী ধরিয়া জ্বলন্ত গন্ধকটুকুকে পূর্ব্বোক্ত অক্সিজেন পূর্ণ শিশির মধ্যে প্রবিষ্ট করা যায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা অতি উজ্জ্বল আলোকের সহিত জ্বলিতে থাকিবে। এই দুইটী পরীক্ষা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে অক্সিজেন অত্যন্ত দহনসহায়। আরও অন্য অনেক উপায় দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে অক্সিজেন বাষ্প কেবল দহন সহায় নহে, ইহা প্রচণ্ডরূপে দহন সহায়; কেন না যে সকল পদার্থ সহজ অবস্থায় দগ্ধ হয় না তাহা অক্সিজেনে সামান্য খড়ের ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায়; যেমন লৌহ দস্তা প্রভৃতি ধাতু।

অতএব আমরা দেখিলাম যে বায়ুর ন্যায় অক্সিজেন ও বর্ণহীন এবং তজ্জন্য স্বচ্ছ ও অদৃশ্য বাষ্প। এবং ইহা প্রবল দহন সহায় তাহা ও দেখান হইল। আমরা পূর্ব্বে লোহাচুর লইয়া যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম তাহাতে যে নাইট্রোজেন বাষ্প শিশির মধ্যে অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল তাহাও দেখিতে ঠিক্ বায়ুর ন্যায়ই ছিল; চক্ষু দ্বারা বায়ুতে ও সেই নাইট্রোজেন বাষ্পে কিছুই প্রভেদ দেখা যায় নাই। অতএব নাইট্রোজেন

* (Spirit Lamp) এইরূপ প্রদীপ ইংরাজি ঔষধালয় মাত্রেই ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাতে তেলের পরিবর্ত্তে স্পিরিট জ্বালান হয়।

ও বর্ণহীন সুতরাং স্বচ্ছ ও অদৃশ্য বাষ্প। কিন্তু যখন সেই নাইট্রোজেনের মধ্যে জলন্ত বাতি প্রবিষ্ট করাইবামাত্র ঐ বাতি নির্ব্বাণ হইয়া গেল তখন বায়ু ও নাইট্রোজেনের মধ্যে প্রভেদ জানা গেল। তখন জানাগেল যে নাইট্রোজেন একেবারে দহন সহায় নহে; এবং তজ্জন্য অক্সিজেনের ঠিক্ বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত। কেন না অক্সিজেন্ প্রবল দহন সহায়।

এক্ষণে দেখা যাউক বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন কি পরিমাণে মিশ্রিত আছে। পাঠকগণের স্মরণ আছে লোহাচুর লইয়া পূর্ব্বে যে পরীক্ষা করা হইয়াছিল তাহাতে শিশির মধ্যে তাহার আয়তনের প্রায় পাঁচ ভাগের একভাগ জল প্রবেশ করাইয়াছিল, অতএব তাহাই শিশির মধ্যের বায়ুস্থিত অক্সিজেনের আয়তনের পরিমাণ, কেনা না সেই পরিমাণ অক্সিজেন বায়ু হইতে অন্তরিত হইয়া লোহাচুরের সহিত মিলিয়া মরিচা উৎপাদন করিয়াছিল। শিশির মধ্যস্থিত বায়ুর যে চারি পঞ্চমাংশ অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল তাহা সমুদায়ই নাইট্রোজেন। অতএব আয়তনের পরিমাণ অনুসারে বায়ুতে অক্সিজেন ১ ভাগ ও নাইট্রোজেন ৪ ভাগ থাকে দেখা যাইতেছে। ওজনের পরিমাণ অনুসারে ইহাদিগের ভাগ ওরূপ নহে কেননা ইহাদের পরস্পরের গুরুত্বের প্রভেদ আছে। কোন এক বিশেষ আয়তনের নাইট্রোজেনের ওজন যদি ১৪ হয় তবে সেই আয়তনের অক্সিজেনের ওজন ১৬ হইবে। বিজ্ঞানে অনভ্যস্ত পাঠকের পক্ষে ইহা একটী নূতন কথা বলিয়া বোধ হইবে "বায়ুর আবার ওজন কি? অক্সিজেন, নাইট্রোজেন বায়ু বৈ ত নয়, ইহাদের আবার ওজন কি থাকিবে?" আমরা এই প্রস্তাবের প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে বায়ু একটা পদার্থ; লোহা কি পাথর যেমন পদার্থ বায়ুও সেইরূপ পদার্থ। অতএব লোহা পাথর প্রভৃতি সকল প্রকারের পদার্থ যখন ভারী ও তাহাদের ওজন আছে, তখন বায়ুও পদার্থ বলিয়া ভারী" এবং তাহার ও ওজন আছে। বায়ু অপরাপর বস্তু অপেক্ষা অনেক হাল্‌কা হইতে পারে কিন্তু তথাপি তাহার ভার অবশ্যই আছে। বায়ুর ভার সম্বন্ধে পরে বিশেষ করিয়া বলা যাইবে।

আমরা বলিতেছিলাম যে নাইট্রোজন ও অক্সিজেনের ভারের পরিমাণের অনুপাত ১৪ ও ১৬; অর্থাৎ একই আয়তনের নাইট্রোজেনের ওজন ১৪ হইলে অক্সিজেনের ওজন ১৬ হইবে। অতএব বায়ুতে ৪ ভাগ নাইট্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন থাকায় নাইট্রোজেনের ওজন ৫৬ ও অক্সিজেনের ওজন ১৬ এইরূপ হইবে। এমতে ত্রৈরাশিকের নিয়ম অনুসারে ১০০ ভাগ ওজনের বায়ুতে প্রায় ৭৮ ভাগ ওজনের অক্সিজেন থাকিবে। সর্ব্বস্থানের বায়ুতেই অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ প্রায় এইরূপই থাকে; তাহার বিশেষ বিভিন্নতা ঘটে না। এমন কি ঐ পরিমাণের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন যাহিদা প্রস্তুত করিয়া মিশ্রিত করিলে প্রকৃত বায়ু প্রস্তুত করা যায় এবং তাহাতে

জীবন্ত প্রাণী ছাড়িয়া দিলে ঠিক্ বায়ুতে যেরূপ সেইরূপ নিশ্বাস প্রশ্বাস টানিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে।*

প্রাচীন বার্ত্তা বা জীবিকা শাস্ত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্তি।)

পূর্ব্বকালের লোকেরা জীবিকা-সম্বন্ধে কতদূর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার কত প্রকার পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে সকল অনুসন্ধানার্থ আমরা এই "বার্ত্তা শাস্ত্র" নামক প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া তৎসম্বন্ধে ৩টী প্রস্তাব লিখিয়াছি। এক্ষণে তাহারই অবশিষ্ট এবার প্রকাশিত হইল।

এই প্রবন্ধের প্রত্যেক বিষয় বিস্তৃত করিয়া লিখিতে হইলে পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে হয়। পরন্তু আমাদের অভিপ্রায় এই যে, অগ্রে বিষয় গুলি সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া তৎপরে ইহার কোন কোন বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিব। এই প্রবন্ধের মূল হইতে এ পর্য্যন্ত ইহাতে যে সকল বিষয়ের নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তন্মধ্যে প্রাচীন শিল্প ও প্রাচীন কৃষি এই দুইটী বিষয়ই বিশেষ প্রয়োজনীয় ও বিস্তারের যোগ্য। আগামী কোন এক মাস হইতে আমরা কৃষি বিষয়ক বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিব, এরূপ বাসনা আছে। সুতরাং এ প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

শিল্প একটী অনন্ত শাখান্বিত বৃক্ষ বিশেষ। ইহার প্রত্যেক শাখাই দুরারোহ ও অসংখ্য দল প্রদ। ইতি পূর্ব্বে যে আমরা কলাশাস্ত্রের (৬৪ কলার) উল্লেখ করিয়াছি সে সমস্তই শিল্প-বৃক্ষের এক একটী বৃহৎ শাখা। পূর্ব্বকালের লোকেরা সেই সকল বৃহৎ শাখা সম্বন্ধে অসংখ্য গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। ইহা মনে করিবেন না যে, সেই চৌষট্টি প্রকার কলা অর্থাৎ চৌষট্টি প্রকার শিল্প ভিন্ন অন্য কোন শিল্প ছিলনা। সেই ৬৪ চৌষট্টি প্রকার কলা বা শিল্প ছাঁড়া প্রতিমা নির্ম্মাণ (ষ্টাচিউ); উদ্যান রচনা, বাপী কূপ, তড়াগ খনন ও তাহার সংস্কার কার্য্য প্রভৃতি অনেক প্রকার শিল্প গ্রন্থ ছিল এবং সেই সকল শিল্পের দ্বারা পূর্ব্ব কালের লোকেরা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বস্তুতঃ শিল্পের সংখ্যা নাই, চিরকালই ইহার নূতন নূতন প্ররোহ অঙ্কুরিত হয়। বার্ত্তাবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, "পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াভির্হি কলাভেদস্তু জায়তে।" ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া বা কর্ত্তৃব্যাপার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কলার সৃষ্টি হয়।

---

* আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি আয়তনের পরিমাণ অনুসারে বায়ুতে অক্সিজেন ১ ভাগ ও নাইট্রোজেন ৪ ভাগ আছে; অর্থাৎ ১০০ ভাগে অক্সিজেন ২০ ভাগ ও নাইট্রোজেন ৮০ ভাগ আছে। এ মোটামুটি হিসাব। প্রকৃত প্রস্তাবে অক্সিজেন প্রায় ২১ ভাগ (২০.৯) ও নাইট্রোজেন প্রায় ৭৯ ভাগ (৭৯.১) এবং ওজনের পরিমাণ অনুসারে ১০০ ভাগে অক্সিজেনের প্রকৃত পরিমাণ প্রায় ২৩ ভাগ (২৩.২) ও নাইট্রোজেনের প্রকৃত পরিমাণ প্রায় ৭৭ ভাগ (৭৬.৮)

সেই জন্যই শাস্ত্রান্তরে উল্লিখিত চৌষট্টিকলার অতিরিক্ত আরও কতকগুলি কলার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সেই অতিরিক্ত কলা গুলি এই—

"শস্ত্র কর্ম্ম অর্থাৎ বৈদ্যদিগের অস্ত্র চিকিৎসা।—প্রস্তর, ধাতু, পশুশৃঙ্গ ও পশুচর্ম্মের ভস্ম ও দ্রবীকরণ প্রক্রিয়া।—ইক্ষুবিকার অর্থাৎ গুড়, চিনি মৎস্যণ্ডী প্রভৃতি প্রস্তুতকরণ —ধাতু ও ওষধি অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংযোগ বিয়োগ বিজ্ঞান (ক্যামিষ্ট্রি)।—ধাতু সাঙ্কর্য্যের পৃথক করণ।—ধাতু-সংযোগ প্রক্রিয়া।—উদ্ভিজ্জ ও মৃত্তিকা প্রভৃতি হইতে ক্ষার নিষ্কাশন করা।—অস্ত্রাদির পরিচালন অর্থাৎ যুদ্ধ ব্যাপার।—রথ, অশ্ব ও হস্তীর গতি অর্থাৎ চালনা শিক্ষা।—বাপী, তড়াগ ও কূপাদি খনন বিজ্ঞান।—জল, বায়ু ও অগ্নির সংযোগ বিয়োগ ও নিরোধ করণ এবং তাহার ফল জ্ঞান।—নৌকা প্রভৃতি জলযান ও রথাদি স্থলযান প্রস্তুত করণ। কৃত্রিম স্বর্ণ রৌপ্য ও অন্যান্য ধাতু প্রস্তুত করণ (কিমিয়া) অলঙ্কার গঠন।" [নীতিসারের ৪ অধ্যায় দেখ]

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার জীবিকার মধ্যে শিল্প নামক জীবিকার কথা বলিতে বলিতে আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। প্রত্যেক জীবিকাই এইরূপ বহু বিস্তৃত; কিন্তু প্রত্যেকটী এরূপ করিয়া দেখাইতে গেলে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক হইয়া উঠে; সুতরাং আমরা বাহুল্য পরিত্যাগ করিয়া সংক্ষেপেই অবশিষ্ট জীবিকা গুলির ব্যাখ্যা করিব। প্রস্তাব প্রারম্ভে যে দুইটী বচন লিখিত হইয়াছে তাহাতে বিদ্যা ও শিল্প, এই দুইটী জীবিকার পরেই "ভৃতি" জীবিকার উল্লেখ আছে, ইহা স্মরণ কর।

(৩) ভৃতি=অর্থাৎ দাসত্ব। ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের অনেক লোকেই এই জীবিকাটী বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। মহর্ষি এই জীবিকাটীকে "শ্বজীবিকা" অর্থাৎ কুক্কুরের বৃত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৪) সেবা=সেবা শব্দের অর্থ এস্থলে, পরচিত্তানুবর্ত্তন অর্থাৎ মোসাহেবী করা। এই সেবা বৃত্তিটী অতিশয় ঘৃণ্য।

(৪) গো রক্ষা=গোশব্দটী উপলক্ষ, নচেৎ গো, অশ্ব, মেষ, মহিষ প্রভৃতি পশু পোষা। অনেকেই পশুর ব্যবসা করিয়া জীবিকা চালাইয়া থাকেন।

(৬) বিপণি=বাণিজ্য। ইহার তুল্য স্বাধীন ও উৎকৃষ্ট জীবিকা আর নাই। এই বাণিজ্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে তাহা অন্য এক প্রস্তাবে বলিব।

(৭) কৃষি। কৃষিও স্বাধীন ও উৎকৃষ্ট জীবিকা; ইহা ধনাগমের উত্তম উপায় বটে কিন্তু সমধিক কষ্ট সাধ্য! কৃষি সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞাতব্য ও ব্যক্তব্য কথা আছে। তাহা যদি কাহারও জানিতে ইচ্ছা হয়, তবে তাহার জন্য আমরা স্বতন্ত্র এক প্রস্তাব লিখিব। পরাশর কৃত কৃষি-রহস্য নামক প্রকরণ গ্রন্থে কৃষি সম্বন্ধে অনেক উত্তম উপদেশ পাওয়া যায়।

(৮) গিরি অর্থাৎ পর্ব্বত গুলিও মনুষ্যের উপজীব্য। কিরূপে? না তত্রস্থ তৃণ, ধাতু, ওষধি, বৃক্ষ (শাল সেগুন প্রভৃতি) ও অন্যান্য দ্রব্য রাশি আহরণ করিয়া গ্রামে ও নগরে বিক্রয় করা।

(৯) ভৈক্ষ্য—ভিক্ষা বৃত্তি। "ভিক্ষা নৈবচ নৈবচ" এ বৃত্তির দ্বারা প্রাণধারণ ভিন্ন অন্য কিছু হয় না।

(১০) কুসীদ—বৃদ্ধির জন্য দ্রব্য প্রয়োগ। অর্থাৎ তেজারাতী। এ ব্যবসাটী সম্পূর্ণ স্বাধীন বটে, ধনাগমও হয় বটে, কিন্তু ইহা সমধিক মূলধন সাধ্য।

(১১) শাকট—গাড়ীর ব্যবসা। গাড়ির ব্যবসাটী মন্দ নহে, যদি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে উপস্থিত করা যায়।

(১২) আনূপ—অনূপদেশ অর্থাৎ প্রচুর তৃণ ও শস্যাদি পরিপূর্ণ জল বহুল স্থান। তথা হইতে নল, খাকড়া, খড়, পাতা ঘাস (যাহার দ্বারা মাদুর প্রস্তুত হয়) প্রভৃতি এবং মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি আনয়ন করিয়া ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা অদ্যাপি জীবিকা চালাইতেছে। এতদ্ভিন্ন রাজাদের এবং রাজপুরুষ দিগের আরও কএকটী প্রধান জীবিকা আছে। যথা—

"কৃষির্বণিক্ পথো দুর্গং সেতুঃ কুঞ্জর বন্ধনম্।
খন্যাকর করাদানং শূন্যানাঞ্চ নিবেশনম্।"

পথ ও সেতু প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা আয়বৃদ্ধি করা, খনি ও আকর অর্থাৎ রত্নের ও ধাতুর উৎপত্তি স্থান আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া আয় বৃদ্ধি করা, প্রজা ও বণিক দিগের নিকট হইতে কর ও শুল্ক গ্রহণ করা, গ্রাম নগর পণ্যবীথি সংস্থাপন করিয়া ধন উপার্জন করা,—এ সকল রাজাদিগেরই সুসাধ্য, অন্যের নহে। অন্যে করিতে গেলে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ফল, যত প্রকার জীবিকা আছে সমস্তই কষ্ট ও পর সাধ্য তন্মধ্যে বাণিজ্য জীবিকাটীই উত্তম। কেননা, "বাণিজ্যেনাতিরস্কৃতোঽর্থ লাভঃ স্যাৎ।" বাণিজ্যের দ্বারা বিনা তিরস্কারে অর্থাগম হয়। বার্ত্তাশাস্ত্রে লিখিত আছে যে,—

"উপায়ানাঞ্চ সর্ব্বেষাং উপায়ঃ পণ্যসংগ্রহঃ।
ধনার্থং শস্যতে হ্যেকস্তদন্যঃ সংশয়াত্মকঃ।"

যত প্রকার ধনোপার্জ্জনের পথ আছে তৎসমুদায়ের মধ্যে পণ্যসংগ্রহ অর্থাৎ বাণিজ্যই প্রধান ও সুপ্রশস্ত পথ। অন্য সকল সঙ্কীর্ণ ও সংশয়িত।

বাণিজ্য বৃত্তিটী সপ্তাঙ্গ। যথা—গান্ধিক ব্যবহার (১)। নিক্ষেপ প্রবেশ (২)। গোষ্ঠীকর্ম্ম (৩)। পরিচিত গ্রাহকা গমন (৪)। মিথ্যাক্রয় কথন (৫)। কূট তুলা মান (৬) এবং দেশান্তর হইতে ভাণ্ডানয়ন (৭)।

গান্ধিক ব্যবহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।

"পণ্যাণাং গান্ধিকং পণ্যং
কিমন্যৈঃ কাঞ্চনাদিভিঃ।
যত্রৈকেন চ যৎ ক্রীতং
তৎ শতেন প্রদীয়তে।"

পণ্যের অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায়ের মধ্যে গান্ধিক অর্থাৎ গন্ধ ও গন্ধযুক্ত পণ্যই ভাল। গন্ধ পণ্য যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে সোণা রূপার কি করে? তাহাতে এক পয়সার

দ্রব্যে শত পয়সা পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ ষ্টেসনারি ও পারফিউমারির দোকানে বিস্তর লাভ। অধুনা ডিস্‌পেনসরীও গন্ধবেণেকে হারাইয়া দিয়াছে।

নিক্ষেপ প্রবেশ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

"নিক্ষেপে পতিতে হর্ম্যে শ্রেষ্ঠী স্তৌতি স্বদেবতান্।
নিক্ষেপী ম্রিয়তে তুভ্যং প্রদাস্যাম্যুপযাচিতম্।"

নিক্ষেপ অর্থাৎ বন্ধক দ্রব্য। বন্ধকের কারবারটী বড় ভাল। নিক্ষেপ দ্রব্য গৃহে আসিলে ধনী আপনার ইষ্টদেবতার নিকট মানন। করিতে থাকে যে, বন্ধক দাতা মরিয়া যাউক, আপনাকে ভোগ দিব। ফল, বন্ধকের কারবারীরা প্রায় এইরূপই বটে।

গোষ্ঠীকর্ম্মের উপরও এইরূপ লিখিত আছে।

"গোষ্ঠীকর্ম্ম নিযুক্তঃ শ্রেষ্ঠী চিন্তয়তি চেতসা হৃষ্টঃ।
বসুধা বসুসম্পূর্ণা ময়াদ্য লব্ধা কিমন্যেন।"

গোষ্ঠিকর্ম্ম অর্থাৎ সভার দ্বারা অন্যের সম্পত্তি রক্ষা করা। এক্ষণকার কোর্ট অপ্ ওয়ার্ড, রিসিবর, য়্যাসাইন্ যেমন পূর্ব্বকার গোষ্ঠীকর্ম্ম সেইরূপ। পূর্ব্বে ২।৪ জন ধনী রাজার অনুমতি ক্রমে একত্রিত হইয়া পরের বিষয় আশয় রক্ষা করিবার ব্যবসা করিত। কোন বিপদ্‌গ্রস্ত বিষয়ী তাঁহাদিগকে গোষ্ঠী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে তাঁহারা মনে মনে আনন্দ করিতেন। ভাবিতেন, আজ্ ধন পরিপূর্ণ পৃথিবী আমাদের হস্তে আসিয়াছে, অন্য কার্য্য করিয়া আর কি হইবে।

পরিচিত গ্রাহকাগম সম্বন্ধেও একটী উপদেশ আছে যথা—

"পরিচিতমাগচ্ছন্তং গ্রাহক মুৎকণ্ঠয়া বিলোক্যাসৌ।
হৃষ্যতি তজ্জন লুব্ধো যদ্বৎ পুত্রেণ জাতেন।"

পরিচিত ক্রেতা আসিতে দেখিলে বিক্রেতা উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার মুখাবলোকন করিতে থাকে, হাঁসি খুসি করিতে থাকে। তাহার এত আহ্লাদ হয় যে পুত্র জন্মিলেও সেরূপ আহ্লাদ হয় না। কলিকাতার দুইজন দোকানদার সন্ধ্যার পর দোকান বন্দ করিয়া বাটী যাইতে যাইতে একজন অন্য জনকে জিজ্ঞাসা করিল "কেমন—আজ্ ব্যাচা কেনা কেমন হইল?" সে উত্তর করিল "হবেই বা কি—আজ্ চেনা লোক পাই নাই।"

মিথ্যাক্রয় কথন ও কূটতুলামান সম্বন্ধে এই রূপ উক্তি আছে যে,—

"পূর্ণাপূর্ণে মানে পরিচিতজন বঞ্চনং তথা নিত্যম্।
মিথ্যা ক্রয়স্য কথনং নিজধর্ম্মোঽয়ং কিরাতানাম্।"

পূর্ণ ও অপূর্ণ মান-পিণ্ড (কমী ও বেশী বাটখারা) দ্বারা পরিচিত ব্যক্তিকে বঞ্চনা করা এবং মিথ্যা ক্রয় দর্শাইয়া (কৃত্রিম খাতা) অধিক লাভে বিক্রয় করা কিরাতদিগের জাতীয় ধর্ম্ম। অর্থাৎ বাণিজ্য ব্যবসায়ে এই দুইটী অতি নিন্দিত ও ধ্বংশের কারণ নচেৎ যে কোন প্রকারে হউক, বাণিজ্য বৃত্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ-হইবেই হইবে।

বাণিজ্যের মধ্যে দূরদেশ হইতে ভাণ্ডানয়ন নামক বাণিজ্যেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অধিক লাভের হেতু। জীবিকাশাস্ত্রেও এই মতের অনুমোদন দৃষ্ট হয়। যথা—

"দ্বিগুণং ত্রিগুণং বাপি ভাণ্ডক্রয় বিধানতঃ।
প্রাপ্নুবন্ত্যুদ্যমাল্লোকা দূর দেশান্তরং গতাঃ।"

ভাণ্ড অর্থাৎ বাণিজ্যের মূল ধন ও তদ্দ্বারা ক্রীত মূল দ্রব্য। মনুষ্য যদি উদাস মহাকায়ে দূর দেশে গিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ভাণ্ডক্রয় করিয়া, তাহা দেশান্তরে লইয়া বিক্রয় বা বিনিময় করে তাহা হইলে মূল ধনের দ্বিগুণ ত্রিগুণ লাভ করিতে পারে। অতএব ভাণ্ডক্রয় বাণিজ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই জন্যই ইতর ভাষায় বলিয়া থাকে যে "খেতের কোণা আর বাণিজ্যের সোণা।" শাস্ত্রকারেরাও বলিয়াছেন যে,—

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ?"

প্রাচীন জীবিকা শাস্ত্রে এইরূপ অনেক কথা বার্ত্তা আছে। সে সকল আন্দোলন করায় এক্ষণে কোন সুফল আছে কি না তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অন্যফল না থাকুক, অন্ততঃ বুদ্ধির বহুমুখী গতি ও কুতূহল চরিতার্থ হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রাজ সেবা, সপ্তাঙ্গ বাণিজ্য ও কৃষি,—এই তিনটী জীবিকা বহু প্রচলিত ও অনেকেরই সুসাধ্য। কিন্তু, আজ্ কাল তিনটীই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে! পূর্ব্বে যেমন জাতি বিভাগ ছিল তেমনি জীবিকার বিভাগ ছিল। এখন আর তাহা নাই। এখন এক জন যে কার্য্যে দশ টাকা পায়—অমনি দশজন তাহার পিছু পিছু সেই কার্য্যে আক্রমণ করে। চরমে তাহার ফল এই হয় যে কেহই কিছু করিতে পারে না। ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার প্রভৃতি সকলই নিজ নিজ বৃত্তি ছাড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। এই বৃত্তি সন্ধ্যার কালের ভবিষ্যৎ ভাগ যে কি ভয়ঙ্কর রূপে উপস্থিত হইবে তাহা বাক্য মনের অগোচর।

ধনোপার্জ্জনের অনেকগুলি পথ এক্ষণে, রাজা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ আছে। পূর্ব্বে এ দেশে যখন লবণ প্রস্তুত হইত তখন অনেক লোক তদ্দ্বারা সুখী হইত বঙ্গ দেশের দক্ষিণ প্রান্তে অসংখ্য লবণ ক্ষেত্র পতিত আছে। তাহাতে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না, জমীদারেরা তাহার বৃথা কর ভার বহন করিয়া থাকেন। যদি লবণ প্রস্তুত করিবার বাধা না থাকিত তাহাহইলে সেই সকল জমীতে লক্ষ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইত। লবণ ক্ষেত্রের উল্লেখ প্রসঙ্গে আর আর একটী কথা মনে পড়িল। সে কথাটী এই যে, লবণ ক্ষেত্রে কাচের জন্ম। লবণ ক্ষেত্রে যেমন লবণ জন্মিত তেমনি কাচও জন্মিত। কিরূপে জন্মিত তাহা বলা যাইতেছে।

লবণাম্বু-নদী কি খালের তীরবর্ত্তী ভূমিতে জোয়ারের সময় যে পর্য্যন্ত লোণা জল উঠে—ক্ষেত্রের সেই পর্য্যন্ত নিম্নপ্লবন অর্থাৎ শ্লোফিং বা ঢাল করিয়া

চাঁচিয়া, নদীর কি খালের ঠিক্ কিনারায় অর্থাৎ ভাটার সময় যে স্থানের জল আর কমে না, সেই স্থানে একটী বাঁধ দিতে হয়। জোয়ারের জল ক্ষেত্রে উঠিবার জন্য একস্থানে ফাঁক রাখিতে হয়। পরে, জোয়ারের সময় সেই জমী প্লাবিত হইয়া, ভাটার সময় সরিয়া যায়। তাহাতে সেই প্লাবিত ক্ষেত্রে এক প্রকার পলি পড়ে এবং বাঁধের ক্রোড়ে কিছু জলও আবদ্ধ থাকে। সেই পলি মিশ্রিত লোণা জল উঠাইয়া পাক করিলে উত্তম লবণ জন্মে। (এতদ্ভিন্ন লবণ প্রস্তুত ও তাহার নির্ম্মলকরণ সম্বন্ধে অনেক উপায় আছে তাহা লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন) এই রূপে ৩। ৪ বৎসর ক্রমিক লবণ জন্মিলে ক্রমে সেই লবণ ক্ষেত্র সোরা হইয়া যায় অর্থাৎ তাহাতে আর উত্তম ও প্রচুর লবণ জন্মে না। উক্ত রূপে লবণের জমী যখন সোরা হয় তখন তাহাতে ধান্য রোপণ করিলে উত্তম ও প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। সেই জমীতে ধান্য কি বিবিধ তৃণ উৎপাদন করিয়া শীতকালে যখন তাহা শুষ্ক হইয়া আসিবেক তখন তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলে সেই সকল ধান্যের পল ও তৃণ সকল দগ্ধ হইতে থাকিবেক। পরে সেই দগ্ধ লবণ ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে স্তূপে স্তূপে এক প্রকার শ্বেত ও স্বচ্ছ পদার্থ পাওয়া যাইবেক। সেই শ্বেত ও স্বচ্ছ পদার্থ সকল কাচ। এই কাচ নিতান্ত মন্দ নহে। পূর্ব্বে এ দেশে এই প্রণালীতেই কাচ জন্মিত এবং এই প্রণালীর কাচের দ্বারাই পূর্ব্বে এদেশে আদর্শাদি ব্যবহার্য্য বস্তু সকল প্রস্তুত হইত। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, বিলাতী কাচ অপেক্ষা দেশী কাচ সকল শীঘ্রদ্রাবী অর্থাৎ শীঘ্রই গলিয়া যায়, কিন্তু শীতল অবস্থায় অতি কঠিন হয়। এই ঔষরিক কাচ সকল পরিকর্ম্মের দ্বারা পরিস্কৃত হইলে সমধিক স্বচ্ছ হইতে পারে। এতদ্রূপ বিধানে কাচের জমী প্রস্তুত করিতে যে যৎসামান্য ব্যয় হয় তাহা ধান্য বিক্রয়ের দ্বারা পরিপূর্ত্তি হয়, কাচ গুলি লাভ থাকে। এক বিঘা জমীতে অন্যূন ৫ পাঁচমোন কাচ উৎপাদন করা যাইতে পারে। এদেশে যদি কাচ ও কাচের পাত্র প্রস্তুত করা আরম্ভ হয় তাহাহইলে ক্রমে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হইয়া তদ্দারা যথেষ্ট অর্থাগম হইতে পারে। কিন্তু কার্য্যে না করিলে কিছুই হয় না। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, "নহ্যৌষধপরিজ্ঞানাৎ ব্যাধেঃ শান্তির্ভবেৎ ক্বচিৎ।" এই ঔষধে এই রোগ দূরহয়, এইরূপ জ্ঞান থাকিলে ব্যাধি নাশ হয় না, তাহার প্রয়োগ অপেক্ষা করে।

আমাদের এই জীবিকাশীর্ষক প্রস্তাবে যদি কাহারও অণুমাত্র মনস্তোষ হইয়াছে এমত বুঝিতে পারি, তাহাহইলে আমরা মধ্যে মধ্যে এতদ্রূপ বার্ত্তাশাস্ত্রীয় বস্তু ও তাহার এক একটী উল্লেখ পাঠকগণের সমক্ষে উপনীত করিব, নচেৎ এই স্থানেই সমাপ্তি।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, কৃষি ও বাণিজ্য এই দুইটী জীবিকাই স্বাধীন ও অর্থাগমের সুপ্রশস্ত পথ, কিন্তু কৃষিটী ভদ্রলোকের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নহে। তবে তামাকু—বা—খর্জ্জুর ও আচ্ ফুল কুসুম ফুল নীল প্রভৃতি রঙের চাষ কথঞ্চিৎ স্বাধিকৃত চাষাদিগের দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু শস্যের চাষ করিয়া

তাহা সুখে নির্বাহ করা সুকঠিন। বাণিজ্যের মধ্যে পণ্যসংগ্রহ বা ভাণ্ডানয়ন নাম বাণিজ্যটী নিপুণতার সহিত চালাইতে পারিলে অনায়াসে সম্মানের সহিত সংসার যাত্রা নির্বাহ করা যাইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন পল্লীগ্রামে এক একটী মোকাম বা আড্ডা করিতে হয় এবং সহরেও একটী আড্ডা রাখিতে হয়। যখন যে স্থানে যে দ্রব্য সুলভ্য হয় তখন তাহা ক্রয় করিয়া মহার্ঘ্য স্থানে প্রেরণ করিতে হয় এবং ফশনমুখে অর্থাৎ সময়ে ক্রয় করিয়া অসময়ে বিক্রয় করিতে হয়। এই রূপ নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাণিজ্য করিলে ক্ষতি প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না, বরং লাভের নিশ্চয়তাই থাকে। ইংলণ্ড যে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে তাহা কৃষির দ্বারা হয় নাই, একমাত্র বাণিজ্যের দ্বারাই হইয়াছে।

ধান্যাদি শস্যের চাষ করা পক্ষে এই এক বিশেষ অসুবিধা ঘটে যে, যে দিন বৃষ্টি হইল অথবা রৌদ্রের আবশ্যক দিনে রৌদ্র হইল অমনি তখনই কৃষক নিযুক্ত করিতে হইবে। বিলম্ব হইলে সমস্তই বৃথা হইবে। কিন্তু আচ্, বকম ও কুসুম প্রভৃতির চাষের সেরূপ নিয়ম নাই। উহাতে বিলক্ষণ সাবকাশ পাওয়া যায়। ১ বিঘা জমীতে আচ্ রোপণ করিয়া ৩ বৎসর পরে তাহাহইতে অন্যূন শত টাকার মূল পাওয়া যায় তন্মধ্যে ১৫ টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। এই এক বিঘার কুসুম ফুলে প্রতিবৎসর ন্যূনাধিক ৬০ টাকার ফুল জন্মে। নীলের চাষে বিশেষ লাভ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক বিঘ্ন আছে। উত্তম উত্তম রঙ প্রস্তুত হয় এরূপ অনেক উদ্ভিজ্জ আছে—বিবেচনা সহকারে সে সকল উৎপাদন করিতে পারিলে সুবিধা হইতে পারে। রঙের উৎপাদন সকল দেশেই সাদরে বিক্রীত হইয়া থাকে। যদ্বারা রেসম জন্মে সেই তুতও রেসমের ব্যবসাটীও মন্দ নহে। ধনাগমের প্রায় সকল পথই ভারতের দৌহিত্র সন্তান দ্বৈপায়ন পুরুষেরা অধিকার করিয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা অতি অপ্রশস্ত। নূতন পথ বাহির করাও সহজ ব্যাপার নহে স্বল্পসাহসের কার্য্য নহে। মৃৎপাত্র (চীনদেশীয়), কাচ, সূতার কল, কাগচের কল, এই কয়েকটী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে অনেক উপকার হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে। এদেশে তূলার চাষ উপস্থিত করিলেও অর্থাগম হইতে পারে। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যদি স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা উল্লিখিত বা প্রচলিত কোন এক কৃষি বা বাণিজ্য অবলম্বন করিতে পারেন। দশজন একত্রিত হইয়া সম্ভূয়সমুত্থান প্রণালীর (কোম্পানি) অবলম্বন পূর্ব্বক আবশ্যক বুঝিয়া দেশ বিশেষে সুগম পথ প্রস্তুত করতঃ গতিবিধির উপযুক্ত গাড়ী বা জলযানের ব্যবসা করিতে পারেন। শিল্পই হউক, কৃষিই হউক, বা বাণিজ্যই হউক, তত্তাবতের কার্য্য বিবরণ, কার্য্যের আরম্ভ বা উদ্যোগকরণ ব্যতীত বিশেষরূপে নির্বাচিত হইতে পারে না।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

সামুদ্রিক তত্ত্ব।

আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে বিজ্ঞান বলে অন্তরের অপ্রত্যক্ষ ধর্ম্ম বিষদ্ রূপে অনুমিত হয় তাহাই সামুদ্রিক শাস্ত্র। সামুদ্রিকের বহুবিধ শাখা প্রশাখা আছে এবং তাহা বুঝা কঠিন। সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত ও দুরবগাহ বলিয়াই বোধ হয় এই শাস্ত্রের নাম সামুদ্রিক হইয়া থাকিবে। সামুদ্রিক শাস্ত্রের জন্ম লগ্ন নির্দ্দেশ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কারণ আদিম লোকেরা ইহার পদ্যময়ী শ্লোক সমূহ কণ্ঠস্থ করিয়া রেখা বা চিহ্নাদি সহিত ঐক্য করিয়া ফলাফল মাত্র কহিতেন। এবং লোক পরম্পরায় ঐরূপ অপরিস্ফুট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিল। তাহারা বিজ্ঞানের ন্যায় গূঢ়তত্ত্ব, ইতিহাস, কারণ প্রভৃতির অনুসন্ধান লইত না। কে ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রণয়নকর্ত্তা তাহাও অবগত ছিল না। এরূপ কথিত আছে যে সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা লোকসৃষ্টির প্রারম্ভেই মানবাদির অদৃষ্ট লিপি অবগত হইবার জন্য এই মহাসামুদ্রিক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। এবং উহা ভগবান মারিচীকে সর্ব্ব প্রথমে শিক্ষা দেন। মারিচী আপনার অঙ্গজ অঙ্গিরাকে শিক্ষা দেন, অঙ্গিরা ইন্দ্রকে, ইন্দ্র নারদকে, নারদ অশ্বিনীকুমার, অত্রি ভৃগুকে শিক্ষা প্রদান করেন। এবং ভৃগু মুনিই প্রথমে মর্ত্তলোকে এই শাস্ত্রের প্রচার করেন। কেহ বা বিষ্ণুকে এই শাস্ত্রের প্রণয়ন কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কাহার মতে লঙ্কানাথ রাবণ আপনার ভাবী শুভাশুভ ঘটনার ফলাফল অবগত হইবার জন্য মহাদেবের নিকট হইতে এই বিদ্যা শিক্ষা করেন ও স্বীয় দেশে প্রচার করেন তদবধি এই বিদ্যার নাম "রাক্ষসী" বিদ্যা হইয়াছে। যাহা হউক আমরা ইহার কিছুই মীমাংসা করিতে পারি না। পূর্ব্বকালের লোকদের মনে এই একটী দৃঢ় ধারণা ছিল যে, যে কোন গ্রন্থই হউক না কেন ঈশ্বর সৃষ্ট বলিলেই তাহা অখণ্ডনীয় হইবে। সুতরাং পূর্ব্বসার গ্রন্থাদি সমুদয়ই স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর মহাদেব প্রভৃতির প্রণীত বলিয়াই অভিহিত।

বিদেশীয় দিগের মধ্যে আরবেরা সর্ব্ব প্রথমে ভারত বর্ষ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া স্বদেশে সামুদ্রিক শাস্ত্রের বহুল প্রচার করিয়াছিল। পরে উহাদের নিকট হইতে ইজিপ্সিয়ান্ ফিনিসিয়ান্, ব্যবিলোনিয়ান গ্রীসিয়ান, জর্ম্মণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ শিক্ষা লাভ করেন ও স্বীয় স্বীয় দেশে প্রচার করেন। বিখ্যাত নেপোলিয়ান বোনাপার্টি জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক বিদ্যার অপরিসীম ক্ষমতা দৃষ্টে শিক্ষা লাভ করিয়া স্বীয়দেশবাসী গণকে শিক্ষা দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত এতদ্সংক্রান্ত পুস্তক ও অদ্যাবধি দৃষ্ট হয়। সামুদ্রিক শাস্ত্রে তাঁহার অটল ভক্তি ছিল।

আর্য্য ভূমির দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অদ্যাবধিও ইহার বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়! পাঞ্জাব প্রদেশীয় কোন কোন মুসলমান দৈবজ্ঞ এখনও ইহার ব্যবসা করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। ইংলণ্ডে ইহার সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া শেষে প্রত্যক্ষ ফল পরীক্ষা করিয়া অনেকেই আগ্রহ সহকারে শিক্ষা করিয়া ছিলেন ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। বিপদের পূর্ব্বে বিপদ্ জানিলে অনায়াসেই বিপদের মুখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অকস্মাৎ বিপদ জানিলে এককালে স্তম্ভিত হইতে হয় সুতরাং অনিষ্ট ব্যতীত উপকার নাই এবং অশুভ ফল শ্রবণে পাছে লোকে অগ্রেই হতাশ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়ে ইত্যাদি কারণে মহারাণী এলিজাবেথের সময় পার্লিয়ামেণ্ট আইন নিবদ্ধ করেন যে অতঃপর যিনি ভূতভবিষ্যত গণনা করিবেন তিনি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। সুতরাং সেইকাল হইতে ইহার চর্চ্চা ক্রমে হ্রাস হইয়াছে। যাহাহউক আমরা প্রাচীন পুঁথিগুলিন সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত উপদেশকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়া পাঠকগণের অবগতার্থে উহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

আমরা ইতিপূর্ব্বে কহিয়াছি যে সামুদ্রিক শাস্ত্র বহুবিধ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে আমরা যে কয়েকটীর বিষয় অবগত হইয়াছি তাহার বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

রেখা সামুদ্রিক। বর্ণসামুদ্রিক। পরিমাণ সামুদ্রিক। যোগ বা জ্ঞান সামুদ্রিক। ছায়া সামুদ্রিক। দৃষ্টি সামুদ্রিক। শব্দ বা সঙ্গা সামুদ্রিক। প্রকৃতি বা স্পর্শ সামুদ্রিক রসনা বা রাসায়ন সামুদ্রিক। কপাল, কর, চরণ সামুদ্রিক, রোম সামুদ্রিক। উদ্ভিজ্জ্য, পশু, স্বপ্ন, চিহ্নাদি লঘু সামুদ্রিক, স্থল, রন্ধ্র, মিশ্র, স্বর, হাস্যস্ফুট, কথা, গণনা প্রভৃতি।

ক্রমশঃ

শ্রী তারিণী চরণ নিয়োগী।

জিজ্ঞাসা ও উত্তর।

পাঠক। সম্পাদক মহাশয়। সন১২৮৯ সালের ৭ম সংখ্যক বিজ্ঞান দর্পণের ২১২ পৃষ্ঠার মতান্তরে যে পারদ বিহীন দর্পণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিতে গিয়া নিষ্ফল হইলাম সুতরাং আপনারা কি উপায়ে উহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

সম্পাদক। দর্পণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কাচ রৌপ্য দ্বারা আবৃত করিবার প্রণালী এই; ৩২ গ্রাম সিলভার নাইট্রেট,৬৪ গ্রাম জলও ১৬ গ্রাম দ্রব য়্যামোনিয়ার সহিত গুলিয়া উত্তম রূপে বুটিং কাগজে ছাঁকিয়া ফেল তৎপরে তাহাতে ৮৪২ আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট ১০৮ গ্রাম সুরাবীর্য্য ঢালিয়া দাও। এবং ইহাতে আরও ২০ হইতে ৩০ বিন্দু ক্যাসিয়া অএল (Oil of Cassia) প্রদান কর। ইহাকে ১ নং গোলা বল। তৎপরে একভাগ লবঙ্গের তৈল ও তিন ভাগ সুরাবীর্য্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দ্বিতীয় গোলা প্রস্তুত করিতে হইবে। কাচ খণ্ড একটা মেজের উপর সমতল ভাবে স্থাপন করিতে হইবে। এক্ষণে ১ নং গোলা তাহার উপর এরূপে ঢালিয়া দিতে হইবে যেন কাচ খণ্ড অৰ্দ্ধ বা এক সেণ্টিমিটার নিম্নে ডুবিয়া থাকে। তাহার পর একবারে ৬ হইতে ১২ বিন্দু করিয়া ২ নং গোলা কাচের উপর সকল ভাগে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিতে হইবে। তাহাহইলে সমস্ত রৌপ্য কাচের উপর আসিয়া জমিবে। তৎপরে উক্ত কাচ শুষ্ক ও পরিষ্কৃত করিয়া লইলে দর্পণোপযোগী হয়।

সেণ্টিমিটার একমিটারের একশত ভাগের এক ভাগ। এক মিটার ৩৯$\frac{1}{8}$ ইঞ্চের সহিত সমান।

এক গ্রাম ১৫$\frac{1}{2}$ গ্রেণের সহিত সমান।

পাঠক। সূর্য্যোদয়ের ও সূর্য্যাস্তের সময়ে ওপরে আকাশ যে আজ কাল গাঢ় রক্তিমাবর্ণ ধারণ করে তাহার কারণ কি?

সম্পাদক। জাবাদ্বীপের অগ্ন্যুৎপাতে প্রভূত পরিমাণে সবিদ্যুৎ বাষ্প রাশি বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত হওয়ায় সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও পরে আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করে। আমরা বারান্তরে ইহার সবিশেষ কারণ মরুৎ তত্ত্ব শীর্ষক প্রস্তাবে প্রকাশ করিব!

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়—ইহা বাগ্‌ভট প্রণীত একখানি আয়ুর্ব্বেদীয় সংগ্রহ কলিকাতা কুমারটুলি ১৭ নম্বর বাটী হইতে শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়রত্ন সেন কবিরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত, সংশোধিত ও প্রকাশিত।

আমরা ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্ত হইলাম। গ্রন্থখানির এক পার্শ্বে দেবনাগরাক্ষরে মূল ও নিম্নে অরুণ দত্ত কৃত টীকা, অপর পার্শ্বে বঙ্গানুবাদ। সম্পূর্ণ হইলে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভিন্ন গ্রন্থাকারে বাঁধাইতে পারা যাইবে। গ্রন্থখানি উত্তম কাগজে ও বড় বড় অক্ষরে পরিষ্কার রূপে মুদ্রিত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় দিগের যদি কোন সাধারণ অক্ষর থাকে, তবে উহা দেবনাগর; বঙ্গ বিহার, উড়িষ্যা, পঞ্জাব বোম্বাই প্রভৃতি সকল দেশেই কিছু না কিছু পরিমাণে দেবাক্ষর প্রচলিত আছে। বিশেষতঃ দেবনাগর অক্ষরই সংস্কৃত ভাষায় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিশেষ। বিজয় বাবু সংস্কৃত ভাগ দেবনাগর অক্ষরে ছাপাইয়া তাঁহার সুরুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অপিচ মূল ও টীকা মুদ্রিত করিবার পক্ষে এরূপ সাবধানতা নেওয়া হইয়াছে যে, ভ্রমপ্রমাদ বা অসঙ্গত পাঠ প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের হস্তলিখিত পুস্তক গুলিতে যেরূপ পাঠান্তর সমূহ দৃষ্ট হয় তাহাতে গ্রন্থের সুসঙ্গত পাঠ পাওয়া দুর্লভ। অপিচ কবিরাজ মহাশয় যে যেস্থানে মূল ও টীকার অত্যন্ত বিভিন্ন পাঠ বা অতিরিক্ত পাঠ পাইয়াছেন তাহাতেও একবারে উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়া পাঠক দিগকে আপনার ইচ্ছা অনুসারে পাঠ পছন্দ করিয়া লওয়ার অবকাশ প্রদান করিয়াছেন।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের অনুবাদ পাঠ করিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। বাঙ্গালা অতি বিশুদ্ধরূপে ও প্রাঞ্জলভাবে লিখিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের বঙ্গানুবাদ ইত্যধিক সরল ভাষায় আমরা আশা করিতে পারি না। অপিচ ইহার অনুবাদে অনুবাদকের যেরূপ চিন্তাশীলতা বহুদর্শিতা, আয়ুর্ব্বেদ পাঠের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ইহার ন্যায় সারগ্রাহী বৈদ্য সম্প্রদায়ে অতি অল্পলোক বিদ্যমান আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বাতাদি দোষের প্রসঙ্গে চিকিৎসা তত্ত্বের যে নিগূঢ় ভাবের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অতীব আনন্দজনক। আর হ্রাস ও বৃদ্ধি লিখিতে লিখিতে হমিওপ্যাথির মতের অবতারণা করিয়া সুস্পষ্ট প্রমাণিত করা হইয়াছে যে উহা আয়ুর্ব্বেদের একটী শাখা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ ইহা উনবিংশ শতাব্দির রুচির উপযুক্তই বটে। কবিরাজের যে হোমিওপ্যাথি এবং অ্যালোপ্যাথিক শাস্ত্রেও দৃষ্টি আছে ইহা অপেক্ষা সন্তোষের বিষয় আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ আমরা নির্ব্বন্ধসহকারে বঙ্গীয় সাহিত্য পাঠক দিগকে ও বৈদ্য সম্প্রদায়কে অনুরোধ করিতেছি একবার তাঁহারা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমাদের ন্যায় প্রীতি লাভ করুন। সাধারণের লইবার সুবিধার জন্য ইহার মূল্য ও অধিক নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। রয়েল আটপেজি ফর্ম্মার আট ফর্ম্মা গ্রাহকগণের জন্য আট আনা মূল্যে বিক্রীত হয়। প্রতিদিন একটী পয়সা ব্যয় করা অনেকেরই পক্ষে সহজ।

ভার্গব বিজয়-কাব্য। ঢাকা জয়দেব পুর সা, স, এবং কলিকাতা জ্ঞা, দী, সভার অন্যতম সভ্য শ্রীগোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত এবং প্রকাশিত। সমালোচ্য গ্রন্থ খানি ৭ পৃষ্ঠা সমালোচনসহ হস্তগত হইলেই আহ্লাদে ভাসিয়া ছিলাম বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত কাব্যের এখনও অনেক অভাব, মাইকেলের স্বর্গারোহণের পর দুই তিন জন মাত্র কবির মুখাপেক্ষা করিয়াই আমাদের দুঃখিনী মাতৃভাষা রহিয়াছেন, সেই দলের পুষ্টি

হইলে প্রকৃতই আমাদের আনন্দের দিন। গ্রন্থকার আবরণ পত্রে মালবিকাগ্নিমিত্রের কবিতা উদ্ধৃত করিয়া সাধারণকে জানাইয়াছেন—

'পুরাণ মিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি কাব্যং নব মিত্যবদ্যং।"

প্রাচীনত্ব হইলেই কাব্যের উৎকর্ষতা হয় না, নূতনত্বই নিন্দনীয় নহে।—একথা সঙ্গত, বিশেষতঃ আমাদের মাতৃভাষায় নবীন কাব্যের গৌরব এক্ষণে প্রয়োজন। আর দুই চরণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

'সন্তঃ পরীক্ষাণ্যতরদ্ ভজন্তে,
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধি।"

এ কথার পর ইচ্ছা করিয়া মূঢ় হইতে কে চাহে? সুতরাং তাঁহার পুস্তকের প্রশংসা পত্র কয় খানি পাঠ করিয়াই বলিতে পারিলাম না।—'ইহাতে রসভাব-গুণ-আদি যথাস্থানে যথাসময়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।" "ইহাতে বীররৌদ্র ভয়ানক-করুণ বৎসল ইত্যাদি রস নৃত্যৎ প্রায়বর্ত্তমান্ আছে।" ইত্যাদি। একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে হইল। কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুরোধে গ্রন্থকারের "ষণ্ড" শব্দ-বাচ্য হইবার ইচ্ছায় যেরূপে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি,—তাহাতে পাঠক আমাদিগের অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন না। সঙ্ক্ষিপ্তে বলিতে হইলে—ইহা দেশীয় বিদেশীয় সাহিত্যভাণ্ডারের রত্ন-নিচয়ের অনস্থা সমাবেশ, অব্যবহার্য্য কোষস্থ শব্দ সমূহের স্তূপ,—মিণ্টন মাইকেল প্রভৃতির পদানুসরণে অকৃতকার্য্যতার ছবি।

কবিত্ব জগতে অবিনশ্বর, কীর্ত্তি,—সেই কীর্ত্তি লাভ করিতে সকলেই চাহে। কিন্তু সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বিদ্য, বুদ্ধি কবিত্বের উত্তেজক নহে, কবিত্ব ঐশী শক্তি। তাহা বুঝিয়াই, কালিদাস বাল্মীকি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির জীবনীতে উপন্যাসের অবতারণা হইয়াছে। গ্রন্থকার একেবারে যদি এরূপ অসমসাহসিকতায় অগ্রসর না হইতেন, ভাল হইত। মাইকেল প্রথমেই মেঘনাথ বধ রচনা করেন নাই,—তাঁহার স্মরণ করা উচিত ছিল।

আমরা পাঠক গণের নিকট নিজের অধ্যবসায়ের প্রশংসা পাইবার আশায় প্রথম কয় ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—

"দেব দৈত্য নরাতঙ্ক, জামদগ্ন্য ঋষি,
ক্ষত্রকুলান্তক, বীর পরশুরামের
নাশিলা বিষম-দর্প বিপুল-বিক্রম
অযোধ্যা-কুমুদ-কুল-কুমু-সুহৃদ,
রাঘবেন্দ্র, বলী রাম—কেমনে তা কহ,
সর্ব্ব শুক্লে, সরস্বতি, অগজগন্মাতঃ!
বৈদেহী শুভোপযান-ক্রিয়া সুনির্ব্বাহি,
পরম প্রমোদে যবে সোৎসব-প্রয়াণে

প্রত্যাবরতিতেছিলে। স্বজন সংহতি
সাকেত পত্তন বর্ম্মে, কহ হে ভারতি!

এইরূপ ৩৬৬ পৃষ্ঠা কবিতা পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থে ষোড়শটি সর্গ আছে, প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ আছে, আর মধ্যে মধ্যে টীকা আছে, এতদ্ব্যতীত আবার পরিশিষ্ট আছে। মধ্যে মধ্যে সোপান কূটও আছে।

মাইকেল,—কল্পনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

রচ মধু চক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

এ গ্রন্থকারও—প্রার্থনা করিয়াছেন,—

"কবিত্ব কমোপবনে কিম্বা মধুমক্ষি,—
গঠিবে মধুর চক্র, যার মধু স্রোতে
অনিশ ভাসিবে গৌড় বিপুল পুলকে,
অমৃত ঝঙ্কারে খলু পুরিবে শ্রবণ;

মাইকেলের মধু চক্রের মধু পান কর, নব কবির মধুচক্রের মধুস্রোতে পাঠক ভাসিয়া হাবু ডুবু খাইবে," কথা ঠিক। কবির প্রার্থনা পূরণ হইয়াছে, আমরা ভাসিয়াছি,—কিন্তু 'বিপুল পুলক' অনুভব করিতে পারি নাই। সকল প্রার্থনাই কি পূর্ণ হয়?

কবি প্রথম সর্গের ২৪ পৃষ্ঠায় মাইকেলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

"বাল্য হ'তে মনে মনে বহু দিন পূর্ব্বে
এ'জন কবিত্ব-শিক্ষা-গুরু-পদে তোমা'
বরিয়াছে, মাইকেল! বরণীয় জানি,
রাতনিক—বিনা রত্ন মর্য্যাদা কে জানে?"

কবি বাল্যকালেই রাতনিক!! বয়সে তাহার পরিপাক, বাছিয়া বাছিয়া রত্নগুলি তাঁহার কবিত্বে সাজাইয়াছেন, আমরা তাহার মর্ম্ম কি বুঝিব? যাহা বুঝিয়াছি, তাহা বলিলে হয় তো কবি গাহিবেন,—"রাতনিক-বিনা রত্ন মর্য্যাদা কে জানে?" মাই-কেলের অমৃতময়ী কবিতার আমরা পক্ষপাতী। কবিত্বের মোহিনী প্রতিভা দুঃখিনী বঙ্গভাষাকে দীপ্তি মতী করিয়াছে, বঙ্গভাষার প্রিয় পাঠক মাত্রেই তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ! কিন্তু কবি 'রাতনিক' সুতরাং তাঁহার শিষ্য হইয়া এই অদ্ভুত কাব্যের অবতারণা করিয়াছেন। রতন চিনিতে পার,—প্রশংসার কথা কিন্তু তাই বলিয়া গোষ্পদে রত্ন ফলাইতে চেষ্টা করিলে চলিবে কেন?

আমরা একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না,—এই মাঘ মাসে বৈষ্ণবেরা দ্বারে দ্বারে নন্দের গোপালের প্রধান প্রধান দ্বাদশ নাম গাহিয়া থাকে, আমাদের কবিরও

প্রথম—নাম "দৈগম্বরায়নাত্মজ শ্রীগোপাল্।

দ্বিতীয় নাম—'বরাহনগরাম্ভোধিসম্ভব শশাঙ্ক শ্রীগোপাল।

তৃতীয় নাম—বরাহনগর স্বচ্ছমানসকাসারে জাত তপ্ত জাম্বুনদবর্ণ অম্বুজন্মা শ্রীগোপাল।

দেওয়ান গোবিন্দরাম।

(চতুর্থ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট।)

গোবিন্দরাম সন্ন্যাসীর আশ্রম হইতে বিদায় হইয়া পুনর্ব্বার সেই বাবলা বাঁধ দিয়া চলিলেন। ভীম সর্দ্দারও পুনর্ব্বার প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যাইতে যাইতে দেওয়ানজী ভৃত্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন "হ্যাঁরে, থানায় না দিয়া তুই ও বেটাকে এখানে আন্‌লি কেন?"

ভীম। আজ্ঞা, থানা যে এখান হতে অনেক দূর, ততটা রাস্তা কি ঐ অতবড় জোয়ান মর্দ্দকে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া যায়? এই আলোটা দেখ্‌তে পেয়ে ভাব্‌লেম্ অবশ্য এখানে মানুষ আছে, কোন না কোন একটা উপায় হতে পার্‌বে, তাই এখানে নিয়ে এলেম।

দেওয়ান ভীমের কথায় কোন উত্তর না দিয়া অন্যমনে কি ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া আপনার লাঠি, ভীমকে দিয়া, তাহার করবাল খানি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তুই বরাবর কালীপুরে না গিয়া ভাল করিস্‌নি।"

ভীম। হুজুর, আমি মূর্খ মানুষ, না বুঝে একটা কাজ করে ফেলেছি, আমার কসুর মাপ করুন।

"আচ্ছা, চলে আয়" এই কথা বলিয়া গোবিন্দরাম পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে উর্ম্মিমালার ন্যায় কতই চিন্তা তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত করিতে লাগিল—তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"কি ভয়ঙ্কর কাণ্ডই ঘটিয়াগেল! চারি পাঁচ ঘণ্টা পূর্ব্বে কে জানিত যে এ প্রকার ঘটনা সকল সংঘটিত হইবে? চারি পাঁচ ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার মনের অবস্থা কিরূপ ছিল, এখন কি হইল? আবার কি ঘটিবে তাহাই বা কে বলিতে পারে? আমার সঙ্গিদিগের কি দশা হইয়াছে, তাহাও জানি না। মনুষ্যের জ্ঞান অতীব সামান্য, অতীব সঙ্কীর্ণ। এই অসীম বিশ্বের অধিকাংশ ব্যাপারে সসীম মনুষ্য সম্পূর্ণ অন্ধ। তবে মনুষ্য জ্ঞানের অহঙ্কার করে কেন? মনুষ্য কি বুঝিতে পারে? দেখিতে পায় না বলিয়া চন্দ্রমার অস্তিত্ব অস্বীকার করা অন্ধের যেমন ধৃষ্টতা; আমরা যাহা বুঝিতে পারি না, তাহা হইতে পারে না বলা, আমাদের সেইরূপ প্রগল্‌ভতা, নাস্তিকতা মূর্খতার চরম সীমা। লোকে বলে, যোগ বলে ব্রহ্মাণ্ডের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়, জানি না সেকথা কতদূর সত্য। কিন্তু সন্ন্যাসীর কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! ইনি একস্থানে বসিয়া নানা স্থানের ঘটনা অনায়াসে জানিতে পারিতেছেন। আহা, কেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম না! জানিনা কি হইতেছে! স্ত্রীলোকের পুরী, অবি-

ভাবক কেবল বৃদ্ধ শ্বশুর মহাশয়—তিনি কি করিবেন? না জানি দস্যুগণ কতই যন্ত্রণা দিতেছে, কতই অবমাননা করিতেছে।”

“উঃ অসহ্য—ভীমে আর কত দূর আছে! এখন আমরা কোথা এসেছি?”

ভীম। আজ্ঞা, এই যে ডানকুনি গ্রাম বামে রেখে এলাম।

দেওয়ান। তবেত আমরা এসে পড়েছি অ্যাঁ!

ভীম। আজ্ঞা ঐ যে ওপারের রাস্তা দেখা যাচ্ছে।

বহুদূর প্রসারী প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে, প্রান্তরের পশ্চিম সীমায় কৃশাঙ্গী সরস্বতী নদী রজত-রেখার ন্যায় মৃদু মন্দ গতিতে নীরবে প্রবাহিত হইতেছে। নদীর পশ্চিম পারে বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষাবলি সংখ্যাতীত খদ্যোত মালা মণ্ডিত হইয়া রত্ন-তরুর ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং সেই তরুরাজির পশ্চাদ্ভাগে সুপ্রশস্ত কাঁচা রাস্তা দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার ধারে কালীপুর গ্রাম এবং এই রাস্তাই ভীম সর্দ্দার গোবিন্দরামকে দেখাইয়া দিল। তাঁহারা যে পথ দিয়া আসিতেছিলেন, সে পথ কালীপুরের রাস্তার সহিত একটি ইষ্টক নির্ম্মিত সেতুর দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে। দেওয়ান ভৃত্যসহ নদী পার হইয়া গ্রামের প্রান্ত ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে কেবল শ্মশান ভূমি ও দুই এক ঘর ইতর লোকের বসতি। বড়ই অপ্রীতি-জনক স্থান। এখানে আসিয়া দেওয়ানের চিত্ত আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তিনি কল্পনায় নানা বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন—তিনি যেন স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন—বিলম্ব তাঁহার অসহ্য হইল—তিনি উন্মত্তের ন্যায় পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঘোষেদের বাটী।

রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, পৃথিবী নিস্তব্ধ, প্রাণী মাত্রেই নিশ্চল নিদ্রিত, কেচিৎ কোথায় একটা কুক্কুর ডাকিতেছে, কেচিৎ কোথায় একটা পেচক উড়িয়া যাইতেছে, এ প্রকার প্রগাঢ় নিশীথ সময়ে কে ও রমণী, একাকিনী ঐ দ্বিতল গৃহের বাতায়নে বসিয়া আছেন? কেন ও নীলোৎপল বিনিন্দিত নয়ন যুগল অসংখ্য নক্ষত্র খচিত নীলাকাশে অর্পিত হইয়াছে? যুবতী কি কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন? না, কোন অসহ্য মনোবেদনায় একার্দ্ধ পর্য্যন্ত সুখশয্যা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন? গৃহ মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, এক খানি পর্য্যাঙ্কোপরি আর একটি রমণী নিদ্রিতা রহিয়াছেন। নিদ্রিতা বামা বিধবা। গৃহের নিচে দিয়া একটা শৃগাল খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিয়া চলিয়া গেল। পরক্ষণেই কতকগুলা কুক্কুর কঠোর চীৎকার করিয়া উঠিল। বিধবার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তিনি জানালার দিকে চাহিয়া

বলিলেন, "ঠাকুরঝি শোবে না, রাত্রি অনেক হয়েছে যে।"

বাতায়ন-স্থিতা রমণী দেওয়ান গোবিন্দ রামের সহধর্ম্মিণী, নাম বিনোদিনী। বিনোদিনী ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন, 'হ্যাঁ যাই—।"

বিধবা পাশ-মোড়া দিয়া বলিলেন, এস না, সারা রাত জাগিলে অসুখ হবে যে।

বিনোদিনী। হ্যাঁ যাই—।

বিধবা। আর দেরি করচ কেন? ঠাকুরজামাই এলে এতক্ষণ আসতেন। আজ আর তিনি আসবেন না। তুমি শোবে এসো।

বিনোদিনী। "হ্যাঁ যাই—"

বিধবা। "সে কি, তুমি কাঁদছ না কি?" বিনোদিনীর হৃদয়ে বড়ই যন্ত্রণা হইতেছিল। নানা প্রকার দুর্ভাবনা তাঁহার চিত্তপটে কতই অমঙ্গলের ছবি চিত্রিত করিতেছিল। বহুদিনের পর আজি তাহার স্বামী আসিবেন। তিনি এতক্ষণ তাঁহার আগমণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন বিধবার কথা শুনিয়া তিনি আর মনের আবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বিধবা শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বিনোদিনীর হস্ত ধরিয়া পর্য্যঙ্কে আনিয়া বসাইলেন, এবং আপনিও তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন। সম্মুখস্থ দীপালোকে তাঁহাদের উভয়ের অনিন্দ্য বদন কমল যাহার পর নাই মনোহর বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই যুবতী, উভয়েই সুন্দরী। পার্শ্বাপার্শ্বি উপবিষ্টা হইলে বোধ হইল যেন একডালে একটি অর্দ্ধ মুকুলিত ও আর একটি পূর্ণ বিকশিত গোলাপ ফুল বিরাজিত রহিয়াছে। কি অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্য, কি অপূর্ব্ব শোভা! জগতে যত প্রকার সৌন্দর্য্য আছে, বোধ হয় রমণী-সৌন্দর্য্যের নিকট সকলেই পরাস্ত। বিধবা নিজ বসনাঞ্চলে বিনোদিনীর মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "ছি ভাই তুমি কাঁদছ কেন? ঠাকুরজামাই এলেন না বলে কাঁদছ? তুমিত বড় নির্ব্বোধ মেয়ে—কেঁদে তাঁর অকল্যাণ কর কেন? নৌকা ডিঙির পথ জোয়ার ভাঁটার সুবিধা অসুবিধা আছে—বোধ হয় নৌকা এসে পৌঁছায়নি তাই তিনি এলেন না। তা আজ না আসেন কাল সকালে আসবেন। তার জন্য অত ভাবনা কি—কান্না কেন?"

বিনোদিনী। "বৌ আমার বড় মন কেমন করছে। আমার মনে কেবলই কু গাইছে। তিনি ভাল আছেন ত?" (পুনর্ব্বার তাহার নয়নযুগল জলে ভাসিয়া গেল।)

বিধবা। বালাই, ভাল থাক্‌বেন না ত কি, অমন অমঙ্গুলে কথা মুখে আনতে আছে,—ঠাকুরঝি কে যেন সদর দরজায় ঘা দিচ্চে না, তাইত দরজা ভেঙ্গে ফেল্লে যে—

বিনোদিনী। বাবাত বাইরে শুয়ে আছেন, তিনি কি এতই ঘুমিয়ে পড়েছেন?

বিধবা। রাত্রিত কম হয় নি। আহা বুড়োমানুষ অনেক রাত জেগে, বসে থেকে থেকে হয় ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। তা এক কর্ম্ম কর প্রদীপটা নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে এস, আমিই গিয়ে দরজা খুলে দিচ্চি।

বিনোদিনীর মুখকমল প্রফুল্ল হইল, তিনি প্রফুল্ল অন্তরে দক্ষিণ হস্তে প্রদীপটি লইয়া আগে গিয়া ঘরের দ্বার খুলিলেন। বিধবা বিনোদিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাইত ঠাকুর

জামাইয়ের আর দরজা খোলবার দেরি সচ্চে না—দরজাটা ভেঙ্গে গেল যে।”

বিধবার কথায় বিনোদিনী কিছু লজ্জিতা হইলেন, তিনি ভ্রাতৃজায়াকে যথেষ্ট মান্য করিতেন। রমণীদ্বয় সিঁড়ি হইতে নামিয়া ক্রমে বহির্বাটীতেগেলেন। তাঁহারা যেমন উঠানে পদার্পণ করিলেন অমনি সজোর অঘাতে বহির্বাটীর দ্বারের একখানি কপাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল এবং যমদূতের ন্যায় বিকটাকার দুই জন পুরুষ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। তাহাদের সর্ব্বশরীর তৈল কালিতে অভিষিক্ত উভয়েরই হস্তে এক একটী বৃহৎ জ্বলন্ত মশাল ও এক এক গাছি সুদীর্ঘ যষ্ঠি; বামাদ্বয় অকস্মাৎ এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বিনোদিনীর হস্তস্থিত প্রদীপটি স্খলিত হইল। তাঁহারা দুইজনে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত দ্বিতল গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিনোদিনী স্বভাবতঃ কোমল প্রকৃতি, একে রাত্রি জাগরণে ও উৎকণ্ঠায় তাঁহার দেহ ও মন জর্জ্জরিত হইয়াছিল, তায় আবার এইরূপ ঘটনায় তিনি ভয়ে ও নৈরাশ্যে বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। আর দাঁড়াইতে পারিলেন না একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাশায়িনী হইলেন। বিধবাও হতবুদ্ধি হইয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গবাক্ষদ্বার দিয়া বহির্বাটীর দিকে চাহিয়া কাষ্ঠবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যে দুই বিকটমূর্ত্তি বাটীমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাদের একজন দস্যু-প্রধান রত্নাপাখী ও অপর ব্যক্তি তদীয় অনুচর। রত্নাপাখী, বাটীমধ্যে প্রবেশ করিয়া, এক ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ছাড়িল ও ঝোড়োকে ঘাটি আগ্‌লাইতে বলিয়া সেই রমণীদ্বয় প্রতি ধাবমান হইল কিন্তু উপরে যাইয়া দেখিল, তাঁহারা ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়াছেন। তখন সে বাহির হইতে দ্বারের শিকল বন্ধ করিয়া পুনরায় বহির্বাটিতে আসিল। চণ্ডীমণ্ডপে একখানি খাটিয়ার উপর দেওয়ানের শ্বশুর বৃদ্ধ হলধর ঘোষ নিদ্রা যাইতেছিলেন। রত্নাপাখীর বিকট চীৎকারে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলেও ডাকাইত পড়িয়াছে জানিয়া তিনি ভয়ে জড়বৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন। রত্নাপাখী মশাল হস্তে বৃদ্ধের সম্মুখীন হইয়া বলিল। “ওরে বুড়ো ঐ, তোর সেই জামাইয়ের চাকর বেটা কোথা?”

বৃদ্ধ। আঁ—জামাই—

রত্না। হাঁ। জামাই, তাকে যমের বাড়ী পাঠিয়েছি, এখন তার চাকর আর বাক্স কোথা বল?

বৃদ্ধ। আঁ্যা—বা-ক্স—বা-বা আ-মি-ত কি-ছু-ই জা-নি না—

রত্না। তবে রে ব্যাটা পাজি, জানিস্‌নে? (প্রহার করিতে করিতে) বল্‌ বলছি কোথা বল?

বৃদ্ধ। দোহাই বাবা, আমি কিছুই জানি না, ভগবান জানেন, আমি কিছুই জানি না। বাবা এই চাবি দিচ্চি আমার যা কিছু আছে তোমরা নাও আমায় প্রাণে মেরো না।

রত্না। (চাবি লইয়া) আরে বেটা, তোর কি আছে তা নেব, সে বাক্সটা কোথা এখন বল?

বৃদ্ধ। বাবা—তোমার পায়ে পড়ি আমায় আর মেরোনা। বাক্স মাক্স আমি কিছুই জানি না বাবা।

রত্না। “বল্‌বি নি”—এই বলিয়া সেই

জ্বলন্ত মশাল বৃদ্ধের মুখে গুঁজিয়া দিল ও পদাঘাত করিয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল। বৃদ্ধ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া পুনরপি একখানি বৃহৎ কষ্ঠের দ্বারা তাহার হাত পা ছেঁচিতে লাগিল। যখন দেখিল তাহাতেও তাহার মনোরথ পূর্ণ হইল না তখন সেই অসমর্থ অসহায় বৃদ্ধকে টানিয়া লইয়া একটা গোগৃহের ভিতর প্রক্ষেপ করিল, বৃদ্ধ মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিল। গোয়ালের গাভীটি সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, সেই জ্বলন্ত মশাল ও বিধুন্তদ ব্যাপার দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং বলপূর্ব্বক দড়ি ছিড়িয়া হম্বারব করিতে করিতে পলাইয়া গেল। রত্না বাহির হইতে কবাট রুদ্ধ করিয়া সেই জ্বলন্ত মশাল দ্বারা ঘরের চালে আগুন লাগাইয়া দিল। চালের খড় ক্রমে জ্বলিয়া উঠিল। রত্নাপাখী পুনরায় অন্তপুরে প্রবেশ করিয়া লুট পাট আরম্ভ করিল। বিধবা বাতায়ন হইতে বৃদ্ধ শ্বশুরের নিদারুণ নিপীড়ন ও যন্ত্রণা দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, তাঁহার ক্রন্দনে বিনোদিনীর চেতনা হইল। তিনি উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু উন্মাদিনীর ন্যায় কেবল একদিক পানে ফেল্ ফেল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। রত্না, নিচের ঘরে যাহা কিছু বহুমূল্য দ্রব্যাদি পাইল, সংগ্রহ করিয়া একখানি বস্ত্র দ্বারা আপনার কটিদেশে বন্ধন করিয়া উক্ত দ্বিতল গৃহের দ্বারে পদাঘাৎ করিতে লাগিল। বারংবার পদাঘাতে কপাট ভাঙ্গিয়া গেল তখন সে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিনোদিনীর কণ্ঠহার ছিড়িয়া লইল ও বলিল যদি বাঁচিতে চাস্ তো বাক্স বাহির করিয়া দে। কিন্তু সে কথার কোন উত্তর না পাইয়া রমণীদ্বয়কে প্রহার করিতে করিতে বহির্বাটীতে লইয়া আসিয়া বলিল "দেখ্ ঝোড়ো সে চাকর আর সেই বাক্সটা কোথা যদি না বলে তাহলে এ বেটীদেরও গোয়ালে পুরে পুড়িয়ে মার্।" এই কথা বলিয়া রত্না ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করতঃ চপলা ক্রীড়াবৎ যষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। গোগৃহের চাল তখন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং সেই গৃহমধ্যে হতভাগ্য বৃদ্ধ প্রাণভয়ে ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতেছে। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! কি লোমহর্ষ্য ব্যাপার!

বিনোদিনী পুনর্ব্বার মোহ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ধন্য বিধবার সহিষ্ণুতা, ধন্য তাহার সাহস তিনি এ অবস্থাতেও বিনোদিনীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন ও তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিনোদিনীর গাত্রে অবশিষ্ট যাহা কিছু অলঙ্কার ছিল, ঝোড়ো তাহা খুলিয়া লইল, শেষে কর্ণাভরণ শীঘ্র খুলিতে না পারিয়া সজোরে তাহা ছিঁড়িয়া লইল। আহা অভাগিনীর কপোল বহিয়া দরদরিত ধারায় রুধির প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিধবা কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ বসনাঞ্চলে সেই রক্তধারা মুছিয়া দিতে লাগিলেন।

এমন সময় "হায় কি করিলি পিশাচ" বলিয়া কে চীৎকার করিয়া উঠিল। কাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে এ গম্ভীর বাণী বিনির্গত হইল? বিধবা এই শব্দেই ফিরিয়া চাহিলেন ও দেখিলেন, দস্যুর স্কন্ধ হইতে কোটিদেশ পর্য্যন্ত দ্বিধা হইয়া ভূতলে পতিত

হইল। এ কাহার কার্য্য! এ বিপদ কালে কে আসিয়া সহায়তা করিল। বিধবা আবার দেখিল রক্তাক্ত অসি হস্তে উন্মত্তের ন্যায় এক ব্যক্তি আসিয়া বিনোদিনীকে হৃদয়ে তুলিয়া লইয়া অন্তপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই ব্যক্তি দেওয়ান গোবিন্দ-রাম। বিধবা গোবিন্দরামকে চিনিতে পারিলেন ও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রত্নাপাখী আপনাকে সহায়হীন দেখিয়া পলায়ন করিল। পরক্ষণেই ভীম সর্দ্দার আসিয়া পৌঁছিল।

ভীম সর্দ্দার দেওয়ানের অনুজ্ঞামত সেই প্রজ্জলিত গোগৃহ হইতে বৃদ্ধ হলধর ঘোষকে বক্ষে করিয়া অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোগৃহ জ্বলিতে লাগিল, অগ্নিশিখা সর্পজিহ্বার ন্যায় লক্ লক্ করিয়া গগনস্পর্শ করিতে লাগিল এবং কঠিন বংশ গ্রন্থি সকল ফাটিয়া ফাটিয়া ভয়ঙ্কর শব্দোৎপন্ন করিতে লাগিল—সে রাত্রে—সেই ঘোর বিপদের রাত্রে—তাহার কোনই প্রতিকার হইল না।

প্রকৃতি।

১

সরস বরষা, শ্যামসুন্দর প্রকৃতি শোভা মনোহর তর।
সঘন গগনে, ঘন গরজি গম্ভীরে ধীরে চলে নিরন্তর।
জল ভারে জলধর, গাঢ়তর নীলভর,
ভয়ঙ্কর মাধুরী বিজরি বজ্রহাস্য, দৃশ্য বিরাট সুন্দর!
আহা মরি! হেরি এ নীরদ কান্তি, উথলি উঠিল হৃদে ভাবের সাগর।

২

ঝড় ঝড় তড় তড় গড় গড় শব্দে, বৃষ্টি ঢালে জলধর।
স্বন্ স্বন্ স্বনিছে সমীর ভীমোল্লাসে, পূর্ণ করিয়া অম্বর।
নদ নদী সরোবরে, জল থৈ থৈ করে,
খাল বিল ক্ষেত্র সব ভাসিছে পাথারে, দৃশ্য ধবল ধূসর।
দেখ দেখ, ঘনশ্যাম পত্রভারে দম্নীত তরুলতা শোভা কি সুন্দর।

৩

সর্ব্বত্র সলিলসিক্ত পশুপক্ষী সকলে আকুল জলে জলে,
জলচর মকর কুম্ভীর শুশুকাদি ভাসে ডুবে নদীজলে,
নূতন বরষা ভাবে, ভেক মক্ মক্ রাবে,
গাহিছে গম্ভীর খাদে, ডাহুক ডাহুকী পাখী ডাকে কুতুহলে
মনসুখে গলায় গলায় নব-দম্পতি সম্প্রীতি ভয়ে বিঞ্চিছে বিরলে।

সকলি বিচিত্র! চিত্ত প্রমত্ত হইল ভাবে হেরি এ মাধুরী!
প্রাণের জড়তা কোথা পালাল, কি হ'ল মোর বলিব কি করি?
সঞ্জীবনী সুধাপানে, বিদ্যুৎ ছুটিল প্রাণে,
উঠিয়া বসিনু এই, কিসের ঔদাস্য? বিশ্বে কারে শঙ্কা করি?
প্রকৃতি গো! সংসারের সঙ্কীর্ণতা, পারে কি ভুলাতে মোরে তোরে যদি স্মরি?

৫

তুই গো মা, এ মৃতের অমৃত প্রবাহময়ী সুখ তরঙ্গিনী।
তুই গো মা, কল্পনার সাগর, সৌন্দর্য্য, ভাব, বৈচিত্রের খনি।
তোমার বিশাল ভাবে, চিত্ত ডুবে যায় যবে,
সংসারের রঙ্গলীলা, খেলাধুলা প্রায় বোধহয় মা, আপনি!
মনে মনে, মানবের প্রভুত্ব, মহত্ত্ব লঘুতায় ঘৃণা হয় গো জননী।

৬

তোমার অনন্তরাজ্যে কে পারে ভ্রমিতে মাতঃ কাহার শকতি?
কিছু যদি পারে কেহ সেহ সফলতা, সেহ দুর্লভ শকতি!
অসংখ্য মানবমাঝে, কয়জন হেন আছে,
পারিবে বা পারিয়াছে চিনিতে প্রকৃতরূপে তোমারে গো সতি?
"তুমি আমি" চিনিব কি? চিন্তাকরি চিনিছে কি না চিনিছে কবি কুলপতি!

৭

কত ব্যাস, বাল্মীক, হোমর, কালিদাস তব দ্বারেতে ভিখারী।
দেবতা তাহারা ভবে, তোমার বিশাল গ্রন্থ স্পর্শ মাত্র করি।
তব শ্রীচরণ ভাতি, যে জন পেয়েছে সতি,
সেইত মানব জাতি করেছে পবিত্র, গোত্র গেছে ধন্য করি!
পৃথিবীতে, সেইত মানবকুলে মাননীয়, পূজনীয়, পারের কাণ্ডারী।

৮

বুদ্ধ, ইসা, রুশো আদি সাম্যের প্রচার কর্ত্তা তোমারি কৃপাতে।
বাল্মীক, হোমর, ব্যাস, কালিদাস, "মহাকবি" তোমারি দয়াতে।
গ্যালিলিও নিউটন, প্রাজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ,
শঙ্কর, ভাস্করাচার্য্য, জ্ঞানী চূড়ামণি তাও তব কটাক্ষেতে।
ভীমার্জ্জুন, সেকন্দার, সিরাজাদি, তব পদরেণু স্পর্শে বীরসংসারেতে।

৯

তোমার কৃপার কণা যে জন কিঞ্চিৎমাত্র পায়গো জননী
লোকাতীত অনুকূল উন্নত প্রশস্ত পথ, পায় সে আপনি।
সেই এই পৃথিবীতে, অসংখ্য মানব হতে,
জ্ঞান, বুদ্ধি, পরাক্রম, সাহস, সম্ভ্রমে, হ'য়ে থাকে চূড়ামণি।
সকলেই জীবিতে যদিও তারে নাগনে, না চিনে, কালে চিনিবে আপনি।

১০

সংসারে চতুর, ক্রূর, বঞ্চকগণের প্রভুত্ব ভীষণ।
সহসা তাদের কাছে তোমার সেবকজন না পায় আসন।
নানা সংগ্রামের পরে, পরীক্ষা অনলে পুড়ে,
অকালে জীবন লীলা সম্বরিয়া প্রায় পায় অনন্ত জীবন।
কেহ কেহ সে নীচ শৃগাল দিগে বধে সিংহবলে, সাধে উদ্দেশ্য আপন।

১১

চন্দ্রের আলোকে যথা কুক্কুর চীৎকার করি ছুটাছুটি করে।
গুণের সৌন্দর্য্য প্রভা হেরিয়া তদ্রূপ নীচ পরিতাপে মরে।
কত শত মহাত্মারে, অনাদরে অবিচারে,
পামরেরা বধিয়াছে, দিয়াছে যন্ত্রণা, এই মানব সংসারে।
ইতিহাসে তাহাদের এ কুখ্যাতি রহিবে রক্তেতে লিখা, কে মুছিতে পারে?

১২

কে মুছিতে পারে তব ক্ষণজন্মা পুত্রদের কীর্ত্তিপট লেখা?
কালের ললাটপটে অনল অক্ষরে যাহা, হইয়াছে লিখা।
যে যাহা ক'রেছে ভবে, অবশ্য বিচার হবে!
ন্যায়ান্যায় মানবের সূক্ষ্ম চালনীতে কালে'যায় সব ছাঁকা।
তাহাদের বুদ্ধি, হৃদি, বিবেকাদি অন্ধ নহে, সত্যাসত্য যায় তায় দেখা।

১৩

যা কিছু ঘটিয়া থাকে সকলের সব তুমি প্রকৃতি ঈশ্বরী।
অনুকূল প্রতিকূল কাহার যে কিবা তাহা বুঝিতে না পারি।
তুমি যারে দয়াকর, সেই জন হয় বড়,
কিন্তু তারে ঘোরতর বিপদের পরীক্ষায় ল'ও শুদ্ধ করি।
কদাচিৎ সচ্ছন্দে সফল কাম হ'য়ে থাকে কেহ, তাও দেখি শুভঙ্করী।

১৪

সকলি বিচিত্র! মাতঃ তোমার করণ কথা বুঝে সাধ্য কার?
তত্ত্বমসী, সত্য তুমি! সর্ব্বত্র প্রকাশ, পৃথ্বী একাংশ তোমার।
আকাশ আসন পরে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যুড়ে,
বিশাল সুন্দর কায়া চন্দ্র সূর্য্য, তারকা ভূষিত চমৎকার!
ত্রিকাল ত্রিনেত্র, দশদিক দশবাহু, বিশ্বময়ি! তব মহিমা অপার।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মধুযামিনী।

দশম পরিচ্ছেদ।

বাহক হিঙ্গনার পিতৃভবনে একদিন মাত্র অবস্থিতি করিয়া স্বদেশে আসিয়া অরুণার কথা সকল উদয়গিরিকে বলিলে, তিনি অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; এবং এ সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতে কর্ম্মস্থল হইতে অবকাশ লইয়া বাটী যাত্রা করিলেন।

তিনি বাটী যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাহককে পুনরায় ডাকিয়া কুমারের রূপ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। বাহকও পুনর্ব্বার তাহাকে বলিল যে তিনি দেখিতে অতিশয় সুশ্রী ও তাঁহার বয়সও নবীন, এবং হিঙ্গনা তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। বাহকের কথায় তাঁহার পূর্ব্বাবধি ভয় হইয়াছিল, এক্ষণে সেই ভয় বলবৎ হইল। উদয়গিরি দেখিলেন যে তাঁহাকে রূপের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তিনি এ যুদ্ধে, বাহক যেরূপ কহিতেছে, অপ্রস্তুত; তথাচ ভাবিলেন বেশভূষাদিতে তিনি অবশ্য ভালই দেখাইবেন, কিন্তু তাঁহার সাহস হইল না যে তিনি বাহককে জিজ্ঞাসা করেন যে কুমার তাঁহার অপেক্ষাও সুশ্রী কি না; কেননা এরূপ প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার আত্মাভিমানের খর্ব্বতা হইতে পারে। বাহক চলিয়া গেলে তিনি পুনঃ পুনঃ দর্পণে আপন মুখছবি দেখিতে লাগিলেন, দেখিয়া একবার বা সন্তুষ্ট একবার বা অসন্তুষ্ট, একবার বা আশ্বাসিত একবার বা হতাশ হইতে লাগিলেন। ভবিষ্যৎ ফল দূর রহিলে আশা মনুষ্য হৃদয় একবারের পরিত্যাগ করেনা, উদয় সেই আশার উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার আয়োজন কুমারের ন্যায় নহে। সুমধুর বংশিধ্বনি, স্বীয় দীনতা প্রকাশ, সুমিষ্ট স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণ, সরল দাক্ষিণ্য প্রভৃতি তাঁহাতে কিছুই নাই, তিনি আপন বেশ ভূষা, উত্তমোত্তম সামগ্রী ও যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত একত্র করিয়া পুনঃ পুনঃ যতই দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে ততই বিশ্বাস হইতে লাগিল যে তিনি অবশ্য জয়ী হইবেন।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন—বালিকা-হৃদয়-দুর্গ অতি কঠিন নহে, তবে শত্রু শুনিতেছি প্রবল। সম্মুখ সমরে তিনি পরাস্ত হইতে পারেন, কিন্তু সমরের আবশ্যকতা কি? কুমার একজন দুঃখীজন, অর্থ ও কৌশলে সুহৃদ-ভেদ ও সন্ধি স্থাপন হইতে পারে। হতবুদ্ধি উদয়! তিনিও অপরাপর ধনী জনের ন্যায় ভাবিলেন প্রণয় নিতান্ত অর্থসাধ্য, যদি সংসারে তাহাই হইত, তাহা হইলে নির্ম্মল দাম্পত্য প্রেম স্বর্ণ-অট্টালিকা অতুচ্চ প্রাসাদ সকল সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়া পর্ণকুটীরে স্বীয় স্বর্গীয় বিভা বিস্তার

করিত না। কমলিনী বৃহৎ হ্রদ ও প্রশস্ত জলাশয় সকল পরিত্যাগ করিয়া সামান্য সরোবর অলঙ্কৃত করিত না।

উদয়গিরি বস্ত্র, অলঙ্কার; ও নানা প্রকার তৈজসাদি সংগ্রহ করিয়া বাটী যাত্রা করিলেন।

এদিকে মান্দালা প্রদেশে এ বৎসর সুবৃষ্টি না হওয়ায় ভালরূপ শস্য উৎপন্ন হয় নাই। তত্রস্থ লোক সকলেই হা-হা-করিতেছে। পথঘাটে দুই তিন জন একত্র হইলেই শস্য ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের কথা কহে না। যে শস্য জন্মাইয়াছে বৃষ্টি অভাবে তাহাও নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এখনও বৃষ্টি হইলে অনেক রক্ষা হয়। সকলেই কাতর সকলেই ভাবী অন্ন কষ্ট ভয়ে ব্যাকুল-চিত্ত। ঘনশ্যাম দেবের আচার্য্য সকলকেই পূজার জন্য উপদেশ দিতেছেন, দেশের প্রধান লোক তাঁহারই মতের অনুগত হইতেছেন। এমন সময়ে কুমার যে চলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে হিঙ্গনার পিতা ও মাতা পরম সুখী হইয়াছেন, বিশেষতঃ উদয়গিরির বাটী ফিরিয়া আসিবার সময় নিকটবর্ত্তী।

কুমারের ভগিনীর পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি ক্ষণকালের জন্যও তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছেন না। হিঙ্গনা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে কুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। কোন দিন বা কুমারের লোক আসিয়া যথাবিহিত সম্মান সহকারে তাঁহার ভগিনীর পীড়ার সংবাদ দিয়া যায়, কোন দিন বা কেহ আসে না, না আসিলে হিঙ্গনা সেইদিন ক্ষুন্নমনে আস্তে আস্তে বাটী ফিরিয়া আসেন।

হিঙ্গনা কুমারের জন্য প্রতিদিন পর্ব্বতদেশে একাকিনী দণ্ডায়মানা হইয়া সজল নয়নে যোড় করে অস্তগামী সূর্য্যদেব ও ঘনশ্যামদেবের নিকট একান্ত হৃদয়ে কুমারের ভগিনীর পীড়া উপশমের জন্য প্রার্থনা করেন। অরুণা ইহা গোপনে দুই এক দিন দেখিয়া ছিলেন। নিষ্ঠুরা এক্ষণে বিবেচনা করিল হিঙ্গনাকে ডাইন বলিয়া পরিচয় দিবার ও শস্য হানি তাহারই কর্তৃক হইতেছে ইহা ব্যক্ত করিবার এই উপযুক্ত সময়। তিনি এই ভাবিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন কাহার নিকট গিয়া গোপনে এ বিষয়ের প্রথম প্রস্তাব করিবেন এবং কাহার সহায়তা সাপেক্ষ করিয়া মনোভিলাষ সিদ্ধ হইতে পারিবেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে ঘনশ্যাম দেবের আচার্য্যকে প্রথমে প্রতীত করিতে পারিলে তিনি এই অভিসন্ধিতে সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারেন। তিনি এইরূপ স্থির সংকল্প হইয়া একদা সন্ধ্যা অতীত হইলে গোপনে ঘনশ্যাম দেবের আচার্য্যের নিকট যাইলেন। আচার্য্যের বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ বৎসর, তিনি দেখিতে কুশ্রী নহেন, তাঁহার বর্ণ গৌর মুখের লাবণ্য আছে। তাঁহার নাসিকার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বক্র, চক্ষু দুটী বিশাল নহে, নিতান্ত ক্ষুদ্রও নহে, অবয়ব কিছু স্থূল। আচার্য্যগণ বিনা পরিশ্রমে নিত্য প্রচুর আহার পান বলিয়া প্রায়ই ইন্দ্রিয়সেবক হইয়া থাকেন, ইনি বা অন্যরূপ হইবেন কেন? সন্ধ্যার পর অরুণা তাঁহার নিকট সভয়ে যাইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে, তিনি হাস্য মুখে সুমিষ্ট বচনে তাঁহাকে নিকটে বসিতে বলিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন অল্পবয়স্কা অরুণা এরূপ সময়ে তাঁহার নিকট কিহেতু আসিয়াছেন,

হয়ত উত্তম স্বামীর জন্য দেবতার নিকট কামনা জানাইতে আসিয়াছেন। তিনি ইন্দ্রিয় সেবক জনোচিত লোভ-দৃষ্টিতে পুনঃ পুনঃ অরুণার নবীন দেহের প্রতি চাহিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অরুণে! কি কামনা করিয়া আসিয়াছ?"

অরুণা। দেশে এ বৎসর শস্য হয় নাই, সকলেই হা—হা—করিতেছে, আপনি কি জানেন কি হেতু হইতেছে?

আচার্য্য। (সবিস্ময়ে) না, কি কারণ হচ্চে?

অরুণা। সে অতি গুপ্ত কথা—

আচার্য্য। বলনা।

অরুণা। আপনি শপথ করুন্ আমি যাহা বলিব তাহা কাহারও নিকট বলিবেন না, যদি বলেন, আমার নাম করিবেন না।

আচার্য্য। অরুণে! আমি তোমারই শপথ করে বল্‌চি তোমার নাম করিব না।

অরুণা। হি—হিঙ্গনা ডাইন; তা—রই হইতে এই বৃষ্টি হচ্চে না, সে—প্র—প্রতিদিন পর্ব্বতে উঠে মন্ত্র পড়ে।

আচার্য্য হিঙ্গনাকে জানেন। তাঁহার রূপের প্রশংসা তিনি প্রতিদিন মনে মনে শত শতবার ক'রে থাকেন। তিনি যে ডাইন হয়েছেন, একথা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "অরুণে! তুমি আমাকে দেখাতে পার?"

অরুণা। হাঁ—আমি না দেখিয়া কি বল্‌চি।

আচার্য্য। আমি শুনিয়াছিলাম কুমার নামে একজন অল্পবয়স্ক সুশ্রী পুরুষ তাঁহাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া তাঁহার বাটীতে কাজ কর্ম্ম করিতেছে, এক্ষণে সে কোথায়?

অরুণা। (হাসিয়া) সেইত হিঙ্গনাকে মন্ত্র শিখিয়ে এখন সরে দাঁড়িয়েছে।

আচার্য্য। কি বল্লে?

অরুণা। এখন ভগিনীর ব্যামো হয়েছে বলে পালিয়েছে। আমি শুনিছি ও মন্ত্র একবার শিখ্‌লে আর থাক্‌তে পারে না, তাই সন্ধ্যাবেলা পর্ব্বতের উপর গিয়ে দেশের অমঙ্গল করে, জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলে "কুমারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকি যদি আসে," কিন্তু আমি ত কাহাকেও দেখিনি।

আচার্য্য। তাও ত হতে পারে?

অরুণা। তা—হতে পারে, কিন্তু বিড় বিড় করে আপনার মনে কি বলে?

আচার্য্য। তা তুমি কেন জিজ্ঞাসা কর না?

অরুণা। করেছিলুম' কিছু বলে না, হেঁসে পালিয়ে যায়।

আচার্য্য। আমি যদি ডাইন বলে হিঙ্গনাকে ধরিয়ে দি তা হলে তোমার দুঃখ হবে না?

অরুণা। দুঃখ—দুঃখ কেন? তা হলেইত ভাল হয়, কেন মন্দ সকলকার করবে?

আচার্য্য। তবে তোমার দুঃখ হবে না!

অরুণা। না—পোড়ারমুখীর জন্য আমার আবার দুঃখ হবে!

আচার্য্য ভাবিলেন যে হয়ত অরুণার কোন স্বার্থসাধনের ইচ্ছা আছে, না হইলে সুন্দরী হিঙ্গনাকে কেন এরূপ অপবাদ দিবে, বা সে যথার্থই ডাইন হইয়া থাকিবে; যাহা হউক, অরুণার যদি ইহাতে স্বার্থ-সাধন হয়, তাহা হইলে আমিই বা কেন নিজ স্বার্থ-ত্যাগ করি? যদি অপবাদ প্রকৃত অপবাদই, তা হলে হিঙ্গনাও কোন

না আমাকে বশে রাখিবার জন্য প্রয়াস পাইবে, অন্ততঃ উপস্থিত বা অকারণ ত্যাগ করি কেন, তিনি এই ভাবিয়া কহিলেন, "অরুণে! যদি হিঙ্গনা প্রকৃত ডাইন হয়ে থাকে, তাহ'লে আমি সকলকে বলিব, কিন্তু আমি যে এই কাজ কর্‌বো, তুমি আমাকে কি দিবে?"

অরুণা। কি দিব?

আচার্য্য। (হাসিয়া) আমি অন্য কিছু চাহি না।

অরুণা। তবে কি?

আচার্য্য। তুমি ইচ্ছা কর্‌লে দিতে পার্‌বে।

অরুণা। কি জিনিস বলুন না?

আচার্য্য। জিনিস না।

অরুণা। বলুন না?

আচার্য্য। তোমার মত সুন্দরীর কাছে আর কি প্রার্থনা কর্‌ব?

অরুণা। (সভয়ে) বলুন না?

আচার্য্য। প্রত্যহ এই সময়ে আসিয়া তোমার ঐ সুন্দর মুখের একটী চুম্বন আমাকে দিতে হবে; না দিলে আমি এ কাজ কর্‌তে পার্‌ব না, আর আমি হিঙ্গনাকে বলে দিব।

অরুণা বিপদে পড়িলেন। প্রার্থনায় সম্মতি না দিলে দুই দিকেই বিপদ, অগত্যা ভাবিলেন গোপনে নিত্য একটী চুম্বন মাত্র চাহিতেছে, তাহাতে দোষ কি? অবশেষে নত বদন হইয়া কহিলেন "দিব।" আচার্য্য সম্মতি পাইয়া সম্মোহে একটী স্থানে শত চুম্বন স্থাপন করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।

আর্য্যোন্নতি সভায়

নগর-কীর্ত্তন।

প্রতি বৎসর শীতকালে কলিকাতায় নানা প্রকার রংতামাসা, নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক ও বিবিধ ধরণের মহোৎসব হইয়া থাকে। পাঠক এবার এক নূতন ধরণের তামাসার কথা শুন। এ প্রকার অদ্ভুত আমোদজনক ব্যাপার বোধ হয় কেহ কখনও দেখ নাই। কার্ত্তিকী সংক্রান্তি-রাত্রি প্রভাত হইলে, পূর্ব্বদিক আরক্ত রাগে রঞ্জিত হইলে; এবং কাক, চিল, চটক প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ কোলাহল আরম্ভ করিলে একটী সুগম্ভীর ভোরঙ্গ রব শুনা গেল, পরক্ষণেই ঠনাস্‌ করিয়া পেটাঘড়ি বাজিয়া উঠিল, তৎপরেই ঝাঁঝরের ঝঞ্জন নিনাদ শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইল। এমন সময়ে এরূপ বাদ্য শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল; কি হইতেছে দেখিবার জন্য মনে অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। অমনি তাড়াতাড়ি একখানি র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বাটির বাহিরে আসিয়া দাড়াইলাম। দেখিলাম ট্যাঁকশালের সম্মুখে ছিপে খাটান কতকগুলি রাঙ্গা নিশান ফর্‌ ফর্‌ করিয়া উড়িতেছে। ভাবিলাম কাহাদের নগর-কীর্ত্তন বাহির হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে সংকীর্ত্তক সম্প্রদায় নিকটবর্ত্তী হইল। দেখিলাম

গায়কগণ সকলেই যুবাপুরুষ, তাহাদের অনেকেরই দাড়ি ও চক্ষে নানা রকমের চস্‌মা। এ কি, এত অল্প বয়সে এদের চাল্‌শে ধরিল কেন? আবার তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও চমৎকার, কাহার সহিত কাহারও মিল নাই, কেহ মোগলের, কেহ পাঠানের, কেহ কাফ্রীর, কেহ ফিরীঙ্গীর কেহ যীহুদীর, কেহ বা পাঞ্জাবীর বেশধারণ করিয়াছে, কেহ ধূতি, কেহ সাড়ী, কেহ ইজের, কেহ পেণ্টালুন যাহার যাহা মনে হইয়াছে সে সেই প্রকার পরিচ্ছদ পরিয়া মহোৎসবে যোগদান করিয়াছে। বস্তুতঃ বাউলের দলের পোষাক ও এ প্রকার বিচিত্র ও কৌতুকাবহ নহে।

দেখা দিল এক দল যুবক সুন্দর।
সুবেশ সুকেশ ধারী প্রফুল্ল অন্তর।
চশমা নয়নে কার, কার মুখে দাড়ী।
কার ফিরাঙ্গীর সাজ, কেহ পরে সাড়ী,
সবাই বাঙ্গালী কিন্তু বিভিন্ন পোষাক
দেখে শুনে যত লোক হইল অবাক।

কতকগুলি অজাতশ্মশ্রু বালক ডিউক্ অভ্ এডিন্‌বরার অধীনস্থ সেলারদের ন্যায় পোষাক পরিয়া এক এক গাছি লাঠী বুকের উপর উচ্চ করিয়া ধরিয়া পর পর দুই ছত্রে বিভক্ত হইয়া কীর্ত্তনকারীদিগের অগ্রে অগ্রে যাইতে ছিল। তাহাদের টুপীর সামনে রৌপ্যাক্ষরে "আর্য্য ফৌজ" লেখা ছিল। এই সম্প্রদায়ের অদ্ভুত পোষাক দেখিয়া একজন দর্শক জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ মহাশয় আপনাদের কিসের দল?" আর পোষাক পরিচ্ছদ এপ্রকার কেন? দলভুক্ত এক ব্যক্তি গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল, "ঐ নিশানে কি লেখা আছে দেখ, আমাদের "মটো" পড়িলেই সব বুঝিতে পারিবে।" তিনটি সবুজবর্ণের নিশানে স্বর্ণাক্ষরে তিনটি কথা লিখা ছিল। একটি "স্বাধীনতা" আর একটি "সমাজ বিপ্লব" ও অপরটি "নাস্তিকতা"। দলের লোক যে নিশানটি দেখাইয়াছিল সেটি স্বাধীনতা শব্দাঙ্কিত হাব্‌সীর ন্যায় পোষাকধারী খুব কাল মুষ্ক একজন জোয়ান পুরুষ সেই পতাকা ধারণ করিয়াছিল। প্রশ্নকারী লেখাটি পাঠ করিয়া বলিল, মহাশয় স্বাধীনতার সহিত পোষাক বৈষম্যের কি সম্বন্ধ আছে, বুঝিতে পারিলাম না। দলস্থ ব্যক্তি উত্তর করিলেন আপনি বোধহয় তবে স্বাধীনতা শব্দের অর্থ বুঝেন না। আমার যাহা ইচ্ছা হইবে আমি অবাধে ও নির্ভয়ে যদি তাহা করিতে পারি তবেই আমি স্বাধীন হইলাম, স্বাধীনতার এই প্রকৃত অর্থ। সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমরা যাহার যাহা ইচ্ছা সে সেইরূপ পোষাক পরিধান করিয়াছি। আমরা লোককে বুঝাইতে চাই যে স্বাধীন ভাবে আমরা সকল কার্য্য করিব—আমরা লোক নিন্দার ভয় করি না, অবমান ও প্রহারের ভয় রাখিনা ও বাগদ্বন্দ্ব করিতে প্রস্তুত আছি। যে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারে, বা করে সেই স্বাধীন এবং যে স্বাধীন সেই সুখী। সুখী হইতে হইলে অগ্রে স্বাধীন হওয়া চাই। পরাধীনের সুখ কখন সম্ভবে না। সেই ব্যক্তির ব্যাখ্যা শুনিয়া আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। প্রকাশ্যে কিছু বলিতে সাহস হইল না, মনে মনে বলিলাম তবে পশু সমাজে গিয়া বাস কর, তোমাদের স্বাধীনতা, যথেচ্ছাচারিতা বা পাশব-স্বাধীনতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সংকীর্ত্তকগণ মহোল্লাসে ও মহোৎসাহে নৃত্য ও গান করিতে করিতে ক্রমে জগন্নাথের

ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘাড়ছাটা সিথিকাটা সাহেবি ধরণের দাড়ি কামান প্রজাপতির ন্যায় পোষাকধারী এক যুবা—যিনি "সমাজ বিপ্লব" পতাকা বহন করিতে ছিলেন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "বল জয় বঙ্গবামার জয়, জয় স্ত্রী স্বাধীনতার জয়" অমনি দলস্থ সকলে যুগপৎ তারস্বরে বলিয়া উঠিল "জয় বঙ্গবামার জয়, জয় স্ত্রী স্বাধীনতার জয়।" প্রাতঃস্নানকারিণী ভদ্র গৃহস্থ কুলকামিনীগণ সেই চিৎকার শব্দে চমকিয়া উঠিল ও ঘাটের উপর একদলপুরুষ দেখিয়া ত্রস্তভাবে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ কেহ স্নান সমাপ্ত না হইলেও উঠিয়া একপার্শ্ব দিয়া প্রস্থান করিল। অতঃপর সমাজ-বিপ্লব-পতাকাধারী গঙ্গাবাসী এক পাণ্ডার একটা বাক্সের উপর উঠিয়া পতাকাটী উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিল এবং কীর্ত্তনকারীগণ এই গীতটি গান করিতে লাগিল—

সতী হ'তে বঙ্গবামা কেন এত বাসনা?
পতিসেবা দাস্যবৃত্তি জীবনে বিড়ম্বনা।
স্বামী ধরে কেন থাক?
কেন স্বামী বলে ডাক?
তুমি দাসী,তিনি স্বামী এ যে বড় লাঞ্ছনা!
কেহ কারি নহে স্বামী
তুল্য মূল্য তুমি আমি
নর-নারী ভেদ জ্ঞান, কুটিলের কল্পনা।
অতএব বামাগণ
হয়ে সবে এক মন
আমাদের সঙ্গে চল, হবে সবে স্বাধীনা।

গীত সমাপ্ত হইলে সকলে মিলিয়া চীৎকার করিয়া বলিল "জয় স্বাধীনতার জয়" "জয় স্বাধীন প্রেমের জয়" আমরা পূর্ব্বে যে অজাতশ্মশ্রু আর্য্য-ফৌজের উল্লেখ করিয়াছি, সেই তরুণ সৈনিকগণ পুনর্ব্বার ছড়ি কাঁধে করিয়া সারি দিয়া দাড়াইল এবং হাবসী বেশধারী বীরপুরুষ তাহাদের সাম্‌নে আসিয়া স্বাধীনতা পতাকা উচ্চ করিয়া বলিল:—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?"

সৈনিকগণ খালাসীদিগের কাছিটানা সুরে বলিয়া উঠিল—

"আজ্ বলা হেল্লেসা, হেল্লেসা, হেল্লেসা"

পতাকাধারী।—

"দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?"

সৈনিকগণ।—

"আজ্ বলা হেল্লেসা, হেল্লেসা, হেল্লেসা"

পতাকাধারী।—

"কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়।"

সৈনিকগণ।—

"আজ্ বলা হেল্লেসা, হেল্লেসা, হেল্লেসা।"

পতাকাধারী।—

"দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে
স্বর্গ সুখ তায়।"

সৈনিকগণ।—

"আজ্ বলা হেল্লেসা, হেল্লেসা, হেল্লেসা।"

পতাকাধারী।—

হাঁ বঙ্গমহিলাগণ হাঁ, ইহা সত্য কথা, এক দিনের স্বাধীনতায়ও স্বর্গ সুখ পাওয়া যায়। আহা স্বাধীনতা কি সুখের সমগ্রী! কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে তোমরা সে সুখে বঞ্চিত, সেই স্বাধীনতারূপ অমৃত তোমরা একদিনের তরেও আস্বাদন করিতে পারিলে না। হাঁ বঙ্গবামাগণ হাঁ, স্বাধীনতায় যে কি সুখ তাহা তোমরা একদিনের জন্য

ও জানিলে না। কেন তোমরা চিরদিন পরাধীনা হইয়া থাক? কেন তোমরা পুরুষের অধীনতা স্বীকার কর? কেন তোমরা পতির দাসী হইয়া থাক? কিসের জন্য? অন্নবস্ত্রের জন্য? কেন তোমরা কি উপার্জ্জনে অক্ষম? কেন, তোমাদের কি হাত, পা, নাক, চোক নাই? তোমরা কি খাটিয়া খাইতে পার না? যথার্থইকি তোমাদের শরীরে বল শক্তি নাই? কে বলে তোমরা অবলা? একথা যে বলে সে তোমাদের পরম শত্রু, সে মূর্খ। তোমরা এখন লেখা পড়া শিখিয়াছ, যদি আমাদের দর্শনশাস্ত্র দেখ, আমাদের আর্য্য সভার সম্পাদক মহাশয় কি লিখিয়াছেন যদি পড়, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে তোমরা কখনই পুরুষ হইতে হীন বল নহ। তোমাদের ভর্ত্তৃগণ, সেই স্বার্থপর বাঙ্গালিগণ তোমাদিগকে চিরদিন দাসী করিয়া রাখিবে বলিয়াই তোমাদিগকে হীনাবস্থায় ও হীনবল করিয়া রাখিয়াছে। আর কতদিন তোমরা সেই স্বামীর কঠিন শাসনে থাকিবে? কেন তোমরা চিরদিন দাস্যবৃত্তি করিবে? তোমাদের হৃদয়ে কি একটু তেজ নাই? মনে কি একটু অহঙ্কার নাই? আইস স্বাধীন হইবার চেষ্টা কর দুই পদ অগ্রসর হও, আমাদের সহিত যোগ দাও, আমরা তোমাদের পরাধীনতা বিমোচন করিব। তোমাদের সকল দুঃখ ও সকল যন্ত্রণার শেষ করিব তোমরা স্বর্গসুখ লাভ করিবে।

ক্রমশঃ

শোকোচ্ছ্বাস।

১

হৃদয়ের দূরে—অতি দূরে
ছিল শোক ঘুমাইয়া,
কে দিল রে জাগাইয়া?—কাল!
ঘুমন্ত শোকেরে কাল কেন জাগাইল?
হৃদয়ের মর্ম্মে কাল ব[illegible] নিক্ষেপিল—
প্রাণ আঘাত পাইল,
শোক তাই রে জাগিল।
মর্ম্মাহত হৃদয়ের দাঁড়ায়ে একটি ধারে
মর্ম্মাহত প্রাণে
কাঁদিয়া উঠিল শোক ঝর ঝর অশ্রুধারে
চেয়ে শূন্য পানে।
হাহাকার—কোলাহল
পূরিয়াছে শূন্যতল,
অসংখ্য চোখের জল
ধায় প্রস্রবনে;
অনন্ত বিষাদ রেখা
ফুটে ফুটে দেয় দেখা
নয়নের অশ্রুশাখা
অসংখ্য বদনে।
শূন্যতার আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করি'—
কি এক বিলাপ-রব ফুকরি' ফুকরি,'
বহু কণ্ঠে উথলিয়া
গড়াইয়া গড়াইয়া
মিশি'ছে বাতাসে,
শুনিয়া কাঁদিল শোক লুটিয়া হতাশে।

২

কি বলে বিলাপ রব?-"হা কেশব!-হা কেশব!
প্রকৃতির প্রিয়তম প্রাণের কুমার
উজ্জ্বল আলোকে ঢালি' গভীর আঁধার
লুকা'লে কোথায়?
জননী প্রকৃতি-কোলে
বসিয়া ভাবের ভোলে,
প্রাণের কপাট খুলে,
আনন্দে দু'হাত তুলে,
'হরি নাম' মহালোকে
আলোকি' ধরায়,
আপনি লুকা'লে ঘোর আঁধার ছায়ায়!
আধার আধার দিয়া
কোথা গেলে পাসরিয়া
আঁধার-আচ্ছন্ন প্রাণ পাতকি নিকরে?
কে ঢালিবে 'হরি নাম' শ্রবণ ভিতরে?

৩

পৃথিবীর পাপী হ'তে, আরো কোন খানে
হেরিলে কি মহাপাপী,
হ'য়ে তাই পরিতাপী
ছাড়িলে এ পাপ ধরা, মুকুলিত প্রাণে?
এসব পাপীরে ফেলে, সে সবে তারিতে গেলে,
কে তারে এখানে?
তোমারে হারা'য়ে আজ
কি ভিক্ষু, কি মহারাজ,
হাহাকারে কাঁদে, প্রাণ মিলাইয়া প্রাণে,
বহু প্রাণ এক আজ তোমার ধেয়ানে।

৪

"হা কেশব! হা কেশব!"
এই হাহাকার রব
ঘরে ঘরে ওঠে;
বুকের ভিতর দিয়া
কিএক যাতনা গিয়া
প্রাণে বড় ফোটে!
"হা কেশব! হা কেশব!"
এ রবে স্তম্ভিত সব
একটী কেশবে যেন সকলই ছিল—
একটি কেশব গিয়া
সবি ফুরাইল।
কি হিন্দু, কি মুসলমান,
কি য়ীহুদি, খৃষ্টীয়ান্,
কি বা ব্রাহ্ম, কি বা বৌদ্ধ—
যে যেখানে ছিল—
যে জানিত—কে কেশব, সেই হারাইল।
হারাইয়া কেশবেরে, হারাইল আপনারে
পাপিময়ী ধরা,
পাপ যাইবার মুখে, আবার চাপিল বুকে
পাতকের ভরা।
কে শুনা'বে 'হরিনাম?'—ধরণী কাতরা!

৫

পাতকের অন্ধকারে পুণ্যের তপন সম
উদিত হইয়া জীব-হৃদয়-আকাশে
কাল রূপ মেঘ গ্রাসে সহসা গ্রাসিত হ'লে
মাটীতে মিশিল দেহ, জীবন বাতাসে।
কে বলে মাটীর তুমি? জীবন বাতাস তব?
নহ তুমি ইহলোকে সামান্য মানব;
পৃথিবীর বহু কোটি মানব মণ্ডলী-মাঝে
নাহি মিলে তব সম একটি কেশব।
আধ্যাত্মিক ভাবে ভরা, পরমেশে প্রাণে ধরা
"হরি নামে' পাপ ধরা নিষ্পাপ করিতে
ক' জন হেথায় আসে সহস্র কোটিতে?
হেন জনে হারাইয়া, পৃথিবী, পৃথিবীবাসী
কি না হারাইল?
এই বড় মনস্তাপ, বাড়িল কলির দাপ,
ধর্ম্ম ফুরাইল।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়

সামুএল হানিমান।

হানিমানের উদারতারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তর্ক করিতে বসিলে তিনি প্রায় সকল কথাই খুলিয়া বলিতেন। এই সুযোগে কোন কোন নীচপ্রকৃতির লোক তদুদ্ভাবিত অনেক বিষয় বাহির করিয়া লইয়া আপনার বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। জগতের সর্ব্ব বিষয়েই প্রতারণা হইয়া থাকে এবং সর্ব্ববিভাগেই প্রতারক আছে। হানিমানের স্বদেশানুরাগ মধ্যম রাশির ছিল। আমরা ক্ষুদ্রাশয় বঙ্গবাসী, আমাদিগের চক্ষে তাহা একশেষ বলিয়া বোধ হইতে পারে। যাঁহাদের জন্মভূমির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, যাঁহাদের স্বদেশ অর্থে শয়নমন্দির--স্বদেশীয় শুদ্ধ পুত্রকন্যাদি, এবং তাহাও আবশ্যকমত, সর্ব্বসময়ে নহে—স্বদেশানুরাগ আর্ত্তনাদ মাত্র; যাঁহাদের রাজা লক্ষণ সেন, অমাত্য গৃহলক্ষ্মী, সেনাপতি ভট্টাচার্য্যমহাশয়; যাঁহাদের বল ক্রন্দন, সাহস চক্ষুনিমীলন, বিক্রম বচন, আশা দিনান্তে এক মুষ্টি অন্ন ভোজন, ভরসা শ্রীমধুসূদন; যাঁহাদের শিরস্ত্রাণ দীর্ঘশিখা, কবচ নামাবলি, অস্ত্র পাদার্ঘ; তাঁহারা যথার্থ স্বদেশানুরাগের মর্ম্ম কি বুঝিবেন?—তাঁহাদের মুখে এ উচ্চ কথা বিড়ম্বনা বিশেষ। বঙ্গভূমিকে আমুক্তকণ্ঠে মাতৃভূমি বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন এমন মহানুভব আমাদিগের মধ্যে কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ইতিহাস দেখ, বন্যপশুবৎ মনুষ্যের মুখেও একথা শোভা পায়; কিন্তু সভ্যতাভিমানী, বিদ্যাভিমানী, ধনাভিমানী, জাত্যাভিমানী বঙ্গবাসী সিংহাসনে বসিলেও [illegible] মুখে একথা কখনও শোভা পায় নাই, বোধ হয়, পাইবেও না। হানিমানের যে মাত্রায় স্বদেশানুরাগ ছিল, তাহা কোন মতেই অসাধারণ বলিতে পারা যায় না। রজনীর তিমিরাঙ্কে তারাবলির গৌরব সমধিক; কিন্তু দিবালোকে তাহাদিগের প্রকাশেরও শক্তি নাই। ঘোরতিমিরাবৃত অসভ্য পরাধীন দেশে হানিমানকে এপক্ষে একটী জ্যোতিষ্ক বলিলেও বলা যায়; কিন্তু সভ্যতানিমজ্জিত, স্বাধীনতা-প্রদীপ্ত ইউরোপে তাঁহার গৌরব অতি সামান্য। হানিমান হানিমান বলিয়াই তদীয় জীবনীতে একথার উল্লেখ মাত্রও আছে, অন্যের হইলে কেহ কটাক্ষও করিত না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, যখন জন্মভূমি তাঁহাকে ত্যজ্যপুত্র করিয়াছিল, যখন স্বজাতীয়গণ সংসার হইতে তাঁহার অস্তিত্ব লোপ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, তখনও তিনি সেই জন্মভূমির সেবা ও দেশীয়দিগের হিতসাধন করিতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। কেহ জন্মভূমির নাম উল্লেখ করিলে তাঁহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত এবং তাহার গুণকীর্ত্তনে তিনি গদ্গদ্ হইয়া পড়িতেন। এরূপ হৃদয়ভাব তাঁহার প্রতি কথায় ও কার্য্যে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। দুর্নিবার দারিদ্র্যদুঃখে পড়িয়াও তিনি এক দিনের জন্যও স্বদেশের মমতা ছাড়িতে পারেন নাই। জন্মভূমিতে যাঁহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, নিজ গৃহ বলিতে পারেন এমন কোন নিদর্শন নাই, একদিনের দাঁড়াইবার স্থান নাই, ক্ষণকালের সুখও নাই, দেশীয় আবাল-বৃদ্ধ বনিতা যাঁহার শত্রু, তাঁহার মুখে সতত স্বদেশের ও স্বজাতীয়গণের কথা শুনিতে পাওয়া বড় সহজ নহে।

আমাদিগের পক্ষে ইহা কবির কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু স্বাধীন দেশে স্বাধীন চিত্তে ইহা সচরাচর লক্ষিত হইয়া থাকে—ইহা অবশ্যম্ভাবী। হৃদয়ের এপ্রকার উচ্চভাব না হইলে স্বাধীনতারূপ স্বর্গসুখ কে কোথায় পাইয়া থাকে? যে হৃদয়ে ইহার অভাব সে হৃদয় স্বাধীনতার উপযুক্ত উপাদান নহে—তাহা মনুষ্য নামের কলঙ্ক-মাত্র। সেদিন ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ার যুদ্ধের সময় একজন সামান্য দীনদরিদ্র নাবিক কলিকাতায় কোন বিচারপতির নিকট এই বলিয়া আবেদন করে, যে তাহার স্বদেশে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহাকে তাহার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অবসর দিতে ইচ্ছুক নহে; অতএব তাহাকে এ বিপদকালে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক অব্যাহতি দেওয়া অনুমতি হয়। বিচারপতির কথায় সেব্যক্তি উত্তর করিয়াছিল যে স্বদেশে তাহার আত্মবন্ধু কেহই নাই, এবং কবে যে সে জন্মভূমি দেখিয়াছে, তাহাও তাহার বিশেষ স্মরণ নাই। পাঠক, লক্ষণ সেনের সিংহাসনে ইহাকে কেমন দেখায়! বর্ব্বরের পুচ্ছ বা সভ্যতার মুকুট ইহার মস্তকে পরাইলে কি তোমার মনের তৃপ্তি বোধ হইতে পারে?

ধৈর্য্যগুণ হানিমানের অস্থিমজ্জাগত ছিল, বলিতে হইবে। যখন নিয়ত মহাকষ্টে দিনপাত করিতেছেন তখনও কোন কথা কাহাকে ফুটিয়া বলেন নাই। অনাহারী—জঠর জ্বালায় কাতর, তখনও কেহ কোন কথা জানিতে পারে নাই। তিনি আত্মগোপনে ভয়ানক তৎপর ছিলেন; বরং কেহ কোন কথা জানিতে পারিলে তিনি অপ্রতিভ হইতেন; যেন অন্যের চুরিকরা ধন লুকাইতে গিয়া ধরা পড়িয়াছেন। জীবন-মধ্যে এক দিনের জন্যও কখন কাহার সহায়তা প্রার্থনা করেন নাই। সংসার-তাড়নায় ... তাড়নে একবার বহির্জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখিতেন, মনোমত কাহাকেও খুঁজিয়া না পাইয়া আবার অন্তর্জগতের অন্তস্থল অবধি আলোড়িত করিতেন, এবং পরিশেষে কোন উপায় না দেখিতে পাইয়া "ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা" বলিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। ধৈর্য্য, প্রতিভার একটী প্রধান লক্ষণ। হানিমানের বিজ্ঞানালোচনায় তাহা বিধিমত পুষ্ট হইয়াছিল। বিজ্ঞানুশীলনে ঔদার্য্যগুণও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। হানিমানের অর্জ্জনস্পৃহা আত্মাদর, আত্মনিষ্ঠা, আত্মগৌরব, উপচিকীর্ষা মধ্যমরাশির ছিল। দৃঢ়তা, আশা, অনুকরণ-শক্তি উচ্চ মাত্রার ছিল। বিস্ময় (Marvellousness) ভাবশক্তি (Ideality) প্রভৃতিও সামান্য প্রকার ছিল; কবি ও চিত্রকর মাত্রেরই এ দুইটী উচ্চদরের দেখা যায়। হোমিওপেথী মতে হানিমানের চরিত্রের অনেকটা আভাস আছে। ধর্ম্মশীল, মিতব্যয়ী, মিতাচারী, এবং ধৈর্য্যশীল বলিয়া হানিমান খ্যাত।

এমন জলন্ত প্রতিভাতেও হানিমানের বিশাল মস্তিষ্কের সকল প্রদেশ আলোকিত করিতে পারে নাই। দুই একটী কক্ষ অন্ধকারময় ছিল। তিনি আদৌ প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারিতেন না। অনেক দিন নিভৃতে আবদ্ধ থাকিলে অবশ্য চিত্ত-প্রফুল্লতার বিশেষ হানি হইতে পারে, এবং হৃদয়ও সঙ্কুচিত হইবার সম্ভাবনা। আবদ্ধ জল শীঘ্রই কলুষিত হইয়া পড়ে; সঞ্চরণশীল স্রোতের মত তাহার আর সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও স্বাস্থ্য করত থাকে না। যেখানে গুণের পুরস্কার নাই, সত্যের পীড়ন, সত্যের নির্ব্বাসন, সে

লোকালয়ের সংস্রব রাখিবেন না; আজ তিনি আপনি আপনার বন্দী! সুতরাং ক্রমাগত নির্জ্জনে বাস করিয়া, নিজ মনে থাকিয়া, নিভৃতের নিরালোকে হানিমানের চিত্ত কটু হইয়া উঠিয়াছিল, এবং নিয়ত চিত্ত মুকুরে নিজমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া আত্মছায়ায় তাহা সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। যেখানে আত্মজ্ঞান এত প্রবল, সেখানে আত্মাভিমান প্রবল না হইবে কেন? তাহাতে আবার দিবারাত্র জ্বালা যন্ত্রণা ও মনস্তাপে তাঁহার সংসারে এক প্রকার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াগিয়াছিল,—জগত দুঃখের আকর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। পীড়নের উপর পীড়ন, অত্যাচারের উপর অত্যাচার, আঘাতের উপর আঘাত, শত্রুর উপর শত্রু, সুতরাং মনুষ্যের কালিম মূর্ত্তিই সতত তাঁহার মনে জাগরুক ছিল। এ সকল কারণে মনের সাম্যভাব থাকা কঠিন। মুখে সতত চড়া কথা—ভঙ্গিতে চড়াভাব দেখা যাইত, চিত্ত নিয়তই উচ্চমাত্রায় চড়িয়া থাকিত;—তাহার স্থিতিস্থাপক গুণ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল—কোমল প্রকৃতি আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। হানিমানের এইহেতু প্রযুক্ত তিলার্দ্ধে প্রতিবাদ সহ্য হইত না। কোন সামান্য বিষয়ে কেহ তাঁহার প্রতিবাদ করিলে, তিনি তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিতেন। ন্যায়পরায়ণতা যাহাকে বলে এবং যে সকল গুণ থাকিলে হয়, নির্য্যতন প্রভৃতিতে পড়িয়া তিনি সে সমুদায়ই হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন বলিতে হইবে। অভিবাদকগণ হানিমানের সকল দোষই ভিষকৃদিগের উপর আরোপ করিয়া থাকেন। অবশ্য মনুষ্য অবস্থার দাস; অবস্থানুসারে তাহার প্রকৃতির গঠন হইয়া থাকে; এমন কি, আমরা মনুষ্যকে অবস্থাপ্রসূত বলিতেও সাহস পাই; কিন্তু তাহা বলিয়া গুণের সময় হানিমান এবং দোষের সময় ভিষক্ সম্প্রদায়, এ বিচার যুক্তিসঙ্গত নহে। কৈ, সক্রেটিস, ব্রুনো, বেকন, গালিলিও টমাস্ পেন, গাঁবেতা প্রভৃতির ইহাপেক্ষা শতগুণ অধিক নির্য্যাতনেও মনের সেরূপ ভাব উপস্থিত হয় নাই। এপক্ষে হানিমানের মন দুর্ব্বল বলিতে হইবে; অত্যাচারে তিনি স্বীয় প্রকৃতি হারাইয়া বসিয়াছিলেন। শারীরিক দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত যেমন সময়ে সময়ে সকল কথাতেই বিরক্তি বোধ হয়; সেইরূপ চিত্তের কোন প্রকার দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত সামান্য প্রতিবাদে মন ঝাঁজিয়া উঠে। হানিমানের সেই প্রকার মানসিক ভাব ক্রমশঃ এতদূর গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল যে তজ্জন্য তিনি উত্তরকালে অনেক গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। যে হোমিওপেথী সভা সংস্থাপনের জন্য তিনি এক সময়ে প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন, শুদ্ধ কয়েকজন সভ্যের সামান্য মতভেদ প্রযুক্ত সময়ান্তরে সেই সভা ভঙ্গ করিতেও তিনি কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি কথায় কথায় বলিতেন, "যে আমার সহিত একরেখায় না চলে, কেশাগ্রেও এদিক ওদিক হউক না কেন, সে বিমতি ও বিশ্বাসঘাতক, তাহার সহিত আমার আর কোন সম্পর্কই নাই"। তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য ডাক্তার গ্রোস পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া একদা তাঁহাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য যতদূর সাধ্য সদৃশমতে চিকিৎসা করা হইয়াছে, কিছুই ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু কোন প্রকারেই রোগের শান্তি হইল না। বোধ হয়, সদৃশমত সকল রোগের পক্ষে প্রশস্ত নহে। শোকসন্তপ্ত জনকের হতাশ বাক্যে হানিমান এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে তদবধি

তিনি আর ক্রোসের মুখাবোলকন করেন নাই। লিপজিকের হাসপাতালে প্রথমতঃ ডাক্তার মুলর অবৈতনিক চিকিৎসক ছিলেন। একদা কোন বিষয় প্রতিবাদ করায় হানিমানের বিষ-নেত্রে পড়িলেন। হানিমান মুলরের স্বাধীনমতে এতদূর ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন যে অকাতরে তাঁহাকে বিনাদোষে পদচ্যুত করিলেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে বেতন দিয়া অপর একজন নিতান্ত দুশ্চরিত্র লোককে তৎপদে নিযুক্ত করিতে সংকুচিত হইলেন না। দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থলোভে হানিমানের স্তবস্তুতি করিত, এবং তাঁহার ভ্রমপ্রমাদাদিও শিরোধার্য্য করিয়া মানিত কিন্তু আন্তরিক ভক্তি স্বতন্ত্র। এই পোষ্যপুত্রই হানিমানকে সময়ান্তরে সমুচিত কৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছিল। হানিমান সদৃশ স্বাধীনপ্রবৃত্তির লোকের স্বাধীনতা বা স্বাধীনচিন্তার চক্ষুঃশূল হওয়া আশ্চর্য্যের কথা। মনুষ্য চরিত্রের সময়ে সময়ে এপ্রকার অনেক বিসদৃশ ভাব দেখা যায়। উহার কারণ নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। "The centrohetence augments the centrefugnce" যিনি ভয়ানক বিগ্রহদ্বেষী তিনি স্বয়ই ভয়ঙ্কর পৌত্তলিক। গিজনীর অধীশ্বর মামুদ ইহার সাক্ষ্যস্থল। রাজদ্রোহ যাঁহার অস্থিমজ্জাগত তিনিই আবার সিংহাসনের জন্য লালায়িত। নেপোলিয়ন, ক্রমওয়েল ইহার জলন্ত প্রমাণ। ন্যায়পর রামের বালিবধ, সত্যপুত্র যুধিষ্ঠিরের "ইতগজ", বদান্য বেকনের অর্থলোভ—বিসদৃশ ভাব বই আর কি বলিব? কটুভাষী মেকলের প্রসিদ্ধ সন্দর্ভ পড়িলে কোন বঙ্গবাসীর না ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া যায়? কিন্তু তাঁহার কার্য্যে সদাশয়তা জাজল্যমান রহিয়াছে। যাঁহার চক্ষে অস্মদ্দেশীয় কিছুই ভাল লাগে নাই, এমন কি দেবতা বাঞ্ছিত আত্রফলও অতি জঘন্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, আজ রাগান্ধ হইয়া যিনি যাহা বলুন, এবিশাল ভারতরাজ্যের যেদিকে নয়ন ফিরাই, আমাদের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বল, বিশ্ববিদ্যালয় বল, উচ্চ কর্ম্ম বল, মান বল, মর্য্যাদা বল, ইংরাজাধিকারে আমাদের যে কিছু সুখ আছে, তাহার অর্দ্ধেক সেই দুর্ম্মুখ মেকলের সদাশয়তার ফল মাত্র। মধুমুখ সর্ বর্টল ফ্রেরিয়ার দ্বারা তাহার এক বর্ণও হয় নাই। কল্পনার কুহকে ভুলিয়া, উপমার পারিপাট্যে অন্ধ হইয়া, ভাষার লালিত্য, চাকচিক্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, জ্যোতি, তেজ ও ঝঙ্কার প্রভৃতিতে বিমুগ্ধ হইয়া যে মেকলে সাহিত্যসাগরে একবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া প্রতিনিয়ত শব্দের উত্তাল তরঙ্গে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার সত্যপ্রিয়তা, ন্যায়নিষ্ঠা, ও ধর্ম্মপরায়ণতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

হানিমানের চরিত্র বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে আত্মাভিমান, প্রাগল্ভ, ক্রোধ, মতভেদকাতরতা (intolerance) প্রভৃতি অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়। এবম্প্রকার চিত্তবিকার বশতঃ তাঁহার মনে অনেকগুলি ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। তখন ভাবেন নাই যে সত্য উপরোধসাপেক্ষ নহে। যাঁহারা তাঁহার প্রতি কথায় সায় দিতেন, হানিমান এইরূপ লোকদ্বারা সতত বেষ্টিত থাকিতেন, এবং থাকিতে ভালও বাসিতেন। যথার্থ স্বাধীনপ্রকৃতির লোকের সহিত বসবাস করিলে বাদানুবাদে সদৃশমত তদীয় জীবিতাবস্থাতেই অনেক পরিমাণে পরিষ্কার হইয়া যাইত, এবং এতাধিক ভ্রমপ্রমাদাদি তাঁহার

সহিত সমাধিমধ্যে যাইত না। আত্মজ্ঞানে যাঁহার ধ্রুবজ্ঞন, তাঁহার যতদূর সত্যে দৃষ্টি সম্ভব ততদূর সত্যপ্রিয়তা সম্ভব নহে। সত্যনিষ্ঠ প্লেটো তর্কে পরাজয় হইতে বড় ভালবাসিতে· তিনি আত্মগৌরব জানিতেন না—সত্যের গৌরবই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সেই জন্য প্লেটো মনুষ্য-জগতের একটী চিরপ্রভ সূর্য্য। ইউরোপীয় ভুবনে দৃষ্টিপাত করিলে সকলই প্লেটোময় দেখা যায়; সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মনীতি, সভ্যতা প্রভৃতি যাহাতে বল অপরিমেয় প্রতিভা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। যদি সেই হানিমান কথঞ্চিৎ সেই ইউরোপীয় ব্যাসদেবের ন্যায় সত্য প্রিয় হইতেন, তাহা হইলে তিনি হোমিওপেথীর আর শতগুণে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। যিনি এতাদৃশ মতভেদকাতর এবং স্বাধীনচিন্তা-বিদ্বেষী, তিনি যে স্বয়ং স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন, এবিষয়ে লোকের সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কথায় বলে যিনি তোষামোদ ভাল বাসেন, তিনি তোষামোদ করিতেও পারেন। ডজ্জন প্রভৃতি এবিষয় ঢাকিয়া লইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু কথার পরিপাট্যে বা অলঙ্কারের চাকচিক্য দোষ কথনই পূজ্য হইতে পারে না। তাঁহাদের মতে এপ্রকার মনের ভাব কঠোর বিদ্যানুশীলন, নিরালয়-বাস, দিবানিশি চাটূক্তি শ্রবণ, লোকের উৎপীড়ন ও প্রতারণা প্রভৃতির ফলমাত্র। আমরা বলিয়াছি যে বেকনের অদৃষ্টে এসকল শতগুণ অধিক ঘটিয়াছিল; কৈ? তাঁহার তো কথন এপ্রকার মনের ভাব জন্মে নাই। শেষদশায় ভয়ঙ্কর অহমিকা, মোহ ও দম্ভ প্রভৃতিতে হানিমানের চিত্ত সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল।

হানিমান প্রথম হইতেই অ[illegible]ানে ঔষধ পরীক্ষা আরম্ভ করেন। নিতান্ত সূক্ষ্ম· মাত্রায় এবং অধিক সময় ব্যবধানে পরীক্ষ্যমান ঔষধ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশেষতঃ এলোপেথীর বিষাক্ত ঔষধগুলি অতীব সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মাত্রায় সেবন করিতে বা করাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ পরীক্ষ্যমান ঔষধ কত সূক্ষ্ম মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে তাহা সটীক জানিবার জন্য তিনি কঠিন দ্রব্য দুগ্ধ শর্করায় (Sugar of milk) ও তরল পদার্থ সুরাসারে (Alcohol) কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকরণে মিশাইতে লাগিলেন। এইরূপে ঔষধের ক্রম বাহির হইল। হানিমানের মতে ঔষধের সূক্ষ্মতায় গুণের হ্রাস হয় না, বরং অনেক সময়ে তদ্দ্বারা আবরিত গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু একথার প্রমাণ পরীক্ষা। কত সূক্ষ্মমাত্রায় যে ঔষধের কতদূর রোগ-নিরাকরণ-শক্তি প্রস্ফুটিত হয়, তাহা তর্কে সিদ্ধান্ত হইবার নহে; তাহার প্রমাণ উপর্য্যুপরি পরীক্ষা ও দর্শন। কিন্তু আধুনিক সদৃশ মতাবলম্বী চিকিৎসকেরা অনেকে নিতান্ত সূক্ষ্মমাত্রা যথা ৯ ৯ ৯ ক্রম ইত্যাদি ব্যবহার এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছেন; প্রায়ই ত্রিংশৎ ক্রমের উপর যাইতে চাহেন না। এক্ষণে উহা পরীক্ষা পক্ষে কতদূর প্রমাণ্য বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন হানিমান বৈরনির্য্যাতন কল্পনায় এতাদৃশ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মাত্রায় উঠিয়াছিলেন। ভিষকৃদিগের অত্যাচারে তিনি যতই প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন ততই তাঁহাকে উচ্চক্রমে উঠিতে দেখা গিয়াছিল। এমন কি, পরিশেষে একবারে সূক্ষ্মের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ঔষধব্যবসায়ীদিগের প্রথম অত্যাচার আরম্ভ হয়; ইতিপূর্ব্বে হানিমান মোটা মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করি-

তেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে তাঁহার উচ্চক্রম প্রথম দেখা গেল, তাহাও রোগ বিশেষে মাত্র। পরে ভিষক্ দিগের উৎপীড়ন যতই বাড়িল, তিনিও ততই ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন। শেষে ঔষধ সেবন একবারে ঘুচিয়া গেল। রোগীকে একটী উচ্চ ক্রমের ক্ষুদ্র বটীকা আঘ্রাণ করাইলেই যথেষ্ট হইত। তিনি বলেন "ঔষধ আঘ্রাণে সেবনাপেক্ষা অধিক ফলদায়ক সুতরাং ঔষধব্যবসায়ীর আর আবশ্যক নাই"। অবশ্য ইহা এক প্রকার বৈরনির্য্যাতনের কল্পনা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? যাহাদের এত অত্যাচার, যাহাদের জন্য এত বিপত্তি, রাজবিধি যাহাদের সহায়, নিজ প্রতিভার অনুসরণ ব্যতীত তাহাদের নষ্ট করিবার উপায়ান্তর নাই। হানিমান অহর্নিশি সেই কল্পনায় মগ্ন থাকিলেন, এবং অচিরাৎ কল্পনা প্রসূত পথও দেখিতে পাইলেন। আবার যখন পারী নগরীতে উপস্থিত, ভিষক্‌দিগের অত্যাচার নাই, সুতরাং তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়েরও আবশ্যক নাই, তখন তিনি পুনশ্চ মোটা মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৈরনির্য্যাতনই যে হানিম্যানের এপ্রক্রিয়ার প্রতিকারণ ইহা আমরা সম্পূর্ণ স্বীকার করি না। ফলে আপাততঃ দেখিতে কতকটা সেই রূপই বটে। ইহা কাকতালীয়ের মতও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জর্ম্মণি কথায় বলে চাতকপক্ষী নীচে আসিলে বৃষ্টি হয়, কিন্তু ফলে বৃষ্টিতে উহাতে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই। আমরা এবিষয় অবসর মত আলোচনা করিব। আপাততঃ এই অবধি স্থিরীকৃত হইল যে, যে সময় হানিমান ভিষক্‌গণদ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, সেই সময়ই তাঁহার উচ্চ ক্রম ব্যবহার আরম্ভ হয়, এবং তিনি অন্ততঃ একবারও কথায় কথায় তাহাদিগের নামোল্লেখ করিয়াও বৈরনির্য্যা[illegible]ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কেহ বলেন হানিমান ভিষক্‌গণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হওয়ায় হোমিওপেথীর অনেক মঙ্গল ঘটিয়াছে। হোমিওপেথীর অমিশ্র ঔষধপ্রকরণ, সূক্ষ্মমাত্রা, আশু প্রচার প্রভৃতি তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। শত্রুগণ এপক্ষে জগতের বিহিত হিত সাধন করিয়াছে। কিন্তু প্রতিকূলাচার প্রতিকূল ব্যতীত অনুকূল হইতে পারে না। প্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধকই হইবে। জলের স্রোত অবরোধ করিলে তাহার বেগ হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি হইবে না। আমরা সত্যের উন্নতির জন্য উৎপীড়ন ব্যবস্থা করি না। তবে পূর্ব্বসংস্কার কুসংস্কার, প্রভৃতিতে সমাজকে এরূপ জড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে, যে কোন নূতন সংস্কার সহজে হইবার পথ নাই; নূতন মত বা সত্যকে উৎপীড়ন সহ্য করিতেই হইবে—এড়াইবার উপায় নাই। তবে যিনি জগতের অজ্ঞানতিমির মোচন করেন, এবং নিয়ত মানুষমঙ্গলে ব্যাপৃত, তাঁহার প্রতি অত্যাচার করা অবশ্য কৃতজ্ঞতার কর্ম্ম নহে। অনেকে বলেন পীড়নে সত্যের উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকে; অত্যাচারে সত্যের অনিষ্ট হইতে পারে না; আমরা তাঁহাদিগের কথায় একদিনের জন্যও সায় দিতে পারিলাম না। আমাদের মতে উৎপীড়নে সত্যের অনেক হানি হইয়া থাকে, এমন কি, তদ্দ্বারা সত্য সময়ে সময়ে বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়। *

* But, indeed, the dictum that truth always triumphs over persecution, is one of those pleasant falsehoods which men repeat after one

গ্রীকশাস্ত্রে প্রতিভার একটী চমৎকার রূপক আছে। যথার্থই অনেক সময়ে প্রতিভান্বিত ব্যক্তির অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়া থাকে। প্রতিভার এই প্রকার মূর্ত্তি বর্ণিত আছে;–কোন নির্জ্জন পর্ব্বতশিখরে শৃঙ্খলিত ও শকুনিতে তাহার জীবন্ত যকৃত চিবাইতেছে। ফলে অসভ্য স্বাধীনতা বিবর্জ্জিত সমাজে তাহাই ঠিক ঘটিয়া থাকে। যিনি জগতের আলোক, বন্ধু ও প্রাণ জগত তাঁহার প্রতি সতত নির্য্যাতনে তৎপর। সময় দোষে হানিমানও সেই বর্ব্বর নির্যাতন এড়াইতে পারেন নাই। ইউরোপে যখন প্রথম বারুদ ব্যবহারের সূত্রপাত হয়, তখন বীরবর বয়ার্ড জগৎ হইতে অসিচর্ম্মের সহিত বীরত্ব উঠিল বলিয়া ভাবনায় আকুল; লোকে যে ক্রমে অস্ত্র ব্যবহার ছাড়িয়া শুদ্ধ গুপ্তলক্ষে কি প্রকার বীরতা বজায় রাখিবে, তিনি এই চিন্তায় কাতর হইয়াছিলেন। সদৃশমত প্রচার হইবামাত্রই পূর্ব্বতন চিকিৎসকেরা সেইরূপ দুর্ভাবনায় পড়িলেন। লোকে কাটা, ছেঁড়া, ফোঁড়া, জ্বালা, যন্ত্রণা প্রভৃতি ব্যতীত কি প্রকারে রোগরূপ অসুরকে বিনষ্ট করিবে, এই চিন্তায় তাঁহারাও উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন; সুতরাং প্রাচীন-প্রথা-বিলোপকারীর প্রতি সকলে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে বিষবর্ষণ হইতে লাগিল; বিদ্বেষের সীমা রহিল না; হানিমান "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়িলেন। প্রাণভয়ে দেশে দেশে পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোন দেশে ব্যাপক কাল না থাকিতে পারায় সদৃশমতের কতকটা আশু প্রচার হইয়াছিল, বলিতে হইবে। যেখানে তিনি গিয়াছেন, সেইখানে স্বগণবর্গ সকলে একবারে মাতিয়া উঠিলেন। বনের এক সীমায় কোকিল ডাকিলে সীমান্তে [illegible]গুলি কুহরি তোমাকে স্বগণের শব্দে স্বগণ জাগিয়া উঠে। এমন কি, কয়েকটী যন্ত্রসুরে বাঁধিয়া কোনটীতে আঘাত করিলে সকলগুলি ঝঙ্কার করিয়া উঠে। শব্দতত্ত্বের এই একটী নিয়ম। কোন নূতন মত সংস্কারকের সমতুল্য ধীশক্তির বা প্রকৃতির লোকদিগের হৃদয়ে অগ্রে বাজিয়া উঠে। একতন্ত্রী লোকের হৃদয় নাচিয়া উঠে। জলেই জল মিশাইয়া থাকে; হৃদয় চুম্বকেরও সেইরূপ আকর্ষণ। হানিমানের সেইরূপ হইয়াছিল। অগ্নি এক স্থলের কতকগুলা তৃণস্তূপে লাগিলে অগ্নিকাণ্ড হয় না; চতুর্দ্দিকের তৃণপুঞ্জে লাগিলে প্রস্তর অবধি দগ্ধ করিয়া ফেলে। এক স্থানে হোমিও পেথী বুঝেন এমন সুবোধ লোক অতি অল্পই ছিল। সকল নূতন সংস্কার, দুই এক জনের হৃদয়গ্রাহি হইয়াথাকে, এবং সেই দুই জন হইতে ক্রমে প্রচার হইতে বিলম্ব হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু দশদিকে দশ জন আদর করিলে ত্বরায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। প্রচলিত বিষয়ে বৈষম্য ঘটাইতে গেলে কুসংস্কারের সহিত দ্বন্দ্ব হইয়াই থাকে; সুতরাং সমাজের বর্ত্তমান গঠনে সত্যকে প্রথমতঃ অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়। সংস্কারক লোককে কণ্টকময় পথ দিয়া চলিতে হয়।

---

another till they pass into commonplaces, but which all experience refutes. History teems with instances of truth put down by persecution. If not suppressed for ever, it may be thrown back for centuries.

Mill's Liberty.

হানিমান যে বিশেষ ধর্ম্মভীত লোক ছিলেন তাহার আর অধিক প্রমাণের আবশ্যক করে না। চিকিৎসাবিদ্যায় সংশয় জন্মাইবামাত্র ব্যবসায় একবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অন্নাভাবে সপরিবার মহা কষ্টে পড়িলেন তথাপি বিশ্বাসের বিপরীত কার্য্য করিতে পারিলেন না গৃহিণীর তাড়না আত্মীয়গণের ভৎসনা, সন্তানসন্ততির সকরুণ রোদন জঠরজালা, দুঃখদংশন, কিছুতেই তিনি টলেন নাই। ঔষধ ব্যবসায়ীদিগের অত্যাচার হইতে এড়াইবার দুইটী সহজ উপায় ছিল; (১) গোপনে ঔষধ বিতরণ; (২) কোন অনুমত ব্যবসায়ীকে ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ভারার্পণ। ধর্ম্মভয়ে তিনি এদুইটীর একটীও অবলম্বন করিতে পারেন নাই। পিথাগোরসের মত তিনি কোন কথায় সহজে "হাঁ" বা "না" বলিতেন না। অনিষ্ট আশঙ্কা সত্ত্বেও তিনি অকুতোভয়ে আপন শরীরের উপর বিষম ঔষধাদি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। দশ বালাম প্রকাণ্ড গ্রন্থ তাঁহার এ প্রকার পরীক্ষার ফল। ইহাই তাঁহার প্রকৃত কীর্ত্তিস্তম্ভ। তাঁহার মতে চিকিৎসকের রোগীর প্রতি সামান্য অযত্ন মহাপাপ। ধর্ম্মভয় আর কাহার নামও হানিমানের ক্ষমাগুণেরও বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যে দুর্ব্বৃত্ত লোক বিদ্যার্থী সময়ে তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল, তাহাকে পরে নিতান্ত অনুতপ্ত দেখিয়া তিনি মার্জ্জনা করিয়া ছিলেন, এমন কি, কাহারও নিকট তাহার নামও উল্লেখ করেন নাই।

কেহ কেহ বলেন হানিমান অর্থগৃধ্নু ছিলেন; কিন্তু সে কথার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহা হউক, আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না। একের জর্ম্মণ জাতীয়, তাহাতে চিরঅন্নকষ্ট, ইহাতে বরং ধনলোভ না হওয়াই আশ্চর্য্যের কথা। দ্বাদশটী সন্তানসন্ততি লইয়া যিনি ব্যতিব্যস্ত; পরিশ্রম করিয়াও দিনান্তে অর্দ্ধাশনে উপযোগী উপার্জ্জন করিতে পারেন না, তাঁহার অর্থে মমতা না থাকা বরং দোষের কথা। ম্যাচারণে অবস্থান কালে তাঁহার দুর্গতির সীমা ছিল না, দীনদরিদ্রের মত জীর্ণ বসন পরিধান, স্ত্রীর সহিত রন্ধনাদি নির্ব্বাহ, রাত্রে গোপনে পরিবারবর্গের মলিন বসনাদি পরিষ্কার করিতে হইত। নিতান্ত বর্ব্বরের মত তিনি এ সকল হীন কর্ম্ম করিতেন। প্রত্যহ উদর পূরিয়া আহার যুটিত না। কেহ পাছে মনে দুঃখ করেন, সেই নিমিত্ত তিনি প্রত্যহ রুটি আনিয়া সকলকে সমান অংশে ভাগ করিয়া দিতেন। যাঁহার কণ্ঠে দশবিদ্যা বিরাজমান তিনি আজ নীরব। এস্থলে কার্পণ্য বা ধনলোভ কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে থাকিলে নিতান্ত দূষনীয় বলা যায় না। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা ধনলোভ হওয়া উচিত বলিতেছি না। গুণকে অবশ্য গুণ বলিতে হইবে, দোষকে—দোষ। তর্কবিতর্কে দোষের সংস্কার হয় না। সিড্‌নীস্মিথ যখন নীতিবিজ্ঞানের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না, তখন দুই সহস্র টাকার জন্য তদধ্যাপনায় স্বীকৃত হইয়াছিলেন। পেকস্নিফও অর্থের আবশ্যক বশতঃ স্থাপত্যবিদ্যার (Architecture) অধ্যাপনায় সেইরূপ অবস্থায় স্বীকার পাইয়াছিলেন। সুতরাং হানিমানের ধনলোভ ইহাদের বা বেকনের মতে দুষ্য নহে।

হানিমান ধর্ম্মযাজন আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে তাঁহার আদৌ বিশ্বাস

ছিল না। "মথি-লিখিত সুসমাচারে" এতাদৃশ বিশাল বুদ্ধি আবদ্ধ না থাকাই সম্ভব। যাঁহারা জগতের পথপ্রদর্শক তাঁহাদের প্রায় সকল বিষয়েই কিছু না কিছু নূতনত্ব থাকে। তবে সকল বিষয় চিন্তা করিবার সময় থাকে না—মনুষ্যজীবনে তাহার সম্পোষ্যও হয় না; তাই অনেক বিষয় এড়াইয়া যায়। কিন্তু যে বিষয় তাঁহাদের চিন্তামার্গে একবার পড়িয়াছে, তাহা নিতান্ত পক্ষে রঙ্গচঙ্গও হইয়া গিয়াছে। পুরাতন তৈজসপত্র ভাল লোকে যেমন বিনা সংস্কারে গ্রহণ করেন না; হানিমান সেইরূপ প্রাচীন ইহুদীদিগের ধর্ম্ম বিনা মার্জ্জনে গ্রহণ করেন নাই। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন; "পুত্রের মধ্যস্থ" বা "পুত্রের রক্তে পরিত্রাণ," অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রায়শ্চিত্ত তাঁহার প্রশস্ত বুদ্ধিতে স্থান পায় নাই। তাঁহার মত অনেকটা বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ছিল। যিনি যে পরিমাণে বুদ্ধিজীবী তিনি ঈশ্বরের নিকট সেই পরিমাণে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বাধ্য, এইটী তাঁহার মতে পাপপুণ্যের মূল। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার ভক্তিও অচল ছিল। মৃত্যুকালে যখন শ্বাস আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী সেই বিকট যাতনা দেখিয়া কাতরস্বরে তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন যে "আপনি চিরজীবন যেরূপ মনুষ্যের রোগ-যন্ত্রণা নিবারণার্থে ব্রতী ছিলেন, তাহাতে জগদীশ্বর অবশ্যই আপনার এদারুণ যন্ত্রণা নিবারণ করিতে বাধ্য"। তিনি তচ্ছ্রবণে বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, "আমি—এবং শুদ্ধ আমি কেন? প্রত্যেক মনুষ্যই ঈশ্বরদত্ত সামর্থ্যমত সংসারে কার্য্য করিয়া থাকে। পার্থিব ভ্রান্ত চক্ষে গুণের তারতম্য লক্ষিত হয়; কিন্তু ঈশ্বরের নিকট সকলই সমান, তাঁহার দয়ার চক্ষে "তরতম" নাই। সেই পতিতপাবনের বিচারে ভিন্নভাব সম্ভাবিত নহে। সুতরাং তিনি আমার নিকট কোন বিষয়েই বাধ্য নহেন; আমিই তাঁহার নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী আছি।" এরূপ ঈশ্বরপরায়ণ লোকও নাস্তিক মধ্যে গণ্য হইলেন। প্রজ্ঞাহীন প্রভুদিগের মতে স্বাধীন প্রকৃতির লোক মাত্রই নাস্তিক। অন্ধ কুসংস্কার! তোর কি তমোময় ভাব! দাসত্বের কালি ললাটে না মাখিলে আর তোর হস্তে নিস্তারের প্রত্যাশা নাই! যাঁহার আমিত্ব প্রবল সেই তোর ধিক্কারের পাত্র, যাঁহার আমিত্ব নাই—হৃদয়-শূন্য—অস্তিত্ব নিমীলিত, যে কলের পুত্তলির মত তোর ক্রীড়ার সামগ্রী, সেই তোর প্রিয়পাত্র! তোর বিচারে জগতের নেতা মাত্রই নাস্তিক। যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তিনিও নাস্তিক, যিনি না করেন তিনিও নাস্তিক! যীশু নাস্তিক; সক্রেটিস নাস্তিক; শাক্যসিংহ নাস্তিক; শঙ্করাচার্য্য নাস্তিক; গেলেলিও নাস্তিক; ভলটেয়ার নাস্তিক; টমাস পেন নাস্তিক; ফ্রাঙ্কলিন নাস্তিক; বয়ল নাস্তিক; হিউম নাস্তিক; সেক্ষপীয়র নাস্তিক; চৈতন্য নাস্তিক; ডেভিড্ হেয়ার নাস্তিক; ডিরোজিও নাস্তিক; রামমোহনরায় নাস্তিক; গাঁবেতা নাস্তিক; চার্লস্ ব্রাড্‌ল নাস্তিক। এইরূপ সকলেই নাস্তিক! নাস্তিকও নাস্তিক! আস্তিকও নাস্তিক! কিন্তু ফলে অদ্যকার নাস্তিক কল্যকার মহাপুরুষ; পরশ্বের দেবতা। প্রাচীন প্রথার লোপকারীই নূতনের সৃষ্টিকর্ত্তা। জীবজগতে যে প্রকার অনবরত ক্ষয় ও বৃদ্ধি, জীর্ণ ও সংস্কার চলিতেছে; চিন্তা জগতেও অবিকল সেই রূপ ঘটিয়া থাকে। নূতন পুরাতন হইতেছে; পুরাতন আবার নূতনকে স্থলাভিষিক্ত

করিয়া অন্তর্দ্ধান হইতেছে। প্রাচীনের চিতাভস্মে যৌবনোদীপ্তি প্রকাশিত হইতেছে। প্রচলিত মতে সংশয় না হইলে উন্নতির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমাদিগের উন্নতি মার্গ সাধারণোক্ত নাস্তিকতার ফলমাত্র। বিদ্যাদেবী সর্ব্বাঙ্গে সেই নাস্তিকের পদধূলী মাখিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন। ধীশক্তি মহীরাবণের ন্যায় প্রণতি জানেনা—সততই বীরের ন্যায় উন্নত ও স্থির—পুরাতনের পূজায় তৎপর নহে—আপনার চিন্তার পূজায় নিমগ্ন। বিস্ময়, ভয়, মিথ্যা আশা, প্রভৃতি তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না। অবস্থার পূজকমাত্রই হততেজ ও হতোদ্যম—"তুমি যা কর" বলিয়া বসিয়া থাকিতে চায়। লুথর ধর্ম্মের সংস্কার করিয়াছেন, ভলটেয়র মনুষ্যের সংস্কার করিয়াছেন এবং হানিমান চিকিৎসাশাস্ত্রের সংস্কার করিয়াছেন। লোক যতই পরের অনুকরণ ও পূজা করিবে ততই আত্মবিস্মৃত হইবে। হনুমান রামদাস তাই আত্মবিস্মৃত। পরের মুখ চাহিয়া থাকিলে আপনার মুখ শুষ্ক হইয়া যায়। যিনি যে পরিমাণে "চলিত মত" তিনি সেই পরিমাণে নিজ মত নহেন। লোকধর্ম্মের দৃষ্টি পশ্চাদ্ভাগে, উন্নতির সম্মুখে, বিজ্ঞানের এতদুভয়ে। একজনকে অনায়াসে খৃষ্টান করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত মানুষ করা যায় না। যে পথে বিজ্ঞান নাই সেপথে ধর্ম্ম নাই—স্বর্গ নাই—পরিত্রাণ নাই—নির্ব্বাণ নাই। বিজ্ঞানই জগতের মুক্তি। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতিতে আবদ্ধ জগতকে স্ফূর্ত্তি প্রদান করিয়াছে। ইউক্লীডের জ্যামিতিতে জগতের যত উপকার দর্শিয়াছে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকে ততদূর হয় নাই। বিজ্ঞান পুরাকালে কুসংস্কারের বন্দী ছিল। পূর্ব্বে গলবস্ত্র হইয়া নূতন আবিষ্কারের জন্য আবিষ্কারককে দেবতাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইত। আজ ইহাই জগতের নেতা। যেই মাত্র পরিণতিবাদ প্রচার হইল, অমনি ধর্ম্মাচার্য্যগণ 'দিনকে রাত, আকাশকে পাতাল, আলোককে অন্ধকার' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া উহাকে ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত করিয়া লইলেন। এখন বিজ্ঞানকে ধর্ম্ম অভিবাদন করিয়া থাকে। আর না করিবেই বা কেন? একা হাম্‌বোলড্‌ জগতের যে উপকার সংসাধন করিয়াছেন, তাহা সমস্ত পুরোহিতমণ্ডলীকে একত্র করিলে হইবেনা। আজ ডার্বীণ যে উচ্চ শৃঙ্গে দণ্ডায়মান তথায় সেণ্ট পলের আসিবার সামর্থ্য নাই। কৌতূহল জ্ঞানের মোহিনীমূর্ত্তি, সংশয় জীবন, মতদ্বেষশূন্যতা (Toleration) স্বাস্থ্য যাহার শেষটী নাই তিনি জগতের ভার, সত্যের হন্তারক, উন্নতিপথের কণ্টক। যিনি পরের স্বাধীনবৃত্তি দেখিতে পারেন না, তিনি নিজে পরাধীন। অবশ্য স্বাধীনতা অর্থে যথেচ্ছাচারিতা নহে। সমাজবন্ধনে যে পরিমাণে আত্মপ্রতিষ্ঠা দেয়·তাহাই প্রত্যেকের প্রাপ্য। আত্মাধিকার তদ্বৎ পরাধিকারের যতক্ষণ হন্তারক না হয় ততক্ষণ পূজ্য। যে সকল লোক জগতে সেই নেয্য অধিকার ভোগে কুণ্ঠিত হন নাই—সমতল বদ্ধজল সদৃশ জনসমাজে তাঁহাদিগকেই প্রায় নাস্তিক পদবাচ্য করিয়া থাকে। ফলে এরূপ নাস্তিকতা কি অমর্য্যাদার কথা? চার্লস ব্রাড্‌লর সেদিনকার ভারতসংক্রান্ত বক্তৃতা পড়িয়া কোন্ সদাশয় ব্যক্তি না তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত সম্মান করিবেন? খৃষ্টের প্রাচীন উপদেশে আর সে মহদন্তকরণের কি উন্নতি সাধন করিবে? ব্রাডল নাস্তিক; তাঁহার পার্লেমেণ্টে প্রবেশের অধিকার নাই। আস্তিক পাদরী ফিণ্টার ভারতে বসিয়া কি করিতেছেন? তিনি কেন

তৎপদের চেষ্টা করুন না? তাহা হইলে উভয় দেশের মঙ্গল;—খৃষ্টীয় ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টে একজন খৃষ্টবল বৃদ্ধি হইবে, এবং দীনা হীনা প্রাচীনা ভারতেরও একজন বিরাট মূর্ত্তি এঙ্গলোইণ্ডিয়ান কমিয়া যাইবে। ভারতে ডেভিড্ হেয়ারের মত নাস্তিক আর কবে আসিবেন? পৃথিবীতে হানিমানের মত নাস্তিকের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, ততই মঙ্গল। এস্থলে একটি হাসির কথা মনে পড়িল। ডাক্তার কার্পেণ্টার নাস্তিকতার এই রূপ কারণ দর্শাইয়া থাকেন যে নাস্তিকদিগের রক্তে নিকোটাইন (nicotine) আছে। তাঁহার মতে মনুষ্যের রক্তের অবস্থা ক্রমে কলুষিত হইয়া আসিতেছে। ফলে হানিমান ভয়ানক তামাক ব্যবহার করিতেন, তাঁহার রক্তে নিকোটাইন্ (nicotine) ছিল, একথা সম্ভব বলা যায়; কিন্তু ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সমিতি কি করিতেছে?—এমন সহজ আবিষ্কারের সুযোগ অবহেলা করা ভাল হইতেছে না; সভ্যেরা কেন পাদ্রী ফিণ্টারের শোণিত পরীক্ষা করিয়া দেখুন না—তাহা হইলে জগতে জানিতে পারিবে যে রক্তে কোন দ্রব্য থাকিলে লোকে এপ্রকার আস্তিক হইয়া থাকে। কোন রাজা কোন সন্ন্যাসীকে বলিয়াছিলেন যে আমার সহিত আইস, আমি তোমায় বিপুল অর্থ দিব;" উত্তর, "আমার অর্থে প্রয়োজন পূরাইতে পারিবে না।" রাজা, "আমি তোমায় সম্মান দিব"। উত্তর, সম্মান ভিক্ষার সামগ্রী নহে, ইহা উপার্জ্জন করিতে হয়"। রাজা, আইস, আমি তোমায় সুখী করিব"। উত্তর, স্বাধীনতা ব্যতীত সুখ সম্ভাবিত নহে; আর অনুবর্ত্তী লোক কখনই স্বাধীন হইতে পারেনা"। রাজা তাচ্ছল্যে সন্ন্যাসীকে বাতুল বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। জগতের গুরুগণকেও সেইরূপ ক্ষুদ্রজীবী লোকে নাস্তিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে বাসনা করেন। জ্ঞানালোক সূর্য্যকরের মত উড়িবার সামগ্রী নহে। এক্ষণে হানিমান আস্তিকই হউন আর নাস্তিকই হউন—জগতে হানিমান—হানিমান আছেন ও থাকিবেন। তাঁহার আর অন্য কথায় লেশমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

দুঃখের বিষয় হানিমানের জীবনীতে তাঁহার পিতামাতার বিষয়ক কোন কথাই বিশেষ দৃষ্টিগোচর হইল না। তাঁহারই বা কি প্রকার পিতৃমাতৃভক্তি ছিল, তাহারও কোন উল্লেখ পাইলাম না। কৌতূহল প্রযুক্ত আমরা কয়েক খানি বৃত্তান্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তন্মধ্যে এক খানিতেও এবিষয় কোন কথাই বিশিষ্ট রূপে বর্ণিত নাই; যাহা আছে তাহা না থাকিলেই ভাল হইত। বলিতে কি, হানিমানের এমন একখানিও উচ্চদরের জীবনী নাই যাহা পাঠ করিলে জ্ঞানলাভ হয়, বা চিত্তের পরিতৃপ্তি জন্মে; প্রায় সকলগুলিই অসার কথায় পরিপূর্ণ—সত্য অপেক্ষা কল্পনার ভাগই অধিক। যে সকল জীবনবৃত্তান্ত বিদ্যার ও নীতির ভাণ্ডার তাহাতে এ সকল কথা বিশিষ্টরূপ না থাকিলে চরিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইল বলিতে পারি না। আখ্যায়কেরা প্রায়ই সূতিকাগার হইতে জনকজননীকে বিদায় দিয়াছেন। বোধ হয়, তদ্বিষয় কেহ সংগ্রহ করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। কেহ বলিবেন অনাবশ্যক বিবেচনায় বা লিপিবাহুল্যের জন্য এবিষয় এত দূর সংক্ষেপে সমাধা করা হইয়াছে। "বড়র" বড়ত্ব বর্ণনাই আখ্যায়কের কার্য্য। যাঁহার বড়ত্ব তাঁহারই আখ্যান—পিতামাতার তো কোন বড়ত্বই ছিল না। আমরা একথা যুক্তিসঙ্গত বলিতে পারি না। যদি রীতি, ব্যবহার, আত্ম-

শিক্ষা বিজ্ঞান (Heredity) প্রভৃতির উন্নতি উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে মহামনস্বীদিগের জীবনচরিতে পিতামাতার বিশিষ্ট বিবরণ থাকা আবশ্যক। আর জীবনী যদি শুদ্ধ গুণকীর্ত্তন হয়, তাহা হইলে কয়েক পৃষ্ঠা "হুংহি" লিখিলে স্বল্পায়াসে, স্বল্পসময়ে এবং স্বল্পস্থানে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, দুই পক্ষের দুইটী সহধর্ম্মিণীর কথা কি ইহাপেক্ষা অধিক আবশ্যকীয়? 'বিশেষতঃ হানিমানের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী অতি উচ্চদরের লোকছিলেন; বোধ হয়, হানিমান তাঁহার কৃপাতেই এতদূর মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন।' কেহ বলেন তিনি সাতিশয় রূপবতী ছিলেন। তাঁহার পিতা একজন উচ্চবংশীয় ধনী লোক ছিলেন। হার্ভিলী বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। আবার! তাঁহার যক্ষ্মাকাশও ছিল, তাই হানিমানের নিকট চিকিৎসার্থ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীর মত ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মাণী প্রভৃতি কয়েকটা ভাষা ভালরূপ জানিতেন। হানিমানের স্ত্রী—না হইবে কেন? তিনি রীতিমত কাব্য ও আলেখ্য লিখিতে পারিতেন। বোধ হয়, এতদুভয় বিষয়ে হুগো ও রেফেলের সমকক্ষ। তিনি হানিমানের চিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। কায়া যেরূপ ছায়ার সহিত বেড়ায়, তিনি সেইরূপ হানিমানের সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। হানিমানের পূর্ব্বসঞ্চিত যাহা কিছু ছিল, হার্ভিলীর উত্তেজনাতেই তিনি পূর্ব্ব পক্ষের কন্যাগুলিকে বিভাগ করিয়া দেন। এরূপ নিস্বার্থ [illegible] কি উপদেশ নাই? এপ্রকার যিনি যাহা মনে উঠিয়াছে, তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। কেহবা ইহার সম্পূর্ণই বিপরীত প্রমাণ করিয়াছেন। এক্ষণে পাঠকের উপায়? এসকল কথা একবারেই ছাড়িয়া দেওয়া; ইহাতে কোন উপদেশ বা জ্ঞানগর্ভ কথাই নাই। ইহা সত্য হইলেও যে ফল; মিথ্যা হইলেও তাহা। জনকজননীর বরং বড়ত্ব সম্ভব; তাহাদের বড়ত্ব কোথায়? বিবাহ হইতে প্রেমলীলা, কলহ, পুনর্ম্মিলন, মৃত্যু, প্রায়শ্চিত্ত, ক্ষমা পর্য্যন্ত কথার সমুদ্র চলিল; কিন্তু শুদ্ধ পিতামাতার কথায় কার্পণ্য—যেন তাহাতে সমস্ত মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত। জানি না ইউরোপীয় সভ্যতার উদ্দেশ্য কি? আমরা অসভ্য বঙ্গবাসী—আমাদিগের চক্ষে একথা ভাল দেখায় না। বোধ হয়, বিশপ হিবর আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবাসীদিগের মধ্যে, বিশেষ বঙ্গবাসীদিগের, যে প্রকার পিতৃমাতৃভক্তি এমন আর পৃথিবীর কোন দেশে দেখা যায় না। জীবনচরিত-লেখকেরা অদ্যাবধি কেহই প্রায় বিজ্ঞানে দৃষ্টি রাখেন নাই। শুদ্ধ হানিমানের কথা দূরে থাকুক, আমাদিগের অদৃষ্টে যতগুলি জীবনী পাঠ করা ঘটিয়াছে তন্মধ্যে মিল ও ফ্রাঙ্কলীনের নিজ লিখিত বৃত্তান্তে কতকটা একথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, এতদুভয় ভিন্ন অন্যত্র অতি বিরল। কিন্তু এই দুই খানিও এবিষয়ে অসম্পূর্ণ; কারণ শুদ্ধ পিতার কথাই অধিক;—মাতার কথা আদৌ নাই বলিলেই হয়। জীবনীতে জনকজননীর বিশেষ বিবরণ, এমন কি, তাঁহাদেরও আদ্যন্ত জীবনবৃত্তান্ত

না থাকায় বিজ্ঞান ও ধর্ম্মনীতির বিলক্ষণ হানি হইয়া আসিতেছে। ইংরাজীতে কথায় বলে "she who rocks the cradle rules the world." কিন্তু শুদ্ধ কথায় কি হইবে—বৈজ্ঞানিক প্রমাণের আবশ্যক। মহানুভবদিগের জীবনীতে সে প্রমাণ না পাইলে, আর কোথায় পাইব? চরিত্র বিশ্লেষ করিয়া নিয়ম নির্দ্দেশ করাই প্রকৃত জীবিতাখ্যায়কের কার্য্য। নতুবা হোমিওপেথীই হানিমানের জীবনী—তঁাহার অন্য কোন বৃত্তান্ত না থাকিলেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যাহা আবশ্যক তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। জগতে কয়জন মহাত্মার জীবনী আছে? কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য সমস্ত জীবন্ত রহিয়াছে। আমরা যতটুকু পারিয়াছি দশখানি গ্রন্থ হইতে হানিমানের পিতামাতার সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতেছি। নয়নাভিরাম মাইসন্ নগরে হানিমানের পিতা বাস করিতেন। তিনি অত্যন্ত প্রকৃতির ভক্ত ছিলেন। চিত্র করিয়া কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কেহ বলেন তিনিনিরন্ন ছিলেন বটে; কিন্তু সদ্বংশজাত। ইহার প্রমাণ কিছুই নাই। আখ্যায়ক,বোধ হয়,ভালবাসা প্রযুক্ত হানিমানের পিতাকে দরিদ্র ও অকুলীন বলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। অনায়াসে শ্রমের ফল ভোগ করিয়া যে ব্যক্তি শ্রমজীবীকে ঘৃণা করে, সে নিজেই ঘৃণিত। ফলে তাঁহার পিতা একজন অসাধারণ ভদ্র লোক ছিলেন। তাঁহার বিবিধ বিদ্যায় বিশেষ জ্ঞানও ছিল। তাঁহার বুদ্ধিশক্তি সাতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল এবং স্বাবলম্বন তাঁহার হৃদয়ের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। জল চিত্র (Water painting) বিষয়ে তিনি একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি কিরূপ হইয়াছিল—তাহা দেখি নাই—বলিতে পারিলাম না; কেহ কেহ বলেন গ্রন্থখানি অতি সুন্দর হইয়াছিল। হানিমান বলেন যে তাঁহার পিতার অনেক বিষয়ে গভীর জ্ঞান ছিল এবং ধীশক্তিও উচ্চদরের ছিল। ধীরে ধীরে শিশুমতি কিরূপ প্রস্ফুটিত করিতে হয়, তাহা তিনি বিশেষ জানিতেন। তাঁহার জননীও বিশেষ বুদ্ধিমতী ছিলেন; কিন্তু অবস্থাবশতঃ বিশেষ লেখাপড়া শিখিতে পান নাই। প্রথমতঃ হানিমানের অক্ষর পরিচয় ও বাল্যপাঠ জনকজননীর দ্বারাই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। পিতা তাঁহাকে নিজের চরিত্র সৌন্দর্য্য দিয়াছিলেন। পিতাকে সতত সৎকর্ম্মে, স্বাধীনমার্গে ব্যাপৃত থাকিতে দেখিয়া বালকের মনে ধর্ম্মের অঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পিতার চিত্তের প্রাশস্ত, দয়া, ধর্ম্ম, স্বাধীনচিন্তা, ন্যায়পরতা, উচ্চ সংস্কার, সরলতা ও গভীর চিন্তাশীলতা হানিমান সকলের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। এইরূপ সুনীত কার্য্যকলাপ দেখিয়া হানিমানের সহস্র গুরুপদেশের ফল ফলিয়াছিল। কথায় ও কার্য্যে সতত তিনি সদুপদেশ পাইয়াছিলেন। "অহংকারী বা বিদ্যাভিমানী হইও না, অধিক বাক্য ব্যয় করিও না—কার্য্য করিও" ইত্যাদি উপদেশবাক্য তিনি সতত পিতৃমুখে শুনিতে পাইতেন। হানিমানের এই সকল কারণেই জগতে এতাদৃশ জয়লাভ হইয়াছিল। যাহাতে চিন্তাশক্তির স্ফূর্ত্তি হয়, এই জন্য তাঁহার পিতা সকল বিষয়েই তাঁহাকে চিন্তা করিতে শিক্ষা দিতেন, কখন একবারে নিজ চিন্তার ফল তাঁহাকে বলিতেন না। কোন বিষয় আপনি চিবাইয়া তাঁহাকে উদগার করিয়া দেন নাই; সকল বিষয়েই তাঁহাকে স্বয়ং

চিবাইতে ও গলাধঃকরণ করিতে কহিতেন। এরূপ করায় বুদ্ধিশক্তির রীতিমত ব্যায়ামচর্চা হইতেলাগিল। ক্রমে তাহার সকল বলই ফুটিয়া উঠিল। প্রত্যহ পিতা তাঁহাকে এক একটী বিষয় চিন্তা করিতে দিতেন, এবং পর দিন তাহার পরীক্ষা করিয়া লইতেন। মনোমত ফল না হইলে, পুনরায় চিন্তা করিতে বলিতেন, অথচ নিজের অভিপ্রায় বলিয়া দিতেন না। ইহাই প্রকৃত শিক্ষা। ইহাকেই যথার্থ গুপ্তশক্তি প্রস্ফুটিত করা বলে। হস্তে কলস দিয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়া কোন কার্য্যেরই হয় না। সন্তরণ শিক্ষা দেওয়াই যথার্থ কার্য্যকর। স্বাভাবিক শক্তির অনুসরণ করিয়া তাহার পুষ্টি সাধন করাই যথার্থ শিক্ষা—তাহাকে ভারাক্রান্ত করা বা অন্য শক্তি তাহাতে নিয়োজন করা অবিধেয়। স্মৃতির প্রকোষ্ঠগুলি পরকীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ করায় উন্নতি নাই। অশ্বারোহীর বেগ আরোহীর নহে—অশ্বের; এবং তাহাও আয়ত্তাধীন করিতে না পারিলে বিসংকুল ঘটিয়া থাকে। গুরু জ্ঞানদান না করিয়া জ্ঞানমার্গে শিষ্যকে লইয়া উপনিত করিবেন, যেন শিষ্য স্বয়ংই সঞ্চয় করিতে পারে ও চলিতে সাহস পায়। হানিমানের পিতা শিক্ষা দিবার জন্য সন্তানকে কখন কঠোর শাসন করেন নাই—অথচ হানিমান বিলক্ষণ শাসিত বলিয়া বোধ হইত। বেত্র যে পিতার বা গুরুর জ্ঞানশলাকা তিনি পশু—তাঁহার সুকুমারমতি বালকের ভার লওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। হানিমানের পিতা এইরূপ উপদেশ দিতেন যে আমরা জীবিত লোকের নিকট অনেক বিষয়ই ঋণী থাকি, কিন্তু মৃতের নিকট শুদ্ধ সত্য ব্যতীত আর কিছুরই ঋণ নাই। সকল বিষয়ই আদ্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে; লোকের কথা বেদবাক্য মনে করিও না—সকল কথাই আপনার করিবার অগ্রে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিও, উপযুক্ত বিবেচনা না হয়, তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিও, তাহাতে মায়ামমতা রাখিও না। সকল বিষয়ই আপনার বিবেচনা বিবেচনা মূল; কিন্তু তাহা বলিয়া অন্যের বিবেচনাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিও না। আপনার যেমন স্বাধীনতা চাই পরকেও সেইরূপ দিবে। আপনার কথা কেহ মিথ্যা প্রমাণ করিলে—তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিও এবং উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ দিও—ইহাতে লজ্জা করিও না। মিথ্যা জ্ঞান লজ্জাকর; সত্যে লজ্জা নাই। যাহার উচ্ছিষ্ট হউক না কেন, সত্যই পবিত্র সত্য। পুস্তকে কোন কথা লেখা আছে বলিয়া, তাহাতে ধ্রুবজ্ঞান করিও না। যে ব্যক্তি মিথ্যা কহিতে পারে, সে মিথ্যা লিখিতে কেন না পারিবে? কুসংস্কারকে মনে স্থান দিও না; শুদ্ধ দৃষ্টিরূপ প্রহরী রাখিলেই সে আপনিই তোমার মনে প্রবেশ করিবার অবসর পাইবে না। ইত্যাকার উপদেশে হানিমানের মন সতত পবিত্র ছিল। সকলই ক্রমসিদ্ধ; আজিকার বালক কালিকার মনুষ্য। বালক হানিমানের চিত্তে এসকল কথা ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা ছিল; এক্ষণে মনের পুষ্টির সহিত অক্ষরও প্রশস্ত ও গভীর হইয়া উঠিল। ক্ষুদ্র বৃক্ষের ত্বকে কোন কথা লিখিলে, বৃক্ষের বৃদ্ধির সহিত অক্ষরগুলিরও বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। এইহেতু প্রযুক্ত হানিমান পরে এরূপ মহদ্ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি একালাহ চিকিৎসারাজ্যে ফরাশীশ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইয়া-

ছিলেন। তবে ফ্রেঞ্চ মহা বিপ্লব ক্রোধের ফল; ইহা প্রজ্ঞার। অদৃষ্টক্রমে হানিমানের শিক্ষাগুরুও অত্যন্ত উপযুক্ত লোক ছিলেন। তিনি যথার্থই শিক্ষকের কার্য্য বুঝিতেন। শিক্ষক প্রায়ই সম্রাটের মতন শিক্ষা বিভাগে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকেন। যথার্থ শিক্ষক কৃষক বিশেষ। অধ্যাপনা ও কৃষিকর্ম্ম সমতন্ত্রীয়। মূলর তাঁহাকে বিশেষ যত্ন-পূর্ব্বক শিখাইতে লাগিলেন ও তাঁহার স্বাধীনতার প্রস্ফোটনের জন্য বিধিমত সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। দ্বাদশবৎসর বয়সে সহধ্যায়ীদিগকে গ্রীক ভাষায় শিক্ষা দিবার জন্য তিনি আদেশ করেন; এবং ঐ সময়েই নানা বিষয় অনুবাদ করাইয়া লন। হানিমানের অনুবাদ কার্য্যের এই ভিত্তি। মূলরই তাহার মূল। প্রায় হানিমানকে অষ্টপ্রহর নিজ সম্মুখে রাখিতেন; সুতরাং তাঁহার ভাগ্যে গুরুর সহবাস সুখ জন্মিল গুরুর সম্মুখে সদাসর্ব্বদা স্বাধীনভাবে সদ্বিষয়ে যত্নবান থাকিতেন। এই তাঁহার অধ্যাবসায়ের উৎপত্তি। এইখান হইতে অধ্যাবসায় তাঁহার চিরসহচর হইল। এইখানেই তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার সূত্রপাত। এইখানেই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি—গ্রন্থ রচনা। মনুষ্যহস্তের অপূর্ব্ব গঠন এই স্থলের শঙ্খধ্বনি। ১৩ বৎসর বয়সে ঐ বিদ্যালয়েই গ্রিক্রে শিক্ষা দেন। আবার এই কালেই তাঁহার বীরতার জন্ম। দুঃখের কদন্নে তাঁহার দেহের পুষ্টি, অভাব তাঁহার দীক্ষাগুরু। এই স্থলেই তিনি প্রথম প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হন ও অতিক্রম করেন—এবং তাহাতেই হৃদয়ের পুষ্টি সাধিত হয়। তিনি দেখিতে পাইলেন, প্রতিজ্ঞার অসাধ্য কার্য্য নাই। যেখানে ইচ্ছা বলবতী, সেইখানেই জয়। হানিমানের পিতা ভয়ানক সাংসারিক ছিলেন; তিনি অর্থ, সচ্ছলাবস্থা, সুখ সচ্ছন্দ ইত্যাদি বিশেষ বুঝিতেন। এপক্ষে তিনি প্রকৃত ফ্রাঙ্কলীনের পিতা। ফ্রাঙ্কলীনের পিতার যেমন কাব্যে দ্বেষ ছিল—অর্থাৎ তাঁহার মতে কবিগণ চির নিরন্ন; হানিমানের পিতার সেইরূপ উচ্চবিদ্যায় মহা দ্বেষ ছিল। তাঁহার মতে অর্থকরী বিদ্যাই ভাল। সন্তান দশটাকা আনিয়া সুখসচ্ছন্দে থাকাই মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি হানিমানকে আর পড়িতে দিবেন না। হানিমানও প্রতিজ্ঞা করিলেন—পড়িবেন। গোপনে বিদ্যালোচনা চালাইতে লাগিলেন। জননী গোপনে পড়িবার তৈল যোগাইতেন হানিমানের মনে এপ্রকার বিদ্যাশিক্ষার আবেগ ছিল যে কার্য্য-শিক্ষা করিতে গিয়া সে বেগ বন্ধ হওয়ায় তাঁহার ভয়ানক শারীরিক পীড়া হইল। এবার সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ব্যায়াম ও প্রত্যহ নিয়মিত পাদচারণ আরম্ভ করিলেন। পিতা তদ্দর্শনে কার্য্যশিক্ষা বন্ধ করিলেন। শুভাদৃষ্ট মূলরকে পক্ষপাতী করিয়া রাখিল। মূলর হানিমানের উচ্চবিদ্যা শিক্ষার জন্য পিতার সহিত কয়েক দিবস মহা কলহ করিলেন এবং পরে তাঁহাকে সম্মত করিলেন। দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক অর্থাভাব। পিতা সম্মত; কিন্তু আবশ্যকীয় অর্থ নাই। মূলর আপাততঃ কথঞ্চিৎ সাহায্য স্বীকার করি-লেন। তাঁহার ভাষাজ্ঞান থাকাতেই অধ্যয়ন চলিল; ভাষাজ্ঞানেই তাঁহার আবিষ্কার—পূর্ব্বকার কিম্বদন্তী প্রাচীন ভাষায় পড়িয়া পরীক্ষা করিলেন এবং পরে জয়লাভ হইল। সেই ভাষাজ্ঞান থাকিতেই অধ্যাপনাকার্য্যে যৎসামান্য আয় হইল। বিদ্যালয়ের

বেতন দিবার সামর্থ্য নাই—তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই অবৈতনিক ছাত্র ছিলেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষা আবশ্যক; কিন্তু মহানুভবদিগের যথার্থ শিক্ষারম্ভ এস্থলে নহে। শিক্ষকেরা যথায় পরিসমাপ্ত করেন তাঁহারা তথায় আরম্ভ করিয়া থাকেন। অবসরমত গৃহে গৃহে অধ্যাপনা করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করেন এবং তদ্দ্বারা লিপজিক হইতে ভিয়ানায় চিকিৎসা শিক্ষার্থ গমন করেন। উজ্জন বলেন তিনি হার্মেনষ্টাডে দুই বৎসর ছিলেন; কিন্তু হিসাবে তাহা মিলে না। এই সময় তিনি হাঙ্গারীতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তথায় সংক্রামক জ্বরের জন্ম বলিলে হয়। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি একজন গণনীয় চিকিৎসক। তিনি লিপজিকে প্রশংসাপত্র না লইয়া অন্যত্র লইলেন কেন? বোধ হয়, ব্যয়সঙ্গতিই উহার কারণ। লাইপজিকে প্রফেশর গীর্ণার তাঁহাকে বিনা বেতনে চিকিৎসা শিখাইতে লাগিলেন। তখন কলেজে দুই বৎসর পড়িতে হইত। তিনি বিলক্ষণ বলিষ্ঠও ছিলেন। এই সময়ে তিনি লেখাপড়া ব্যতীত ব্যায়ামেও বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। পিতার আজ্ঞামত যতটুকু ধারণা হইত বা সংগ্রহ করিতে পারিতেন প্রত্যহ ততটুকুই বিদ্যালোচনা করিতেন। বিনম্র ও বুদ্ধিমান বলিয়া কোয়ারিণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতে লাগিলেন। এমন কি, তাঁহাকে না সমভিব্যাহারে লইয়া রোগী দেখিতে যাইতেন না। গুণ থাকিলে গুরুজন যে আদর করিবেন, ইহার আর বিচিত্র কি? যাহা হউক, এক্ষণে হানিমানের জনক জননীর যেকয়েকটী কথা সংগ্রহ করিতে পারিলাম, তাহাই বিবৃত করিলাম। পিতামাতাই অনেকস্থলে মহত্ত্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। হানিমানের পিতামাতার সেই হেতু প্রযুক্ত অসাধারণ শক্তি বা গুণ প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হানিমান দরিদ্র বলিয়া, বোধ হয়, এসকল কথা সংগ্রহ হয় নাই। এক্ষণে যে যাহা কল্পনা করিতে পারেন। হানিমানের পিতা হানিমানকে আশৈশব স্বাতন্ত্র অবলম্বন করিতে শিখাইয়াছিলেন ও স্বাধীন চিন্তায় সতত নিয়োজিত রাখিতেন। কোন কথারই মীমাংসা করিয়া দিতেন না; সকল বিষয়ই পুত্রকে নিজ বুদ্ধিগত স্থির করিতে বলিতেন। এই রূপে হানিমানের ধীশক্তি নিজবলে বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল—রীতিমত ব্যায়াম চর্চ্চায় যেরূপ দেহের পুষ্টিসাধন হয়, উক্ত প্রকারে তাঁহার মনের সেইরূপ পুষ্টি সাধন হইয়াছিল। পূর্ণমাত্রায় বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হইলে নিজ আভ্যন্তরিক বল জন্মে: সে বল পরকীয় বলাপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর! জেমস্ মিল স্বয়ং অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন, তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী ও অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট ছিল। জেমস্ মিলের পুত্রকে বিদ্যা শিখাইবার জন্য বিশেষ আস্থা এবং সঙ্গতিও ছিল। হানিমানের পিতার এতদুভয়ই ছিল না। হানিমান সুবোধ শান্ত ও সুনীত হইয়া দশটাকা আনিয়া দিনপাত করিবেন, এই তাঁহার আন্তরিক বাসনা ছিল। জানিনা, জেম্স মিলের মত পিতা হইলে, হানিমানের আরও কতদূর সংসারে জয়লাভ হইতে পারিত।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায়।

মরুত-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আদর্শ তাপমান যন্ত্র (Standard Thermometer)—বায়ুর তাপ পরিমাণের নিমিত্ত এই তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আদর্শের সহিত পরীক্ষিত একটী শুষ্কাধার তাপমান যন্ত্র দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হয়। ইহাতে যে সময় পাঠ লওয়া যায় সেই সময়েরই তাপ পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার শোধন জানা থাকে সুতরাং ইহার এবং আদর্শের শোধিত ফল একই সমান হয়। যে স্থানের তাপ পরিমাণ গ্রহণ করিতে হইবে তথায় এই যন্ত্র এইরূপে স্থাপন করিতে হইবে যেন বায়ুর স্রোত তাহা স্পর্শ করিয়া অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে। তাপমান যন্ত্র স্থাপন জন্য স্থান নির্ব্বাচনের বিষয় পরে বলা যাইবে। এই শুষ্কাধার (dry bull) তাপমান যন্ত্র একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকা আবশ্যক। এই তাপমান যন্ত্র দ্বারা ভূতল হইতে উর্দ্ধদেশস্থ ও ভূগর্ভস্থ তাপ পরিমাণ করা হয়। সুতরাং ভূতল হইতে এই সকল স্থান কত উচ্চ ও নিম্ন তাহা বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক, কারণ ভিন্ন ২ স্থানের তাপমান পরিমাণ ভিন্ন ২ হইয়া থাকে। ভূতল হইতে দূরতা অনুসারে হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই শুষ্কাধার তাপমান যন্ত্র ভূমির ও তাহার নিম্ন স্থানের এবং ভূতল হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত স্থানের উত্তাপ পরিমাণ গ্রহণ করা হয়। এই সকল বিষয় পরে বর্ণনা করা যাইবে।

ঝুলান তাপমান যন্ত্র (Sling Thermometer)। আর এক প্রকার তাপমান যন্ত্র আছে যদ্দারা যখন ইচ্ছা করা যায় তৎক্ষণাৎ বায়ুর তৎ-সাময়িক ঠিক তাপ জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। ইহাকে ঝুলান তাপমান যন্ত্র বলা যাইতে পারে। ইহা একটী ঘূর্ণায়মান ফ্রেমের উপর থাকে, অথবা ইহার শেষ ভাগে একটী কাচের রিং সংলগ্ন থাকে। ইহাতে স্বতন্ত্র ভাগ পত্র সংলগ্ন থাকে না, ইহার দণ্ডেই খোদিত থাকে। পাঠ লইবার সময় রিং সহিত একগাছা সূত্র বাঁধিয়া ও তাহা অঙ্গুলিতে জড়াইয়া লইয়া সজোরে ঘুরাইয়া তৎক্ষণাৎ পাঠ লইতে হয়। ইহাতে বিকীরণজনিত অন্য বস্তু হইতে যে তাপ আইসে তাহা এই উপায় দ্বারা তাপমান যন্ত্রকে বিচলিত করিতে পারে না। ঘুরাইবার সময় অধিক বায়ু-স্পর্শে উত্তাপ অন্তরিত হয়, কেবল মাত্র বায়ুর উত্তাপই থাকে।

অধিকতম তাপমান যন্ত্র (Maximum Thermometer)

রদারফোর্ড অধিকতম তাপমান যন্ত্র

(Rutherford's Maximum)

ইহার পারদ সীমার শেষ ভাগে একটী চিনামাটীর প্রদর্শক (Index) আছে। উত্তাপে পারদ স্ফীত হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে তৎসহিত উক্ত প্রদর্শককে সম্মুখে লইয়া

যায় তৎপরে পারদ সঙ্কুচিত হইলে পারদ সীমা সরিয়া আইসে কিন্তু প্রদর্শক পূর্ব্ব স্থানেই থাকে। প্রদর্শকের নিম্ন সীমা যাহা পারদ স্পৃষ্ট থাকে তাহা পাঠ প্রদর্শন করে। ইহার উপরিভাগে একটী লৌহনির্ম্মিত সূচি আছে, ইহাও অনায়াসে ইহার মধ্যে নড়িতে পারে। প্রত্যেক পাঠ লইবার পরে পুনঃ সংস্থাপন (reset) করিতে হয়। ইহা কেবল তাপমান যন্ত্রের আধার-নিম্ন ভাগে করিয়া ঋজুভাবে ধরিলে প্রদর্শক নিম্নে আইসে। যদি না আইসে তবে একটী চুম্বক পাথর (Magnet) দ্বারা লৌহ সূচি সরাইলে তাহা অন্তর করা যাইতে পারে।—ইহা সমতল (Horizontal) ভাবে স্থাপন করিতে হয়।

আর এক প্রকার অধিকতম তাপমান যন্ত্র আছে তাহাতে কোন প্রকার প্রদর্শক—(index) নাই। ইহা কেবল পারদ পূর্ণ। এবং পারদ স্তম্ভের শেষ ভাগে তাপ পরিমাণ অবগত হওয়া যায়। কিন্তু ইহার দস্ত বর্ত্তুলের কিছু উপর হইতে বক্র। উত্তাপে যখন পারদ স্ফীত হইতে থাকে পারদ সীমা অগ্রসর হয়, এবং শৈত্যের আবির্ভাব হইলেই পারদ সঙ্কুচিত হইয়া বক্র স্থান হইতে স্তম্ভ ছিন্ন হইয়া বর্ত্তুল মধ্যে আইসে, এবং স্তম্ভের শেষ যেখানে ছিল সেই খানেই থাকে। ইহা পুনঃ স্থাপনের সময় হস্তের উপর লম্ব ভাবে রাখিয়া আস্তে ২ আঘাত করিলেই পারদ স্তম্ভ বর্ত্তুলের অংশের সহিত মিলিত হয়। ইহাও সমতল ভাবে স্থাপন করিতে হয়। ইহাকে বক্র নেগ্রিটী জ্যাম্ব্রা (Negretti & Zambras invented maximum) অধিকতম তাপমান যন্ত্র বলে।—

আর প্রকার অধিকতম তাপমান যন্ত্র (Philip's Maximum) আছে যাহার স্তম্ভমধ্যে একটী ক্ষুদ্র বায়ুকণা প্রবিষ্ঠ করান আছে। উত্তাপ বৃদ্ধির সময় আধার হইতে পারদ স্ফীত হইয়া বায়ু কণা সহ অগ্রসর হয়। কিন্তু সঙ্কুচিত হইবার সময় বায়ু কণার যে অংশ আধারের দিকে থাকে সেই দিক হইতে সরিয়া আইসে, এবং উর্দ্ধ সীমা যেখানে ছিল—সেই খানেই থাকে। ইহার আকার সরল অর্থাৎ বক্র নহে। এই তাপমান যন্ত্রের পাঠ লইতে হইলে পারদ স্তম্ভের যে সীমা আধার হইতে অধিক দূরে তাহাতেই পাঠ লইতে হয়। যখন সূর্য্যের কিরণ প্রখর থাকে তখনই উত্তাপ অধিক হয় সেই হেতু অপরাহ্ন ২টার পরে পাঠ লওয়া উচিত। ইহার পাঠ দিনান্তে একবার লওয়া হয় ইহা স্বতঃ পরিমাণ বিশিষ্ট (self registering) সুতরাং পারদ সর্ব্বোচ্চ সীমায় উঠিলেও তৎপরে শৈত্যের আবির্ভাব হইলেও ইহার পাঠ নষ্ট হয় না। আলিপুরে ইহার পাঠ প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪টার সময় লওয়া হয়। ইহা সমতল ভাবে স্থাপন করিতে হয়। ইহা সংস্থাপিত (reset) করিয়া পাঠ লইলে তৎসাময়িক শুষ্কাধার তাপমান যন্ত্রের পাঠের সহিত সমান হইবে। অর্থাৎ তৎসাময়িক তাপ পরিমাণ পাওয়া যায় প্রত্যহ পাঠলইয়া ইহা পুনঃ স্থাপন করিতে হয় অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন পারদ স্তম্ভকে সংলগ্ন করিয়া লইতে হয়।

ন্যূনতম তাপমানযন্ত্র (Minimum Thermometer) এই যন্ত্র দ্বারা দৈনিক ন্যূনতম তাপ পরিমাণ অবগত হওয়া যায়। দিন অপেক্ষা রাত্রিকালে তাপ পরিমাণ হ্রাস হয়। রাত্রি মধ্যে কতদূর তাপ হ্রাস হয় তাহা এই যন্ত্র দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। শুষ্কাধার তাপমান যন্ত্র দ্বারা তাহা অবগত হওয়া সুবিধা হয়না কারণ এই তাপমান যন্ত্রে যে সময় পাঠ লওয়া যায় কেবল মাত্র তখনকার তাপ পরিমাণ অবগত হওয়া যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক মুহূর্ত্তের পাঠ না লইলে আর কখন তাপ পরিমাণ ন্যূনতম হইল বা অধিকতম হইল তাহা জানা যায় না। এই হেতু ন্যূনতম ও অধিকতম তাপমাণযন্ত্রের ব্যবহার। এই যন্ত্রদ্বয় স্বতঃ পরিমাণ বিশিষ্ট (Self registering) অর্থাৎ ইহা এরূপ কৌশলে প্রস্তুত যে ইহাতে যে ন্যূনতম ও অধিকতম তাপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করে তাহা নষ্ট হয় না অর্থাৎ ন্যূনতম ও অধিকতম তাপ পরিমাণ একবার নির্দ্দিষ্ট হইলে সে সীমা চিহ্নিত থাকে। পরে তাপ পরিমাণ বিচলিত হইলেও সে চিহ্নিত স্থান নষ্ট হয় না। ন্যূনতম তাপমান যন্ত্র সুরাবার্ম্বাপূর্ণ এবং ইহাতে কৃষ্ণবর্ণের একটী কাচ নির্ম্মিত সূচি নিমগ্ন থাকে। এই সূচির দুই সীমায় দুইটী মাথা আছে অর্থাৎ ইহা দুইটী মাথা বিশিষ্ট একটী আলপিনের মত। ইহা সুরাতে সংলগ্ন থাকে এবং যন্ত্র উলটাইলেও সুরা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং যখন সুরা শৈত্যে সঙ্কুচিত হয় সেই সূচিও তাহার সহিত আধারের দিকে চলিয়া যায়। কিন্তু ইহার পর তাপ বৃদ্ধি হইলে সুরা স্ফীত হইতে থাকে সূচি যে খানকার সেইখানেই থাকে, সুরা তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। সূচির যে সীমা আধার হইতে অধিক দূরে স্থিত সেই সীমায় ন্যূনতম তাপ পরিমাণ পাওয়া যায়। ইহার পুন স্থাপন (reset) করিতে হইলে, আধার ঊর্দ্ধে রাখিয়া যন্ত্র লম্ব ভাবে ধরিলে সূচি সুরার শেষ সীমায় আসিয়া স্থির থাকে তাহা অতিক্রম করে না। ইহা কিরূপে তাপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করে তাহা বলা উচিত। এক দিবস প্রাতে যদি উপরোক্তরূপে স্থাপন করিয়া দেওয়া হয়, তৎপরে যদি তাপ বৃদ্ধি হয় তবে সুরা সূচি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয়। এবং শৈত্য প্রাপ্ত হইলে সুরা সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং যে সময় যন্ত্র স্থাপন (set) করিয়া দেওয়া হইয়াছিল তদপেক্ষা শৈত্যের আবির্ভাব হইলে সুরা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং সূচিও তৎসঙ্গে ২ আধারের দিকে চলিতে থাকে। এবং চরম সীমা প্রাপ্ত হইলে সুরা আর সঙ্কুচিত হইবে না এবং সূচিও স্থির থাকিবে। ইহার পর আবার তাপ বৃদ্ধি হইলে সুরা স্ফীত হইবে। কিন্তু সূচি পূর্ব্ব সীমায় থাকিবে।

ন্যূনতম তাপমান যন্ত্রের পাঠ প্রত্যহ প্রাতে ৬টার সময় লইতে হয় এবং পুনরায় সূচি সুরার শেষ সীমায় আনিয়া দিতে হয়। ইহা প্রায় সমতল ভাবে স্থাপন করিতে হয় কেবল আধার একটু নিম্নে থাকে। এই যন্ত্র অনেক প্রকার দোষ যুক্ত হয়। উত্তাপ দ্বারা অনেক সময় সুরা বাষ্প হইয়া নলের শেষ ভাগে জমিয়া থাকে। তাহাতে সুরা স্তম্ভ ছোট হয়। প্রত্যেক পাঠ লইবার সময় তাহা বিশেষ রূপে লক্ষ্য করা আবশ্যক এইরূপে সুরা জমিয়া থাকিলে সে পাঠ অগ্রাহ্য করিতে হয়। কারণ শৈত্যের শেষ

সীমা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কি পরে এই রূপ বাষ্প হইয়াছে তাহা জানা থাকে না। পুনরায় যন্ত্র কখনং সুরা স্তম্ভ ভগ্ন হইয়া যায়। তাহা হইলে যন্ত্র সন্নিবেশ করিবার পূর্ব্বে তাপপত্র সহ দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া নিম্নাভিমুখে সজোরে নামাইলে স্তম্ভ পুনর্মিলিত হয়।

আর এক প্রকার তাপমান যন্ত্র আছে যদ্বারা সেই এক যন্ত্রে অধিকতম ও ন্যূনতম দুই প্রকার তাপ পরিমাণ পাওয়া যায়। ইহাকে সিক্‌সের তাপমান যন্ত্র (Six's Thermometer) বলে। ইহার দণ্ড ইংরাজি U অক্ষরের ন্যায় বক্র। ইহার দুই সীমায় দুইটী আধার আছে। একটী আধার সম্পূর্ণরূপে সুরাবীর্য্য পূর্ণ ও অপরটী সুরা ও তাহার বাষ্প পূর্ণ। দস্তের মধ্য বা—বক্র অংশ এবং তাহার কিছু উপর পর্য্যন্ত পারদ পূর্ণ থাকে। পারদ স্তম্ভের দুই সীমায় দুইটী সুচি আছে। যে দিকের আধার সুরাপূর্ণ সেই দিকে ন্যূনতম তাপ পরিমাণ ও অপর দিকে অধিকতম তাপ পরিমাণ পাওয়া যায়। উত্তাপে সুরা স্ফীত হইলে পূর্ণ আধারের দিক হইতে (সুচি যেখানকার তথায় থাকে) পারদ স্তম্ভ সুরার অগ্রভাগে তাড়িত হইয়া দস্তের অপর দিকে উঠে, এবং তাহার সহিত সেই দণ্ডের সুচিও উঠে। তৎপরে তাপ হ্রাস হইলে সুরা সঙ্কুচিত হইতে থাকে পারদ সুরা পূর্ণ আধারের দিকে উঠিতে থাকে ও অপর দিকে সুচি যেখানে উঠিয়াছিল তথায় আসিয়া নামিতে থাকে এই দিকে অধিকতম তাপ পরিমাণ পাওয়া যায়। সুচির যে মস্তক পারদ সীমার নিকট সেই সীমায় পাঠ [illegible]য়। ও দিকে যেখানে সুচি উঠে
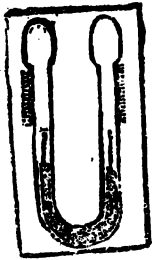
পুনরায় তাপ বৃদ্ধি হেতু সুরা স্ফীত হইয়া পারদ তাড়িত হইলেও সুচি যেখানকার তথায় থাকে। এই সুচির যে সীমা পারদ সীমার নিকট তথায় ন্যূনতম তাপ পরিমাণ পাওয়া যায়। এই সুচি দ্বয় যন্ত্র লম্বভাবে ধরিলেও মাধ্যাকর্ষণে নিম্নে আইসে না তজ্জন্য এই যন্ত্র স্থাপন (reset) করিবার সময় একখানা ঘোড়ার পায়ের নালের আকৃতি বিশিষ্ট (horseshoe magnet) চম্বুক দ্বারা সুচিদ্বয়কে সরাইয়া পারদ সীমা স্পর্শ করাইয়া দিতে হয়।

তাপমান যন্ত্র সন্নিবেশ করিবার জন্য স্থান নির্দ্দেশ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এরূপ স্থান হওয়া উচিত তাহা সূর্য্য ও আকাশ হইতে আচ্ছাদিত হইবে, এবং ভূমি হইতে কিছু উচ্চে, ও গৃহাদির দেওয়াল হইতে অনেক অন্তরে থাকা উচিত, অথচ তথায় বায়ুর গমনাগমন যেন উত্তমরূপে হইতে পারে। সেই হেতু নিম্ন লিখিত প্রকারে একখানা চালা নির্ম্মাণ করিলে চলিতে পারে। এবং এইরূপ চালা ভারতবর্ষের সকল অবজার্ভেটরিতে নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে। দেওয়াল বা বারাণ্ডা প্রভৃতি স্থানের নিকট তাপমান যন্ত্র থাকিলে এই সকল স্থান উত্তাপ শোষণ ও বিকীরণ করা হেতু তাপমান যন্ত্রের কল বিশেষ দোষযুক্ত হয়। এইরূপ চালার-নির্ম্মাণ প্রণালী নিম্নে বলা যাইতেছে। একটী তৃণাবৃত এবং বৃক্ষাদি দ্বারা অনাচ্ছাদিত স্থানে খোলা অনাবৃত জায়গায় নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। ইহা ১৮।২০ ফিট দীর্ঘ ১৪ ও ১৬ ফিট প্রস্থ হইবে।

উপর খড় দিয়া উত্তমরূপে ছাওয়া থাকিবে এবং নিম্ন ভাগ সমস্ত খোলা থাকিবে তদ্দ্বারা নিম্ন দিয়া বায়ু সমাগম উত্তমরূপে হইতে পারিবে। গৃহাদির দেওয়াল হইতে ইহা অন্ততঃ ৫০ ফিট অন্তরে সন্নিবিষ্ট থাকা আবশ্যক। ইহার মটকা উত্তর দক্ষিণে লম্বা
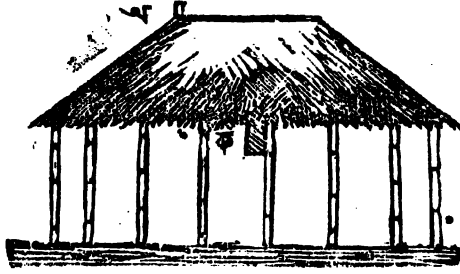
হইবে। উত্তপ্ত বায়ু বহিষ্করণ জন্য চালের উপরিভাগে একটী ছিদ্র থাকা উচিত। মটকার এক সীমায় একটী বাঁশের নল প্রবৃষ্ট করিয়া দিলেই সে কার্য্য সম্পাদিত হইবে। ইহা দ্বারা বায়ু গমনাগমন করিবে। চালের নিম্ন ভাগ দিয়া মটকার দুই সীমা হইতে দুইটী খুটি থাকিবে। এই খুটীর মধ্যে দক্ষিণ ভাগেরটীর গাত্রে একটী পিঞ্জর ঝুলাইয়া দিতে হয়। ইহাতে তাপ পরিমাণ যন্ত্র সকল থাকিবে। চালেরছাচ ভূমি হইতে ৫। ৬ ফীট উচ্চ হইবে।

তাপমান যন্ত্রের পিঞ্জর (Thermometer cage] ইহা কেবল একটী কাষ্ঠের ফ্রেম লৌহ জাল দ্বারা বেষ্টিত। ইহার মধ্যে একটা শুষ্কাধার (dry bull) একটা সিক্তাধার (wetbull) একটা অধিকতম, একটা শুষ্ক ন্যূনতম একটা সিক্ত ন্যূনতম তাপমান যন্ত্র সন্নিবিষ্ট থাকে। এই পিঞ্জরটী ভূমি হইতে চারি ফিট উচ্চে একটী খুটির গাত্রে সংলগ্ন থাকে।

বিকীরণ (Radiation) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কোন একটী উত্তপ্ত বস্তুর নিকট একটী শীতল বস্তু রাখিলে উত্তপ্ত বস্তুর উত্তাপ বিকীর্ণ হইয়া শীতল বস্তুতে যায় অবশেষে উভয় বস্তু সম তাপাপন্ন হয়। অর্থাৎ অসমান তাপ বিশিষ্ট ভিন্ন ২ পদার্থ নিকটস্থ হইলে পরস্পর মধ্যে তাপ বিকীর্ণ হইয়া সমান তাপ বিশিষ্ট হয়। উষ্ণ বস্তু ক্রমশঃ তাপ বিকীরণ করে কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাপ প্রাপ্ত হয় না তজ্জন্য তাহার তাপ হ্রাস হয়। বিকীর্ণ তাপ উৎপত্তি স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে সরল রৈখিক ভাবে ভ্রমণ করে। বায়ু স্তর ভেদ করিয়া যাইতে এই তাপের তারতম্য অতি সামান্য রূপে হইয়া থাকে, এবং বায়ু প্রবল হইলেও ইহার সরল রৈখিক গতির পরিবর্ত্তন হয় না। উৎপত্তি স্থানের তাপ অধিক হইলে এই তাপও অধিক হয়। এবং ইহার দূরতা ও অবনতি (Inclination) অনুসারে এই তাপের তারতম্য হইয়া থাকে।

পৃথিবীও এই নিয়মের বশীভূত। সূর্য্য যতক্ষণ কিরণ দিতে থাকে, পৃথিবী সূর্য্য হইতে যে উত্তাপ প্রাপ্ত হয় তাহা পৃথিবী হইতে বিকীর্ণ তাপ অপেক্ষায় অনেক অধিক

† Blanford's meteorology

সুতরাং পৃথিবী উত্তপ্ত হইয়া আইসে। পুনরায় সূর্য্য অস্তগত হইলে ইহার পরিবর্ত্তে শীতল শূন্যদেশ পৃথিবীর সম্মুখে থাকে। সুতরাং এখন পৃথিবী হইতে যে উত্তাপ বিকীর্ণ হয় তাহা শূন্য দেশ হইতে প্রাপ্ত তাপ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক, সুতরাং ভূতল শীঘ্রই শীতল হইয়া আইসে। প্রথম প্রকার বিকীরণকে সৌর বিকীরণ বলেও দ্বিতীয় প্রকারকে নৈশ বা পার্থিব বিকীরণ কহে।

সূর্য্য হইতে যে উত্তাপ বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীপরি পতিত হয় তাহা পরিচালন দ্বারা মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ করে। যত নিম্নে প্রবেশ করে তত উত্তাপের প্রখরতা হ্রাস হয়। অতঃপর ৪ চারি ফিট নিম্নে সূর্য্যোত্তাপ অনুভব করা যায় না।

সৌর কিরণে বায়ু একেবারে উত্তপ্ত হয় না। প্রথমতঃ ভূমি উত্তপ্ত হয় তৎপরে তাহা স্পর্শ করিয়া বায়ু উত্তপ্ত হয়। সুতরাং যেখানকার ভূমি উত্তম পরিচালক নহে তথায় উত্তাপ অভ্যন্তর মধ্যে প্রবেশ করে না তজ্জন্য তথাকার ভূমি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় এবং বায়ু তাহা স্পর্শ করিয়া অধিক উত্তপ্ত হয়। কিন্তু যেখানে ভূমি পরিচালক তথায় উত্তাপ নিম্নে পরিচালিত হয়। এবং বায়ু অধিক উত্তপ্ত হয় না। মরুভূমিসকল বালুকাপূর্ণ হওয়াতে তথাকার বায়ু অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। আবার যেস্থানে অধিক বৃক্ষাদি থাকে তথাকার উত্তাপ অধিক হয় না। কারণ সূর্য্যকিরণ কিয়ৎ পরিমাণে বৃক্ষাদির রস বাষ্পরূপে পরিণত করিবার জন্য ব্যয়িত হয়, এবং সেই কিরণ বৃক্ষাদির উপর পড়িয়া ভূমিস্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং ভূমি অধিক উত্তপ্ত হয় না। যে দেশে বৃহৎ বন আছে তথায় দিনে অধিক উত্তাপ হয় না এবং রাত্রিকালে অধিক শীতল হয় না কারণ ইহাতে উত্তাপ সঞ্চিত থাকে বৃক্ষাদি হইতে শীত ও উত্তাপ অনেক বিলম্বে অন্তরিত হয়। যে স্থানে বড় ২ বন থাকে তথায় গ্রীষ্মকালে উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হয় না তজ্জন্য তথায় অধিক বৃষ্টি পড়ে। এরূপ অনেক ঘটিয়াছে যে কোন ২ স্থানে বড় ২ বন থাকাতে বৎসর ২ প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি পড়িত, কিন্তু সেই সকল বন কাটিয়া ফেলাতে তথায় আর বিন্দু মাত্রও বৃষ্টি পড়ে না কারণ তথাকার উত্তাপ অনেক বৃদ্ধি পায়, এবং বায়ুর বাষ্প পূর্ব্বাপেক্ষা আর ঘনীভূত হয় না।

সূর্য্য কিরণ ভূমির উপর পতিত হইয়া যদ্রূপ বায়ুর তাপ পরিমাণ বিচলিত করে, জলের উপর পতিত হইয়াও তদ্রূপ করে। সূর্য্য কিরণ জলের উপর পতিত হইয়া অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করে কিন্তু অধিক নিম্নে যায় না কারণ জল উত্তমরূপে পরিচালক নহে। কিন্তু বায়ু ও স্রোত দ্বারা জল বিচলিত হইলে উত্তাপ অধিক পরিমাণ জলের সহিত একত্র হয়। কিন্তু জলের আপেক্ষিক উত্তাপ ভূমি অপেক্ষা চারি গুণ অধিক, অর্থাৎ যে উত্তাপে বায়ু চারি গুণ উত্তপ্ত হইবে, তাহাতে জল কেবল মাত্র এক গুণ উত্তপ্ত হইবে। পুনরায় জল হইতে উত্তাপ শীঘ্র অন্তরিত হয় না। ইহা দ্বারা এহা অবগত হওয়া যাইতেছে যে, যে দেশে বৃহৎ হ্রদ বা সমুদ্র আছে তথাকার আবহ নাতি শীত ও নাতি উষ্ম ভাবাপন্ন ; কারণ দিবাকালে সূর্য্য উত্তাপ অনেক হ্রাস হয়, এবং রাত্রিকালে ভূমি শীতল হইলেও সমুদ্র জল তাহার উত্তাপ অতি অল্পে পরিত্যাগ করে। সুতরাং শীত অধিক হইতে পারে না।

পৃথিবী সূর্য্য হইতে যে উত্তাপ প্রাপ্ত হয়, সূর্য্য যখন অদৃশ্য হয়, সেই উত্তাপ শূন্যে বিকীর্ণ হয়। পৃথিবী হইতে উত্তাপ সকল সময়ই বিকীর্ণ হইতেছে। কিন্তু সূর্য্য কিরণে অধিক উত্তাপ প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য উত্তাপ দিবাভাগে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। সূর্য্য অস্তগত হইলে পৃথিবী সূর্য্য হইতে উত্তাপ প্রাপ্ত হয় না। এবং বিকীরণ দ্বারা ক্রমশঃ শৈত্য প্রাপ্ত হইয়া যদি বায়ু আর কোনরূপে উত্তাপ প্রাপ্ত না হইত তাহা হইলে প্রাণিগণের বসবাসের অসুবিধা হইত কারণ তাহা হইলে এত অধিক শৈত্যের আবির্ভাব হইত যে তাহা অসহ্য হইত। সেই জন্য ভূতল স্পৃষ্ট বায়ু বিকীরণ জনিত শৈত্য প্রাপ্ত হইলে তাহার উপরস্থ বায়ু হইতে উত্তাপ গ্রহণ করে। পুনরায় বায়ু শীতল হইলে তৎসন্নিহিত বাষ্প শীতল হইয়া ঘনীভূত হয় এবং সেই সময় লুপ্ত উত্তাপ বহির্গত হয়। এইরূপে যতক্ষণ বাষ্প ঘনীভূত হইতে থাকে লুপ্ত উত্তাপ (Latent heat) পরিত্যক্ত হইতে থাকে। তাহাতে বায়ুর কিছু উত্তাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বিকীরণ তাপমান যন্ত্র (Radiation Thermometer) এই তাপমান যন্ত্র দ্বারা বিকীরণ দ্বারা যে তাপের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয় তাহা পরিমাণ করা যায় প্রাতঃকালে সূর্য্য উদয় হইতেই রৌদ্র উঠে ও তৎসঙ্গে উত্তাপ অনুভব হয়। ইহার কারণ এই যে সূর্য্য হইতে উত্তাপ বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়; তজ্জন্য উত্তাপ অনুভূত হয়। পুনরায় রাত্রিকালে সূর্য্য উপরে থাকে না সুতরাং উত্তাপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং পৃথিবীও সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত উত্তাপ শূন্যে নিক্ষেপ করে তজ্জন্য শৈত্যের আবির্ভাব হয় এবং ভূতল উপরিস্থ বাষ্প শীতল হইয়া জল কণায় পরিণত হইয়া তৃণ বৃক্ষাদির উপর পতিত হয়। এই যন্ত্র দুই প্রকার এবং এই দুই যন্ত্র দ্বারা বিকীরণ জনিত অধিকতম, ও ন্যূনতম তাপ পরিমাণ অবগত হওয়া যায়। এই জন্য এই যন্ত্রদ্বয় (Self registering) বা স্বতঃপরিমাণবিশিষ্ট শেষ সীমায় উঠিলে বা নামিলে পাঠ নষ্ট হয় না।

১ম সৌর বিকীরণ তাপমান যন্ত্র (Solarradiation) ইহা একটী পারদীয় অধিকতম তাপমান যন্ত্র এবং ইহার আধার ও দণ্ডের কিয়দংশ ভূষা দ্বারা আবৃত থাকে এবং এই যন্ত্র একটী বৃহৎ নির্ব্বাৎ নল মধ্যে আবদ্ধ থাকে ইহা দ্বারা সূর্য্য কিরণের প্রখরতার পরিমাণ পাওয়া যায়। ইহার ভূষা সূর্য্য কিরণ শোষণ করে। উচিত ইহা একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকা, উচিত এবং ভূতল হইতে কত উচ্চে থাকে তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। আলিপুরে ইহা একটী ৪ ফিট উচ্চ দণ্ডের উপর স্থিত। ইহার পাঠ প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪টার সময় লওয়া হয়।
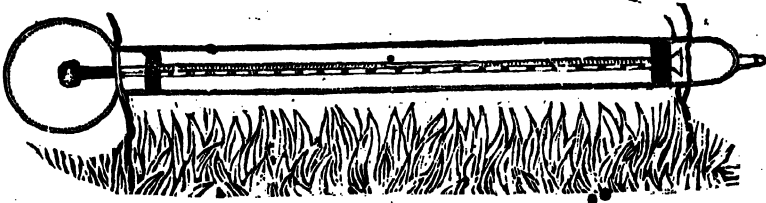
নৈশ ২য় বা তৃণ বিকীরণ তাপমান যন্ত্র (Nocturnal or Grass Radiation)। দিবা কালে সূর্য্য কিরণে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়। এবং সূর্য্য অস্তগত হইলে সেই উত্তাপ পৃথিবী হইতে শূন্য বিক্ষিপ্ত হয়। এবং ভূতলস্থ সকল দ্রব্যই তদ্রূপ উত্তাপ শূন্য হইতে থাকে। রাত্রে যত বায়ু অধিক বাষ্প শূন্য পরিষ্কার অর্থাৎ মেঘ ও জোর-বাতাস শূন্য থাকে বিকীরণ তত উত্তমরূপে হইয়া থাকে। এবং আকাশ মেঘাবৃত থাকিলে, বিকীরণ কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা হয় না, বরং মেঘ হইতে উত্তাপ পৃথিবীর দিকে বিক্ষিপ্ত হয় এই জন্য আকাশ মেঘাবৃত থাকিলে গ্রীষ্ম বোধ হয়, শীতকালে ইহা বিশেষ রূপে অনুভব করা যায়। আবৃত স্থানে বিকীরণ উত্তম রূপে হয় না সেই জন্য শীতকালে রাত্রিতে পথ চলিবার সময় কোন বড় গাছের তলায় যাইবা মাত্র গরম অনুভব হয়। তাহার কারণ এই যে তথায় বিকীরণ ভালরূপে হইতেছে না। বিকীরণ আরম্ভ হইবামাত্র ভূতলস্থ সকল দ্রব্যই শীতল হইতে থাকে, এবং ভূমি বায়ু অপেক্ষা শীঘ্র শীতল হয় এবং বায়ু তৎস্পর্শে শীতল হয়। এই শৈত্যের পরিমাণ করিতে হইলে কেবল ভূমির উপর একটি তাপমান যন্ত্র রাখিলে হয় না কারণ তদ্দারা পৃথিবীর উষ্ণতা হেতু যন্ত্রের পাঠ অধিক হয়। সেই হেতু ভূমির উত্তাপ যাহাতে বিকীরণ তাপমান যন্ত্রকে কোন রূপে বিচলিত না করিতে পারে তাহার উপায় স্থির করা উচিত। তজ্জন্য কোন এক অপরিচালক দ্রব্যের উপর এই তাপমান যন্ত্র রাখি[illegible]য়। ইহা তৃণ পত্রাদির ঠিক উপরেই সন্নিবেশিত করিতে হয়, এই সকল দ্বারা যেন না আবৃত থাকে। যে অপরিচালক পদার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা এইরূপে নির্ম্মাণ করিতে হয়। এক ইঞ্চ মোটা এক খানা চতুষ্কোণবিশিষ্ট তক্তা লইয়া তাহার উপর দেশীয় কম্বল চারি পাচ স্তবক দিয়া পেরেক দিয়া আবদ্ধ করিতে হয়। এই কম্বলের গদি ঘাসের উপর রাখিয়া তাহার উপর তাপমান যন্ত্র সমতল ভাবে সন্নিবেশিত করিতে হয়। ভূতল না স্পর্শ করে কেবল ঘাসের উপর সমতল ভাবে রাখিলে চলিতে পারে। তাহা হইলে গদির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অনেক স্থানে সকল সময় ঘাস থাকে না সুতরাং সে স্থানে গদির আবশ্যক হয়।

সুরাবীর্য্য পূর্ণ ন্যূনতম তাপমান যন্ত্র এই নৈশ বিকীরণ তাপ পরিমাণ জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ভাগপত্র দণ্ডের গাত্রেই খোদিত থাকে, এবং সমস্ত দণ্ড একটী নল মধ্যে নির্ব্বাৎ রূপে আবদ্ধ থাকে, কেবল আধার বাহিরে থাকে। বহিস্থ নলের এই প্রয়োজন যে তদ্দারা যন্ত্র অধিক মজবুত হয়। এই নল অনেক সময় নির্ব্বাৎ থাকে না। তজ্জন্য নল মধ্যে শিশির জমে, এবং তদ্দারা ভাগপত্রের চিহ্ন সকল অস্পষ্ট দেখায়, তজ্জন্য এই নল অন্তরিত করিয়া অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কার করিয়া পুনরায় যন্ত্রে সংলগ্ন করিতে হয়। ইহা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সংস্থাপিত করিতে হয় ও প্রত্যুষে ৬টার সময় পাঠ লইয়া ঘরের মধ্যে রাখিতে হয়।

অসভ্য জাতির ঐশিক জ্ঞান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে অসভ্য জাতির প্রথম অবস্থাতে মঙ্গলময় বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর-জ্ঞান আদৌ ছিলনা। এক্ষণে তাহাদের দ্বিতীয়াবস্থায় কি রূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল তাহা প্রদর্শিত হইল। এই দ্বিতীয়াবস্থা পিশাচ-ভয়াবস্থা মাত্র।

২। পিশাচ-ভয়াবস্থা। এই অবস্থায় অসভ্য জাতির মনে অমঙ্গলকর প্রেতত্বে ভয় উদ্ভাবিত হইয়া ছিল এবং কোন অমঙ্গলকর অলৌকিক শক্তির সত্ত্বা অনুমিত হইয়া ছিল। ভোজবাজী বা কোন আশ্চর্য্য যাদুকরী বিদ্যার প্রক্রিয়া যেমন দেখিবামাত্রই তাহার রহস্য-ভেদ করিতে পারা যায় না, অথচ ঘটনাবলী চাক্ষুষ দর্শন করাতে এমন বিশ্বাস করিতে হয় যে কোন অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা ইহা সম্পন্ন হইতেছে, তদ্রূপ অসভ্য জাতিরা কোন আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক ঘটনাবলী দেখিলে হতবুদ্ধি হইয়া তৎপ্রবর্ত্তক একটী অজ্ঞাত শক্তির কল্পনা করিত। অসামান্য ও অসাধারণ ঘটনা দেখিলে তাহারা অজ্ঞানতা বশতঃ তাহার রহস্য-ভেদ করিতে অক্ষম হইয়া, অজ্ঞাত শক্তি-স্বরূপ একটী প্রেত-সত্বার অনুমান করিত—তাহাকে ঐ ঘটনার প্রকৃত কারণ বলিয়া জ্ঞান ও বিশ্বাস করিত।

এই অজ্ঞাত শক্তি প্রকৃতির আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনাবলির কারণ। জিজ্ঞাস্য এই যে, এ শক্তিটী মঙ্গলকর কি অমঙ্গলকর? অসভ্য জাতি ঐ শক্তিকে মঙ্গলকর কি অমঙ্গলকর বিবেচনা করিত? ঐ শক্তিকে ভয় করিত কি ভক্তি করিত? ঐ শক্তিকে অসদাত্মা—প্রেত-স্বরূপ মনে করিত, না সদাত্মা—ঈশ্বর-স্বরূপ জ্ঞান করিত? যদি তাহাদের ইতিহাসে এমন দেখা যায় যে, ঐ শক্তিকে কেবল অমঙ্গল স্বরূপ মনে করিত, কখন মঙ্গল স্বরূপ মনে করিত না, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে অমঙ্গলময় প্রেত-স্বরূপে তাহাদের বিশ্বাস ছিল—মঙ্গলময় ঈশ্বর-স্বরূপে বিশ্বাস ছিল না। আর যদি এমন দেখা যায় যে, ঐ শক্তিকে মঙ্গল দায়ক বলিয়া বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে যে তাহাদের ঈশ্বর স্বরূপে বিশ্বাস ছিল—ঈশ্বরজ্ঞান ছিল। কারণ প্রেত অমঙ্গল স্বরূপ এবং ঈশ্বর মঙ্গল স্বরূপ এই আমাদের ধারণা।

এক্ষণে দেখা যাউক ঐ শক্তি সম্বন্ধে তাহাদের কি জ্ঞান ছিল। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে তাহারা অনক্ষর, মূর্খ, ও সরল স্বভাব। মূর্খ ও বোকা লোকে যেমন যাহা চাক্ষুষ দেখে তাহাই প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করে, কোন কৌশল দ্বারা হইতেছে মনে করে না, কারণ অনুসন্ধান একেবারেই করে না, এবং যদি কদাচ করে তাহা হইলে যে কারণ সহজ-উপলব্ধ তাহাই নির্দ্দেশ করে। অসভ্য জাতিরাও ঐ রূপ মনে করিত। প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে তাহারা অক্ষম, প্রকৃতির রহস্য-ভেদ বা রহস্য নিষ্কাশন করিতে অপারক। বাস্তবিক সভ্য মণ্ডলস্থ ধীসম্পন্ন বহুদর্শী ব্যক্তি ব্যতীত প্রকৃতির

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কখন অন্যাকে সম্ভবে না। অসভ্য জাতি যদি বাস্তবিক প্রকৃতির রহস্য-ভেদ করিতে পারিত তাহা হইলে সভ্য ও অসভ্য জাতির কোন প্রভেদ থাকিত না—বস্তুতঃ প্রকৃতির রহস্য নিষ্কাশনই সভ্য সমাজের ভিত্তিও গৌরব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তাঁহারা যাহা দেখিত তাহাই বিশ্বাস করিত। বৃক্ষে ফল হইয়াছে দেখিল, বৃক্ষ এবং ফলের সত্ত্বা বিশ্বাস করিল। বৃহদাকার পুরাতন বৃক্ষ আজন্মকাল রহিয়াছে দেখিল, আবার দেখিল সেই বৃক্ষ হইতে বিচি ভূমিতে পতিত হইল, পতিত হইয়া অঙ্কুরিত হইল এবং তৎপরে নূতন বৃক্ষ জন্মিল। ইহাতে তাহাদের মনে কি ভাবের উদয় হইল? তাহারা ভাবিল যে বৃক্ষ আপনি জন্মিতেছে, আপনিই বাড়িতেছে, কেহ রোপণ করে নাই—মানব কর্ত্তৃক জন্মায় নাই—আপনিই জন্মিযাছে, আপনিই জন্মিতেছে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে জন্মিতেছে। বৃক্ষে সুস্বাদু ফল ফলিল, ভক্ষণ করিয়া তাহারা পরিতৃপ্ত হইল। ইহাতে বুঝিল যে পরিতৃপ্তকর ফল আপনি জন্মে—মঙ্গলকর খাদ্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আপনি উৎপন্ন হয়, মানব বা অন্য কাহার কত্তৃক হয় না—তাহাদের পরিশ্রম সহকারে হয় না। এজন্য সহজেই তাহাদের এই জ্ঞান উপলব্ধি হইলে যে, উপভোগ্য যাবতীয় দ্রব্য আপনি জন্মায়—জন্মাইবার জন্য কাহার কত্তৃত্ব আবশ্যক নাই। উপভোগ্য সুখকর ও মঙ্গলকর যাবতীয় দ্রব্য যখন আপনি উৎপন্ন হয় এমন জ্ঞান ও বিশ্বাস হইল, তখন উহার কর্ত্তা অনুসন্ধানের—উহার কারণ নির্ণয়ের অল্প বুদ্ধি ও ঋজুস্বভাব অসভ্য জাতির আর আবশ্যক রহিল না—যাহা সামান্যতঃ দেখিল তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট রহিল। বৈজ্ঞানিকের ন্যায় প্রকৃতির রহস্য ভেদ করিবার আর আবশ্যক রহিল না এবং আবশ্যক থাকিলেও তাহারা করিতে অক্ষম। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় তাহাদের বিশ্বাস এই যে, যাহা কিছু মঙ্গলকর দৃষ্ট হয় তাহা সহজ-উদ্ভুত। যখন এই সহজ-জাত মঙ্গলকরের কোন ব্যতিক্রম জন্মে তখন তাহারা মনে করে যে কোন অদৃশ্য ও অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা ঐ ব্যতিক্রম সংসাধিত হইতেছে—কোম মঙ্গল বিরোধী, কোন অমঙ্গলকারী, কোন নৃশংস শক্তি সহজ উদ্ভুত মঙ্গলকর শক্তির স্বাভাবিক গতি প্রতিরোধ করিতেছে—স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, উপভোগ্য যাবতীয় মঙ্গলময় আবশ্যকীয় দ্রব্য স্বতঃপ্রসূত এবং মঙ্গল-প্রতিকূল ঘটনবলী কোন অমঙ্গলকারী অজ্ঞাত শক্তি কর্ত্তৃক সংসাধিত।

স্রোতস্বতী নদী দেখিল, জল প্রবাহ দেখিল, জোয়ার ভাটা দেখিল, ভাবিল যে ইহা নদীর স্বাভাবিক ভাব, যেহেতু ইহা আজন্মকাল দেখিতেছে, অসামান্য বলিয়া মনে কোন উদ্বেগ উপস্থিত হইল না—কারণ অনুসন্ধান করিল না। এই স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম জন্মিল, অমনি তাহাদের মনে হইল যে এই ব্যতিক্রমের কোন কারণ আছে এবং এই কারণ প্রেতাত্মা। চন্দ্র সুস্নিগ্ধ আলোক প্রদান করিতেছে, সূর্য্য রশ্মি ও উত্তাপ দিতেছে দেখিল, কিন্তু জিজ্ঞাসু হইল না, কেননা ইহা সচরাচর ঘটে। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল—চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণ হইল, অমনি মন জিজ্ঞাসু হইয়া নানা প্রকার কারণ কল্পনা করিল। প্রেত সুত্রার তাহাদের বিশ্বাস বদ্ধমূল এজন্য ভাবিল যে প্রেত কত্তৃক ইহা সম্পা-

দিত হইতেছে। সুন্দর মলয় বহিতেছে, তাহাদের গাত্র শীতল হইল। এই ব্যাপারটী দৈনিক ঘটনা ও অভ্যস্ত, এজন্য মনে এমন ভাবের উদয় হইল না যে তাহার কারণ কি? বৃহৎ ঝটিকা হইল—প্রকৃতি আলোড়িত হইল—স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিল, অমনি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিল। প্রকৃতির নিগুঢ় তত্ব বুঝিতে না পারিয়া মনে কল্পনা করিল যে ইহা প্রেত কর্তৃক হইতেছে। শত ধারা বৃষ্টি পতিত হইয়া জলপ্লাবন হইল, মেঘ গর্জ্জন করিল, বিদ্যুৎ হানিল—প্রকৃতি ওলট পালট হইল—সাধারণ সুরম্য ভাবের ব্যতিক্রম জন্মিল, জ্ঞান বিহীন অসভ্য জাতি ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না—না পারিয়া মনে ভাবিল যে প্রেতাত্মা এই প্রতিকুলাচরণ করিতেছে। চন্দ্রমা-সুশোভিত নক্ষত্র-খচিত সুনীল গগণমণ্ডল দেখিল, ইহা প্রত্যহ দেখে, এজন্য মনে কোন দ্বিধা জন্মিল না। ধূমকেতু উঠিল, ইহা সর্ব্বদা উঠে না, মন জিজ্ঞাসু হইল, কারণ অনুসন্ধান করিল। মূর্খতা বশতঃ কিছুই প্রাপ্ত হইল না। মন কুসংস্কার-সিক্ত, প্রেত ভয়ে ভীত, এজন্য-ভাবিল যে ইহা প্রেত-প্রেরিত—কোন অমঙ্গল সাধনের জন্য আসিয়াছে।* যাহা প্রত্যহ দেখা যায় তাহা এক প্রকার অভ্যস্ত হইয়া উঠে, মূর্খ এবং স্থূলদর্শী ব্যক্তি তাহার কারণ অন্বেষণ করে না—সুপণ্ডিত এবং সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিই কেবল তাহার কারণ অন্বেষণ করেন এবং তিনিই কেবল তদুপলব্ধি করিতে পারেন। নিশ্চিন্ত ও অমনো-যোগী ব্যক্তি কারণ দেখিতে পায় না, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি কারণ উদ্ভাবনা করেন। তাহারা প্রতিদিন যে স্বভাব-উপলব্ধ বস্তু ভোগ করিতেছে তাহা আবশ্যক সাধক—মঙ্গলকর। কিন্তু এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার যে ব্যতিক্রম ঘটিতেছে তাহা অনা বশ্যক—অমঙ্গলকর। বায়ুর মৃদু সঞ্চালন, চন্দ্রের আলোক, সূর্য্যের উত্তাপ আবশ্যক ও মঙ্গলকর; চন্দ্র গ্রহণ, সূর্য্য গ্রহণ, বৃহৎ ঝটিকা অনাবশ্যক ও অমঙ্গলকর। কেননা ইহা দ্বারা আলোক উত্তাপ ও সুখ নষ্ট হয়—ইহা সাধারণতঃ স্বভাবের ব্যতিক্রম মাত্র। সভ্য মণ্ডলিতে যে ব্যক্তি স্থূলবুদ্ধি, যিনি বিজ্ঞান আলোচনা করেন নাই, যখন তাঁহার পক্ষে এটী স্বভাবের ব্যতিক্রম বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখন বন্য পশুবৎ কুসংস্কারগ্রস্থ অসভ্য জাতির ঐ ব্যতিক্রমকে অমঙ্গলকর ভাবিবে তাহার অসম্ভাবনা কি?

মানবের প্রকৃতি এই যে, যদি কোন সঙ্কটে বা বিপদে পড়ে, পীড়া বা অন্য কোন অমঙ্গল ঘটনা হয়, তাহা হইলে তাহার উপশমের জন্য চেষ্টা করে। পীড়া হইলে ঔষধ অনুসন্ধান করে, বিপদ হইতে উপায় অনুসন্ধান করে—কারণ পীড়া ও বিপদ স্বভাবের ব্যতিক্রম মাত্র। এটী শুদ্ধ মানবের কোন নিকৃষ্ট পশুদিগের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। তখন এই ভাবটী অসভ্য জাতীয় মানবের থাকিবে আশ্চর্য্য কি? অসভ্য জাতি দেখিল যে তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির পীড়া হইয়াছে—কোন ব্যক্তি মানবলীলা সম্বরণ করিতেছে, অমনি বুঝিল যে এই অমঙ্গল ঘটনা কোন অমঙ্গকর শক্তির কর্তৃত্বে হই-তেছে। যে হেতু তাহাদের বিশ্বাস যে প্রকৃতি মঙ্গলময় ও অনুকুল। যে শক্তি দ্বারা ঐ অমঙ্গল ঘটনা সাধিত হইতেছে তাহা অবশ্য অমঙ্গলময় ও শান্তি প্রতিকুল। এক্ষণে এই অমঙ্গল ঘটনা অপনীত হয় কি রূপে? অমঙ্গল উপশমের দুইটী উপায়—উপদ্রব

ও উপাসনা। বাস্তবিকই অমঙ্গলকার শত্রুনিপাতের এই দুই উপায়—হয় বিকৃত মূর্ত্তিতে শত্রু আক্রমণ কর—না হয় বিনীত ভাবে প্রার্থনা কর। অসভ্য জাতির মধ্যে এমন প্রথা লক্ষিত হয় যে, কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে তাহার নিকট ঘোরতর কোলাহল করে—ভীষণ বাদ্যধ্বনি করে, আবার কখন বা তাহারা উচ্চৈঃস্বরে মধুরতানে গান গায়। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, এবম্বিধ আচরণ করিলে যে প্রেত রোগীকে আশ্রয় করিয়াছে সে পলায়ন করে এবং তজ্জন্য পীড়া আরোগ্য হয়। এই তাহাদের পীড়া নিরূপণ, এই তাহাদের চিকিৎসা তত্ত্ব। অসভ্যজাতির এই প্রথা আমাদিগের বর্ত্তমান সভ্য সমাজেও অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। সূতিকাগারে নব প্রসূত শিশু বা প্রসূতির কোন প্রকার পীড়া হইলে, কুসংস্কার গ্রস্থ লোকে মনে করে যে পীড়িত ব্যক্তিকে ভূতে বা পেঁচোয় পাইয়াছে। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার বা কবিরাজ না ডাকিয়া ভূতের ওঝাকে ডাকে। ওঝা আসিয়া কতক গুলি সরিষা মন্ত্রপূত করিয়া শিশুর গাত্রে সবলে প্রক্ষেপ করে এবং তৎপরে ঝ্যাংড়া কোঁস্তা প্রভৃতির দ্বারা ঐ নিরীহ শিশুকে প্রহার করে। হয় ত ঐ আঘাতেই শিশুর প্রাণত্যাগ হয়। না হয় কোন ভৌতিক ঔষধ বলে আরোগ্য হয়। প্রভুত অসভ্য জাতির প্রেতের কর্তৃত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তাহাদের এই বিশ্বাস যে, ভূতকে যে জয় করিতে পারিবে—যে তাহাকে আপনার অধিনত্বে বা আয়ত্বে আনিতে পারিবে সেই পরম চিকিৎসক, প্রকৃত বৈদ্য এবং পারদর্শী ওঝা। তাহাদের যদি কোন ঈশ্বর-জ্ঞান থাকে তাহা হইলে এই প্রেত-জ্ঞান তাহাদের ঈশ্বর-জ্ঞান, যদি কোন ধর্ম্মচর্য্যা থাকে তাহা হইলে এই প্রেত আয়ত্তাধীন করাই তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান। অসভ্য জাতির এবম্বিধ মানসিক অবস্থাকে পিশাচ-ভয়াবস্থা বা প্রেত-আয়ত্তাবস্থা বলা যায়। এই অবস্থায় তাহারা প্রেতকে স্বীয় কর কবলিত করিতে চাহে, আপনার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাইতে চাহে, পিশাচ-সিদ্ধ হইতে চাহে। পাঠক অবশ্যই আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের গল্প পাঠ করিয়াছেন। পিশাচ সিদ্ধ আলাদিন্ যেমন সেই আশ্চর্য্য প্রদীপ মৃত্তিকায় ঘষিল, অমনি একটী ভূত তাহার আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। কলিকাতা নিবাসী অনেকেরই হোঁসেন খাঁকে মনে পড়ে, প্রায় বিংশতি বৎসর হইল ঐ ব্যক্তি এখানে আসিয়া আশ্চর্য্য ২ ব্যাপার দেখাইয়া গিয়াছে। কোন বস্তু উড়াইতে হইলে সে কেবল সেই বস্তু স্পর্শ করিত, স্পর্শিত বস্তু তুমি যত সাবধানে যেখানেই রাখ না কেন উড়িয়া যাইত। আবার যদি পুনঃ সে বস্তু আনিতে হয় তাহা হইলে সে কেবল মুখে "হজরৎ' "হজরৎ' "হজরৎ" করিয়া ডাকিলেই বস্তুটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইত। আলাদিন বা হোঁসেন খাঁ ভূতকে যেরূপ স্বকার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত আয়ত্তাধীন করিয়া ছিল, অসভ্য জাতি প্রেতকে তাদৃশ আয়ত্তাধীন করিবার জন্য সদতঃ চেষ্টা করিত—তচ্চেষ্টাই তাহাদের ধর্ম্মচর্য্যা। আমাদের চক্ষুতে বাস্তবিক এটী ধর্ম্মচর্য্যা নয়, ডাইন বা যাদুকরী বিদ্যা মাত্র। কিন্তু অসভ্য জাতির পক্ষে এটী প্রকৃত ধর্ম্মচর্য্যা।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যাদুকরী (witchcraft) ভাব ছিল ও এক্ষণে আছে। তাহাদের মনে এ সম্বন্ধের কিরূপ ভাব ছিল তাহা নিম্নে প্রদর্শিত

হইতেছে। অসভ্য জাতির এই ধারণা যে, যদি তাহারা কোন কৌশলে শত্রুর গাত্রের কোন অংশ কিম্বা তাহার ব্যবহৃত কোন বস্তু হস্তগত করিতে পারে, তাহা হইলে তদ্বারা শত্রুকে বশীভূত বা উৎপীড়িত করিতে পারিবে। এজন্য তাহারা শত্রুর গাত্রের মলা, ব্যবহৃত ছিন্ন বস্ত্রের কোন অংশ প্রভৃতি যে সকল বস্তু তাহার গাত্রে সংলগ্ন হইয়াছে তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য সচেষ্ট হইত এবং প্রাপ্ত হইয়া শত্রুকে বশ করিত। যাদুকরী বা বশীকরণ বিদ্যা আমাদের দেশেও এক সময়ে প্রাদুর্ভাব ছিল। এ সম্বন্ধে নানা প্রকার পুঁথি নানা পুস্তক গ্রথিত হইয়া ছিল, বস্তুত বশীকরণ বিদ্যা ফলিত জোতির্ব্বিদ্যা (Astrology) বা গূঢ় রসায়ন বিদ্যার (Aechemy) ন্যায় একটী বিদ্যা বিশেষ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিল। কামরূপ কামিক্ষা এ বিদ্যার আধার স্থল। বশীকরণ যাদুকরণ এবং "বাণমারা" প্রভৃতি এক্ষণেও আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অশিক্ষিত স্ত্রীলোক এবং মূর্খ, নিকৃষ্ট জাতীয় পুরুষের মধ্যে অদ্যাবধিও লক্ষিত হয়। আমাদের দেশস্থ ভদ্র মহিলা বা নীচ বংশজ যে কোন স্ত্রীলোকে জিজ্ঞাসা করিলে বা তাহাদের আচার ব্যবহার পরীক্ষা করিলেই সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি জানিতে পারিবেন যে তাহাদের যাদুকরী শক্তিতে বিশ্বাস আছে। কোন স্ত্রীলোক মৃত-বৎসা হইলে সুপ্রসূতির গাত্রের মলা, গাত্র মর্দ্দনাবশিষ্ট হরিদ্রা, গাত্রের ঘাম, চর্ব্বিত তাম্বুলের অবশিষ্টাংশ, মস্তক হইতে দুই এক গাছী বা গুচ্ছ কেশ, ব্যবহৃত বস্ত্রের শেষভাগ প্রভৃতি অতি গুপ্তভাবে সংগ্রহ করিয়া থাকে; অকস্মাৎ ক্রীড়াচ্ছলে তাহার পিটে কিল মারিয়া থাকে। এই সকল বস্তু আহরণ করিয়া মন্ত্র দ্বারা "তুক" করে অর্থাৎ সুপ্রসূতা স্ত্রীলোকের [illegible] মৃত-বৎসা স্ত্রীর দোষের সহিৎ বিনিময় করে। সুপ্রসূতার গুণকে আয়ত্তাধীন করা এই প্রকরণের উদ্দেশ্য।

পলিনেসিয়া দ্বীপবাসী দিগের সম্বন্ধে উইলিয়মস্ বলেন যে তাহারা শত্রুকে দমন করিবার জন্য তাহার গাত্র-স্পর্শিত কোন বস্তু সংগ্রহ করিত। নখরের পরিত্যক্ত অংশ, চুলের গোছা, মুখের থুতু, কিম্বা শরীরের অন্য কোন ক্লেদ, তদভাবে খাদ্যের অবশিষ্টাংশ আহরণ করিত। তাহাদের এই বিশ্বাস যে প্রেত এই সকল গাত্র নিসৃত বা ত্যক্ত বস্তু অবলম্বন করিয়া মানব শরীরে প্রবেশ করে।

নিউজিলণ্ড দ্বীপ নিবাসী সম্বন্ধে টেলর লেখেন যে তাহাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি অপরকে যাদু করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহার গাত্র স্পর্শিত বা সংলিপ্ত কোন বস্তু আহরণ করিতে চেষ্টা করে। যথা, চুল, বস্ত্রের শেষাগ্রভাগ, উচ্ছিষ্ট খাদ্যের অংশ ইহা প্রাপ্ত হইলে কতক গুলি মন্ত্র পড়িয়া তাহাকে মৃত্তিকার ভিতর পুতিয়া ফেলে। তাহাদের বিশ্বাস যে কাল সহকারে যেমনি ঐ কবরস্থ বস্তু ধংস হয়, অমনি ঐ বিপক্ষ ব্যক্তি মরিয়া যায়। লক্ষিত শত্রু যদি এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারে তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে মরিয়া যায়, মরিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? যাদুকরণে অসভ্য জাতির এত দৃঢ় বিশ্বাস ও ভয় যে তদ্বিষয় ভাবিয়া ২ সে শুষ্ক হইয়া পড়ে এবং অবশেষে অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয়। কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি যাদু করে সে তিন দিবস উপবাস করিয়া চতুর্থ দিবসে পারণা করে এবং তাহার লক্ষিত শত্রু ও অমনি মরিয়া যায়।

ফিজিয়ান্ জাতি সম্বন্ধে সীমান্ বলেন যে যদি প্রকাশ্য যুদ্ধ বা লুকাইয়া বিষ দ্বারা তাহারা কোন শত্রুর প্রাণ বিনাশ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহারা ঐ শত্রুর প্রাণ সংহারের ভার একটী ওঝার হস্তে ন্যস্ত করে, এবং ন্যস্ত করিয়া এই কথাটী সকলের নিকট ঘোষণা করে। তদনন্তর ওঝা ঐ শত্রুর ব্যবহৃত কোন বস্তুর অন্বেষণ করে। ঐ বাঞ্ছিত বস্তু আহরণ করিয়া কতক গুলি শুষ্ক পত্রের সহিত একত্রিত করিয়া পোড়াইয়া ফেলে। যদি ওঝা একজন পারদর্শী পিশাচবিদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হন, তাহা হইলে যে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ঐ "তুক" করা হইয়াছে, সে প্রেতাশ্রিত হইয়াছে মনে করিয়া সর্ব্বদা ভয়ে কম্পিত হইতে থাকে, দুর্ভাবনায় শরীর জীর্ণ হয়, এমন কি অবশেষে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়। যাদুকৃত দশ জন লোকের মধ্যে নয় জন প্রেত ভয়ে আকুল হইয়া পীড়াগ্রস্থ হয় এবং অবশেষে হয় ত মরিয়াও যায় এমন অনুমিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রেত ভয় এত অধিক যে চোর ধরিবার জন্যও এরূপ যাদুকরী প্রণালী অবলম্বন করে।

অসামানিয়া জাতির সম্বন্ধে বনউইক বলেন যে যদি তাহারা শত্রু নিপাত সংকল্প করে,তাহা হইলে তাহার ব্যবহৃত কোন বস্তু সংগ্রহ করে। ঐ সংগৃহীত বস্তুকে চর্ব্বি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া অগ্নির উত্তাপের নিকট রাখে, যেমন উত্তাপে চর্ব্বি 'আবৃত বস্তুটী গলিয়া যায়, তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে তেমনি শত্রুর শরীর ক্ষয় পায়।

উত্তর আমেরিকার অসভ্য জাতিদের এই বিশ্বাস যে শত্রুর মস্তকের কেশ পাইলে তাহাকে আয়ত্তাধীন করিতে পারা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও এই বিশ্বাস ছিল। লিভিং-ষ্টন বলেন যে ঐ প্রদেশের মাকলোলো নামা এক [illegible]তির প্রথা এই যে যদি তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কেশচ্ছেদন করে,তাহা হইলে সে অতি সাবধানের সহিত কেশ গুলিকে হয় পোড়াইয়া ফেলে নতুবা মৃত্তিকার মধ্যে পুতিয়া ফেলে, কারণ তাহাদের এই ধারণা যে যদি ইহা কোন শত্রুর হস্তে পতিত হয়, তাহা হইলে ঐ শত্রু যাদুকরী বিদ্যার দ্বারা তাহার শিরঃপীড়া উৎপাদন করিয়া দিবে।

ইউরোপেও একাদশ খ্রীষ্টাব্দে পিশাচ ভয়ের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। কথিত আছে যে কএক জন য়িহুদীর বিসপ ইবারহর্ডের প্রতি আক্রোশ হইয়া ছিল। তাহারা ঐ বিসপের একটী মমের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া খ্রীষ্ট সংস্কার করে এবং তৎপরে তাহাকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া নষ্ট করে। বিসপের প্রতিমূর্ত্তি নষ্ট হওয়াতে তিনিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। সে সময়ে লোক সাধারণের প্রেতের কর্তৃত্বে অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল। য়িহুদী কর্তৃক বিসপের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া রাজা তাহাদিগকে দণ্ডাজ্ঞা দেন। লর্ড কেমস বলেন যে কাথারিন রাজ্ঞীর সময়ে যাদুকারের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। তখনকার লোকের সাধারণ রীতিই ছিল যে যদি তাহারা কোন শত্রুকে কষ্ট দিবার সংকল্প করিত, তাহা হইলে ঐ শত্রুর একটী মম নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিত। ঐ মমের পুত্তলিকাকে হয় অগ্নির উত্তাপে রাখিত নাহয় তাহার গাত্রে সূচী বিদ্ধ করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে মম পুত্তলিকাকে পীড়ন করিলে শত্রুর গাত্রে ঐ উৎপীড়ন যথাযথ উৎপন্ন হইবে—শত্রু কষ্ট পাইবে।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে অসভ্য জাতির অমঙ্গলকর প্রেতত্বে বিশ্বাস ছিল—যাহা

কিছু অবৈধ ও অশুভ ব্যাপার ঘটিত সে কেবল প্রেত কর্ত্তৃক। ঐ প্রেতকে আয়ত্তাধীন করা তাহাদের বিশেষ চেষ্টা, কারণ আয়ত্তাধীন করিতে পারিলে পীড়া প্রভৃতি না না অমঙ্গলকর ব্যাপার আর ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। এক্ষণে আরও প্রদর্শিত হইল যে তাহারা শত্রুকে বশ বা আয়ত্তাধীন করিবার জন্য চেষ্টা করিত। এজন্য তাহার ব্যবহৃত বা স্পর্শিত কোন দ্রব্য আহরণ করিত। এমন কি যদি কোনক্রমে তাহা না পাওয়া যাইত, তার লক্ষিত শত্রু যে বস্তুতে সত্যাধিকারি তাহা সংগ্রহ করিত। ঐ সংগৃহীত বস্তু দ্বারা বশীকরণ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। ঐ সংগৃহীত বস্তু দ্বারা প্রেতকে আয়ত্তাধীন করিতে চেষ্টা করিত। প্রেতকে আয়ত্তাধীন করিয়া তদ্বারা শত্রুকে দমন করিত। ক্রমে কালসহকারে ঐ শত্রু এবং প্রেত বশীকরণ ভাবটী প্রবল হয়। ঐ ভাবটী প্রবল হওয়াতে ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড, কাষ্ঠ খণ্ড প্রভৃতি যাহা কিছু সম্মুখে দেখিতে পাইত তাহাকেই মনে করিত যে ইহাতে বশীকরণ শক্তি আছে—ইহার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। ঐই বিশ্বাসটী কাল পরম্পরায় প্রবলতর হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির পীড়া হইল। শীলাখণ্ডের দ্বারা একটী "টোট্‌কা" করিল—সে শীলা খণ্ড আপনার নিকটে রাখিল—গাত্রে ধারণ করিল। তাহাদের বিশ্বাস অটল—পীড়া উপশম হইল। পুনঃ পীড়া হইলে ঐ রূপ করিল সেবারও পীড়া আরাম হইল। এই প্রকারে বারম্বার শীলাখণ্ড ধারণ করিতে লাগিল। কোন বার আরোগ্য হইল, কোন বার বা হইল না। তবে ঔষধে ভক্তি অচলা থাকায় অধিক লোকই আরোগ্য হইল, এবং অল্প লোকই আরোগ্য হইল না। যে স্থলে আরোগ্য হইল না সে স্থলে টোট্‌কার প্রতি অবিশ্বাস না করিয়া ভাবিল যে টোট্‌কা ধারণে অবশ্য কোন দোষ ঘটিয়া থাকিবে, নতুবা ইহার ফল ফলিল না কেন? টোটকাতে তাহাদের বিশ্বাস হইতে আরম্ভ হইল এবং কাল সহকারে ঐ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল। টোটকায় অসভ্য জাতির কেন, সুসভ্য ভারতবাসীদের অদ্যাবধি বিশ্বাস আছে। আমাদিগের কোন শিশুর জ্বর, প্লীহা, বা উদরের পীড়া হইলে তাহার মাতা হয় একটী মাদুলি তাঁহার গলদেশে না হয় কটিদেশে ধারণ করাইয়া দেয়। কোন যুবা বা প্রৌঢ়ের অম্ল, শূল, যক্ষ্মা, কাশ প্রভৃতি নিদারুণ ব্যাধি হইলে, একটি মাদুলি বা কবচ গলদেশে বাহুতে কিম্বা কটিদেশে ধারণ করাইয়া দেয়। স্ত্রীলোক বন্ধ্যা বা মৃতবৎসা বা রুগ্ন হইলে, অমনি রামকবচ বা নৃসিংহকবচ ধারণ করিয়া দেয়। ঐ মাদুলি বা কবচের মধ্যে হয় কোন বৃক্ষ বা লতার মূল, ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ থাকে, না হয় ব্রাহ্মণ প্রদত্ত ভূর্জ্জপত্র লিখিত কোন মন্ত্র থাকে। ফলতঃ কবচ বা মাদুলি সাধারণতঃ ধারণ করিয়া থাকে। ইহার উদ্দেশ্য কি? পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করাই উদ্দেশ্য। মূর্খ পুরুষ এবং অশিক্ষিত স্ত্রীলোক দিগের এই ধারণা যে, মৃতবৎসা স্ত্রীলোক প্রেত দ্বারা আক্রান্ত। প্রেতকে দূর করাই ইহার ঔষধ। মাদুলি বা কবচে প্রেত দূরকরণের শক্তি আছে, অতএব মাদুলি বা কবচই এই রোগের প্রকৃত ঔষধ। শিশুর পীড়া হইল, একটী অমঙ্গলকর শক্তির আবির্ভাব হইল, ঐ পীড়ারূপ অমঙ্গলকর শক্তি অপনয়ন করাই প্রকৃত ঔষধ। যুবকের অচিৎস্য রোগ হইল—রোগ স্বরূপ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইল,

একটী নৃশংস শক্তি দ্বারা আক্রুষ্ট হইল, ঐ অমঙ্গলকর শত্রু নির্যাতনই ইহার ঔষধ। এই রোগ অপনয়ন জন্য অর্থাৎ আক্রামক শত্রুকে তাড়াইবার জন্য মাদুলি বা কবচ ব্যবহার হইয়া থাকে। এই রূপ অসভ্য জাতি মাদুলি বা কবচের পরিবর্ত্তে (কারণ ইহা তাহাদের ছিল না) শীলাখণ্ড, কাষ্ঠখণ্ড, প্রভৃতি যে কোন দ্রব্য হউক না কেন ব্যবহার করিত। তাহাদের বিশ্বাস অধিকতর থাকাতে অধিকাংশ লোক আরোগ্য লাভ করিত। এজন্য ইহার ফলোৎপাদক শক্তিতে ক্রমশঃ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইবে তাহার বিচিত্র কি ? একে ত তাহাদের বিশ্বাস যে যাবতীয় অমঙ্গল ঘটনা প্রেত কর্তৃক হয়, তাহার উপর আবার রোগ প্রপীড়িত হইয়া প্রস্তর খণ্ডের অসামান্য আরোগ্যকারী ক্ষমতা দেখিল। ইহা দেখিয়া মনে করিল যে ঐ শীলা খণ্ডের প্রেত অপনয়ন করিবার অত্যন্ত ক্ষমতা আছে—ইহা দ্বারা প্রেতকে আয়ত্তাধীন করা যায়। শিক্ষিত সভ্য সমাজে যখন এই ভাব বর্ত্তমান আছে, তখন পশুসম বন্য অসভ্য জাতির ঐ ভাব থাকিবে তাহার আশ্চর্য্য কি ?

প্রাণী মাত্রেরই ভয় আছে, অসভ্য মানবেরও ভয় আছে, ভয় স্বাভাবিক বৃত্তি, তবে কাহার ভয় অধিক, কাহারও অল্প এই মাত্র প্রভেদ। সাহস ভয়ের বিপরীত ভাব। যে পরিমাণে সাহস অধিক থাকে, সেই পরিমাণে ভয় অল্প হয়। কেহবা স্বভাবতঃ অধিক-তর সাহসী। যাঁহারা অল্প সাহসী, উপায় বিশেষের দ্বারা তাহাদের সাহস বৃদ্ধি করা যায়। মনের মধ্যে ভয়ের যে কারণ আছে তাহা যদি দূর করা যায় তাহা হইলে সাহস বৃদ্ধি হয়। বাস্তবিক সাহস বৃদ্ধির এইটী বৈজ্ঞানিক রহস্য। আমাদের মধ্যে অশিক্ষিত লোক যদি প্রেত-বিভীষিকা দেখে তাহা হইলে ভয় নিবারক এবং সাহসউদ্দীপক মাদুলি ব্যবহার করিয়া থাকে। বন্য অসভ্য জাতির মধ্যে ঐ প্রকার ব্যবহার প্রচলিত থাকিবে তাহার আর কথা কি ? তাহারা কার্য্যকারণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, দ্রব্যগুণ বুঝিতে না পারিয়া, প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া যে কোন দ্রব্যকে প্রেত-ভয়-নিবারণী-শক্তি প্রদ মনে করিত। শীলা খণ্ড কাষ্ঠ খণ্ড তাহাদের ভয় নিবারণের কারণ বলিয়া গ্রাহ্য হইত। তাহাতে যাদুকরি বা বশীকরণ শক্তি নিহিত আছে বিবেচনা করিত, এজন্য ঐ সকল বস্তু তাহাদের যত্নের সামগ্রী বলিয়া পরি-গৃহীত হইত।

অসভ্য জাতির মনের এই প্রেত বিভীষিকাবস্থা—এই পিশাচ ভয়াবস্থাকে কেহ কেহ ধর্ম্ম ভাবের অঙ্কুরমাত্র বিকাশ অনুমান করেন ; এই শীলাখণ্ড, কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতি সংগ্র-হকে ধর্ম্মচর্য্যার অমার্জ্জিত আদিম অবস্থা বলেন। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পরিব্রাজক ডি ব্রোসেস্ (De Brosses) আফ্রিকা খণ্ডে ভ্রমণ করিতে গিয়া নিগ্রো জাতির মধ্যে দেখিলেন যে, তাহারা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোষ্ট্র সংগ্রহ করিতেছে এবং কেহ ২ বা যত্নের সহিত স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ঐ গুলিকে বাটীর কোন স্থান বিশেষে রাখিয়াছে অথবা গাত্রে ধারণ করিয়াছে। তিনি অমনি বিবেচনা করিলেন যে তাহাদের এই গুলি দেবতা—এই গুলি ঠাকুর। আমরা যেমন কবচ বা মাদুলি অভ্যন্তরস্থ সংগৃহীত বস্তুকে ঔষধি বলি, তেমনি তাহারা ঐ সংগৃহীত শীলাখণ্ড, কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতিকে "ফেটিস "(Fetiches)বলিত।

ডি ব্রোসেস্ তাহা জ্ঞাত হইলেন এবং বুদ্ধি ভ্রমে প্রচার করিলেন যে তাহাদের ধর্ম্ম ফেটিস্ পূজা (Fetichism) লোষ্ট্র খণ্ড গুলি তাহাদের দেবতা। থিওডোর পারকার প্রভৃতি অনেক ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন যে, পৃথিবীর আদি মানব বন্য অসভ্য ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের ঈশ্বর জ্ঞান ছিল; যদিও তাহাদের আচারব্যবহার পশুবৎ বিবেচনা হয় বটে, তত্রাচ তাহাদের ধর্ম্ম-জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্য্যা ছিল, অসভ্যতা হেতু ধর্ম্মচর্য্যা পরিশুদ্ধ হয় নাই এবং এই ধর্ম্মের নাম প্রকৃতি পৌজিক ধর্ম্ম (Fetichism) বলিলে বলা যায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে,এই প্রস্তর খণ্ড তাহাদের দেবতা বা ঠাকুর নয়। একটী প্রস্তরখণ্ড ঠাকুরও হইতে পারে এবং শুদ্ধ প্রস্তর খণ্ডও হইতে পারে। কিন্তু এই বস্তুকে ঠাকুর বলা এবং প্রস্তর খণ্ড বলা সম্পূর্ণ প্রভেদ অর্থ। এই প্রভেদ উপলব্ধি করা স্থূল দর্শীর কার্য্য নয়,ইহা কেবল সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। কোন বস্তুকে ঠাকুর বলিলে বুঝিতে হইবে যে সে বস্তুটী শ্রদ্ধার পাত্র, ভক্তির পাত্র, উপাসনা বা আরাধনার পাত্র। শুদ্ধ তাহাই নয়, সেই বস্তুতে ঈশ্বরেব ভাব বর্ত্তমান থাকিবে—বস্তুটী সর্ব্বজ্ঞ,সর্ব্ব-শক্তিমান ও সর্ব্বমঙ্গলময় সৃষ্টি,স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, উপাসকের এমন বিশ্বাস থাকিবে। কোন বস্তুকে যদি ঈশ্বর গুণ বিশিষ্ট ভাবিয়া ভক্তি করিতেছে দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এটী ঠাকুর। কিন্তু যদি দেখা যায় যে ইহা জাদুকরী ক্ষমতা লাভের জন্য আহরণ করিতেছে এবং তাহার দ্বারা জাদুকরী কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে,আলাদিনের প্রদীপের, হাতেমতাইয়ের পরেশ পাথরের (Talisman) ন্যায় কার্য্য উদ্দেশে ব্যবহৃত হইতেছে, কিম্বা মাদুলি বা কবচের মত ব্যবহার করিতেছে, তখন তাহাকে ঠাকুর বলিয়া বিবেচনা করা নিতান্ত ভ্রম—জাদুকরী প্রস্তর বলিয়া বিবেচনা করা বিচারসিদ্ধ। উদ্দেশ্য অনুসারে দেবাদেব বিবেচনা। ফেটিস্ বস্তুতে দেব ভাব কিছুই নাই, তবে ইহাকে দেবতা বলি কেন ?

এক্ষণে দেখা যাউক যে অসভ্য জাতির ফেটিস্ সম্বন্ধে কি ভাব। নিগ্রো জাতি মনে করে যে ফিটিস্ প্রেতের স্বরূপ। এই ফেটিস্‌কে হস্তগত বা আয়ত্তাধীন করিতে পারিলে ঐ প্রেতাত্মাকে আয়ত্তাধীন করা হয়। ফেটিসকে দখলে রাখিতে পারিলে প্রেতকে চাকর স্বরূপ করিয়া আজ্ঞাধীন করা হয় এই তাহাদের বিশ্বাস। কোন কার্য্য করিতে হইলে প্রগাঢ় বিশ্বাসে বিহ্বল হইয়া ফেটিসের নিকট তাহাদের মন্তব্য ব্যক্ত করে এবং তাহাতে স্বকার্য্য সুসম্পন্ন হয় তদুদ্দেশে তাহাকে অনুরোধ করে। যদি কার্য্য সমাধা না হয়, তাহা হইলে ঐ ফেটিসকে প্রহার করে। তাহাদের বিশ্বাস এই যে ফেটিসকে প্রহার করাতে প্রকৃত প্রেতকে তাড়না ও প্রহার করা হইল কারণ ফেটিস্ প্রেতের স্বরূপ মাত্র। *

* Now, it seems to me that Fetichism is an sxtension of this belief (witchcraft). The Negro supposes that the possession of a fetich representing a spirit makes that spirit his servant. We know that

উত্তর আমেরিকাস্থ রেড়স্কিন নামক ইণ্ডিয় জাতির সম্বন্ধে ক্যাটলিন্ বলেন যে তাহারা প্রত্যেকে প্রথম অবস্থায় এক একটী "ঔষধি থলি" সঙ্গে রাখে। তাহাদের বিশ্বাস যে এই থলি তাহাদের আপদ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে। ঐ থলিটী এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে; কোন বালকের ১৪।১৫ বৎসর বয়ক্রম হইলে সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দূরস্থ কোন নিভৃত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে বা অরণ্যানিতে ভ্রমণ করে। সেখানে দুই তিন চারি, পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত ভূমিতে শয়ন করিয়া নিবিড়চিন্তা করে এবং এতাবৎ কাল কিছু আহার করে না। যতক্ষণ পারে ততক্ষণ জাগরিত থাকে কিন্তু যখন নিদ্রা যায় এবং নিদ্রাতে প্রথম যে জাতীয় জন্তুকে স্বপ্নে দেখে সেই জন্তু তাহার "ঔষধ" হয়। নিদ্রাভঙ্গ হইলে তৎক্ষণাৎ সেই স্বপ্নদৃষ্ট একটী জন্তুকে শরবিদ্ধ করিয়া হত্যা করে এবং ঐ জন্তুর চামড়া লইয়া একটী ব্যাগ বা থলি প্রস্তুত করে। এই থলিটীকে ঔষধ থলি কহে। তাহার বিশ্বাস্ যে এই থলি আপদ বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে,এজন্য ইহাকে সময়েং বলি প্রদান করে। এটী তাহার ফেটিস স্বরূপ। ফেটিশ নিগ্রোর বাঞ্ছিত কার্য্য সমাধা করিতে অক্ষম হইলে যেমন সে সতত পরিত্যজ্য, রেঙস্কিন জাতির ব্যাগ সে রূপ নয়। পূর্ব্বতন গ্রীক জাতির যেমন ঢাল, আধুনিক যোদ্ধার যে রূপ তরবারি সহচর স্বরূপ ব্যবহার হয় তাহাদের সম্বন্ধে ঐ থলিটীও সেইরূপ।

কলম্বিয়া নিবাসী ইণ্ডিয়া জাতিরাও চতুষ্পদ জন্তুর পক্ষীর বা মৎস্যের ক্ষুদ্রং পুত্তলিকা রাখিত। তাহাদের বিশ্বাস যে এ পুত্তলিকা সকল পীড়ার কারণ। যখন কোন ব্যক্তি পীড়িত হইত, তখন তাহাদিগকে এক সঙ্গে প্রহার করিত তাহাদের মধ্যে যাহার অগ্রে দন্ত বা নখর ভাঙ্গিয়া যাইত তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিত।

মাডাগাস্কার দ্বীপ নিবাসীরা তাহাদের প্রত্যেকের উত্তর দিকের বাটীর ছাদে একটী ছোট ঝুড়ি সজ্জিত রাকিত, তাহার মধ্যে একটী ফেটিস্ থাকিত এই ফেটিসটী কাষ্ঠ বা প্রস্তর খণ্ড, একটী বৃক্ষের পত্র বা পুষ্প মাত্র। ইহাকে গার্হস্থ "সাম্পি" অর্থাৎ জাদুকরি

---

the negroes beat their fetich if their prayers are unanswered, and I believe they seriously think they thus inflict suffering on the actual deity. Thus the fetich cannot fairly be called an idol. The same image or object may indeed be a fetich to one man and an idol to another; yet the two are essentially different in their nature. An idol is, indeed, an object of worship, while, on the contrary, a fetich is intended to bring the diety within the control of man—an attempt which is less absurd than it at first sight appears, when considered in connection with their low religious ideas. If then, witchcraft be not confused with religion, as I think it ought not to be, Fetichism can hardly be called a religion; to the true spirit of which it is indeed entirely opposed.—Sir John Lubbock, Bart. M. P. F. R. S.

পদার্থ বলিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে ইহা দ্বারা তাহারা আপদ বিপদ হইতে উদ্ধার হয়।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ফেটিস্‌চর্য্যা একটী ধর্ম্ম বিশেষ নয়, বাস্তবিক তাহাতে ধর্ম্মচর্য্যার কোন লক্ষণ নাই। বস্তুত এটী বিধর্ম্ম আচরণ মাত্র এটী জাদুকরী ব্যবহার মাত্র। এই অবস্থায় কেবল পিশাচে ভয়—পিশাচে বিশ্বাস—জাদুকরী ব্যবহারে যত্ন ও আস্থা, জাদুকরী ব্যবহারে অনুরাগ মাত্র। এই অবস্থায় দেউল বা দেবালয় মস্‌জিদ্ বা মন্দির, ঠাকুর বা মূর্ত্তি, পুরোহিত বা আচার্য্য, উপহার বা নৈবিদ্য, ধর্ম্মচর্য্যা বা সদাচার, প্রার্থনা বা প্রণাম, স্তব বা স্তুতি, কৃতজ্ঞতা বা ভক্তি, পূজা বা পদ্ধতি; আরাধনা বা ধ্যান কিছুই ছিল না ঐশ্বরিক জ্ঞান নির্ব্বাচক চিহ্ন কিছুই ছিল না। বিশ্বসৃষ্টি পরজন্ম, পূর্ব্বজন্ম, আত্মা, বিবেক স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, পরকাল, পুণ্যের পুরস্কার, পাপের তিরস্কার প্রভৃতি বিষয়ের আদৌ জ্ঞান বা বিশ্বাস ছিল না। মানব কি, কোথা হইতে আসিয়াছে, কি জন্য জন্মিয়াছে, কোথায় বা যাইবে, কি বা কর্ত্তব্য, বিশ্বই বা কি, ইহার সৃষ্টি, স্থিতি বা প্রলয় কর্ত্তা আছে কি না ইত্যাদি প্রশ্ন তাহাদিগের মনে কখন প্রবেশ করে নাই। তাহারা কেবল আহার বিহারে রত, গার্হস্থ কার্য্যে ব্যস্ত। অসভ্য জাতির ঐশিক জ্ঞানের দ্বিতীয়াঙ্কে কেবল পিশাচ ভয় মাত্র। ঐশিক ভাবের লেশ মাত্র ছিল না বরং তাহার বিরুদ্ধ ও বিপরীত ভাব লক্ষিত হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

মধুমক্ষিকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সম্প্রতি সিভিল এবং মিলিটারী গেজেটে একজন পত্রপ্রেরক মধুমক্ষিকাবিষে তাঁহার একটী টাটু ঘোড়ার মৃত্যুর বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে একদা তিনি ভ্রমণোপলক্ষে নিজ আবাসস্থল হইতে কয়েক মাইল অন্তরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি কতকগুলি বৃক্ষের নিকটে একটী তাঁবু স্থাপন করেন। অকস্মাৎ একদিন কোন অজ্ঞাতকারণে এক ঝাঁক মধুমক্ষিকা তাঁহার শিবির আক্রমণ করিল; বোধ হয় নিকট-বর্ত্তী বৃক্ষগুলিতে দুএক খানি মধুক্রম ছিল এবং মধুমক্ষিকা-গণ তথা হইতে আগমন করিয়া ছিল। যাহা হউক শিবির মধ্যে দুইটী অশ্ব ও একটী টাটু মধুমক্ষিকাদিগের দ্বারা ভয়ানক-রূপে আক্রান্ত হইল। টাটুটি, উদরে, শরীরের পশ্চাদ্ভাগে ও বোধ হয় জিহ্বাতে-ও হুলবিদ্ধ হইয়া ছিল; একটী অশ্বের পশ্চাৎ পদদ্বয় এত ফুলিয়া ছিল, যে তাহার নড়িবার চড়িবার শক্তি ছিলনা। যাহা হউক তাহাদিগকে ছয় মাইল অন্তরে তাঁহার আবাস স্থলে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় লইয়া যাইবার পরেই তিনি টাটুটিকে একপিণ্ট

উষ্ণ বিয়ার খাওয়ালেন; টাটু কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। কিন্তু সেইদিনই বেলা দুইটার সময় তাহার জ্বর হইল; তখন তিনি তাহাকে আদার রসে উষ্ণ বিয়ার মিলিত করিয়া পান করাইলেন এবং উত্তম শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাকে শয়ন করাইলেন। তাহার অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতে লাগিল এবং যন্ত্রণাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হুল ফুটানর পর হইতে সে আর কিছুই আহার করে নাই। পরদিন বৈকালে ছয়টার সময় কিছুক্ষণ ছটফট্ করিয়া অবশেষে শান্তভাবে টাটুটি প্রাণত্যাগ করিল। অন্য ঘোটক দুইটী যদ্যপি অদ্যাপি জীবিত আছে, তথাপি তাহারা চারি পাঁচ দিনেও সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই; এখনও তাহারা সম্পূর্ণ কর্ম্মাক্ষম আছে। পত্রপ্রেরক তাঁহার টাটুর এইরূপ অপমৃত্যুতে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু ইহা বিস্ময়জনক বা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা নহে; অনেক সময় এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে; উদাহরণ স্বরূপ এইরূপ কয়েকটী বিপজ্জনক ঘটনা আমরা গতবারে বর্ণণ করিয়াছি।

দুই বা ততোধিক মধুচক্র পরস্পরের অনতি-দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত হইলে, উক্ত মধুচক্র সমূহের অধিবাসীদিগের মধ্যে কখন ২ পরম সখ্যভাব কখন ২ বা বিষম শত্রুতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রায়ই সমধিক বলশালী মক্ষিকা-দল, অপেক্ষাকৃত হীনবল মক্ষিকা-দলকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাজিত ও ক্লিষ্ট করিয়া তাহাদিগের পূর্ণভাণ্ডার মধুচক্র অধিকার করিয়া থাকে। এ বিষয়েও মধুমক্ষিকা গণ জীবরাজ মানবের অপেক্ষা অধিক দোষার্হ নহে; অদ্যাপিও এই উনবিংশশতাব্দীর শেষভাগেও, জ্ঞানধর্ম্মসভ্যতাভিমানী মানব নিরাপদে পরদ্রব্য লুণ্ঠন করিতে পারিলে কালবিলম্ব করিতে চাহে না। ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকার ধর্ম্মজ্ঞানও নাই, বিদ্যার বৈদ্যুতিক্ আলোকও তাহার নয়ন অর্দ্ধদগ্ধ করে নাই, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে বলিবার কি আছে? যাহা হউক কখন ২ বিভিন্ন মধুচক্রের মধুমক্ষিকাদিগের মধ্যে মিত্রতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই বন্ধুত্ব প্রায়ই বহুকাল স্থায়ী হয় না; প্রায়ই অল্পদিনের মধ্যে এই মিত্রতাই তাহাদের শত্রুতার প্রধান কারণ হইয়া উঠে। মধুমক্ষিকাগণ মধুক্রম লুণ্ঠন ও মধুক্রম অধিকার এই উভয় কারণেই পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; অর্থাৎ মধুমক্ষিকা দিগের মধ্যে জেঙ্গিস খাঁ ও নেপোলিয়ন, এই উভয়বিধ বীরই দেখিতে পাওয়া যায়; কেহ পরধন লুণ্ঠন করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট কেহ বা পররাজ্যে নিজ অধিকার বিস্তারের নিমিত্তই ব্যগ্র। প্রচুর আহার্য্য ও গৃহনির্ম্মাণসামগ্রী পাইলে মধুমক্ষিকাগণ প্রায়ই পরগৃহলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু কোন ২ মক্ষিকাদল, দুই একবার লুণ্ঠন করিয়া অল্পায়াসে অধিক সামগ্রী লাভ করিয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে; তাহারা মধু ও পরাগ সঞ্চয়ের নিমিত্ত পুনঃ ২ বন অথবা উদ্যান গমনের ক্লেশ স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হয়; অল্প পরিশ্রমে অধিক লাভের আশায় মধুক্রম অন্বেষণের নিমিত্ত বন হইতে বনান্তরে গমন পূর্ব্বক সমস্ত সময় অতিবাহিত করে; অপেক্ষাকৃত হীনবল মধুক্রম দেখিলেই সকলে মিলিয়া উপস্থিত হইয়া তাহা আক্রমণ করে এবং বলপূর্ব্বক মধু ও পরাগ লুণ্ঠন করিয়া আপনাদের মধুচক্রে লইয়া যায়। রাজ্ঞীহীন অথবা অতি হীনবল না হইলে মধুমক্ষিকাগণ প্রাণপণে বিপক্ষ দলের

সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে ; ভীরু কাপুরুষের ন্যায় বিপক্ষকে সহজে আপনাদের অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। কোন বিপক্ষ দল মধুক্রমের নিকট উপস্থিত হইলে অনতিবিলম্বে মধুক্রমের দ্বারদেশে ভয়ানক গোলমাল হইতে দেখা যাইবে ; কর্ণবধির-কারী ভোঁ ভোঁ শব্দে বিপদসংবাদ তাড়িতবেগে মধুক্রমের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচারিত হইবে, জন্মভূমি রক্ষার নিমিত্ত সহস্র মক্ষিকা দ্বারদেশে উপস্থিত হইবে। মক্ষিকাগণ বিপক্ষের দিকে ধাবিত হইবে, এবং জেতৃগণ পরাজিত মক্ষিকা-গণকে টানিয়া লইয়া যাইতে দৃষ্ট হইবে।

মধুমক্ষিকা দিগের যুদ্ধ প্রণালীও অতীব চমৎকার জনক। মক্ষিকারাজ্ঞীদিগের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কখন২ বিভিন্ন মধুচক্রের দুইটী কর্ম্মকরের মধ্যেও দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু একদল মধুমক্ষিকা অপর একদলের মধুক্রম অধিকার করিতে যাইলে প্রায়ই উভয় দলের মধ্যে সাধারণযুদ্ধ উপস্থিত হইয়া থাকে। রোমার মধুমক্ষিকা-দিগের এই প্রকার এক যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষীয় অনেক মক্ষিকা হত ও আহত হয় এবংপ্রায় সমস্ত বৈকালবেলা ব্যাপিয়া এই তুমুল সংগ্রাম হই-য়াছিল। এই যুদ্ধ অতি সুশৃঙ্খল রূপে সম্পাদিত হইয়াছিল ; উভয় পক্ষীয় মক্ষিকাগণ সম্মুখীন হইলে প্রত্যেক যোদ্ধা আপনার সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ; বহুক্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ; অবশেষে জয়ী মক্ষিকাগণ স্ব২ নিহত প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃতদেহ পদদ্বয় দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক কিয়দ্দূর উড়িয়া গিয়া তাহা ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল এবং স্বয়ং সম্মুখের চারি পায়ের উপর ভর দিয়া তাহার নিকটে উপবেশন পূর্ব্বক পশ্চাৎ পদদ্বয় ঘর্ষণ করতঃ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। বিলাতের কোন সংবাদ পত্রে মধুমক্ষিকা দিগের নিম্নলিখিত এক ভয়ানক সংগ্রামের বিবরণ প্রকা-শিত হইয়াছিল। এক ঝাঁক মৌমাছি এক নব অধ্যুষিত মক্ষিকাগৃহের নিকট উড্ডয়ন করিতে২ সহসা অধোগমন করিয়া তাহার উপর উপবিষ্ট হইল ; মধুমক্ষিকায় তাহার চতুর্দ্দিক আবৃত হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে উক্ত মক্ষিকাগণ মক্ষিকাগৃহের দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং সহস্র২ মক্ষিকা গৃহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। ক্ষণকাল পরে উচ্চ গুণ গুণ রবে যুদ্ধবার্ত্তা ঘোষিত হইল ; উভয় পক্ষীয় মক্ষিকাগণ মক্ষিকাগৃহ শূন্য করিয়া আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইল ; নীল নভোমণ্ডল মক্ষিকাজালে আচ্ছন্ন হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল ; বোধ হইল, যেন কোথা হইতে একখানি কপিশবর্ণ মেঘ অকস্মাৎ মস্তকোপরি উপস্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আবৃত করিল। যাহা হউক উভয় পক্ষীয় মক্ষিকাদিগের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল ; তাহাদের নিম্নস্থিত ভূমিভাগ উভয় পক্ষীয় অসংখ্য হত ও আহত যোদ্ধমক্ষিকায় আবৃত হইয়া গেল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর অবশেষে একপক্ষ জয়লাভ করিয়া নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের শাখায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। তথা হইতে ত্যক্ত মক্ষিকাগৃহে অধিষ্ঠিত হইলে, উক্ত মধুমক্ষিকাদল শান্তভাবে নিয়মিত কার্য্য করিতে লাগিল। যখন কোন মধুমক্ষিকাদল পরকীয় মধুক্রম অধিকার করে, তখন তাহারা সর্ব্বপ্রথমে বৃক্ষনির্য্যাস দ্বারা সেই মধুক্রমের জীর্ণ সংস্কার করিয়া তাহা উত্তমরূপে

পরিস্কৃত করিয়া লয়। সমস্ত গৃহগুলি তন্ন ২ করিয়া পরীক্ষা ও মেরামত না করিয়া মধুমক্ষিকাগণ কোন নূতন মধুক্রমে বাস করে না। কিন্তু বুদ্ধিমান মানবকে তাহার গৃহসংস্কার অথবা পতনোন্মুখ গৃহকে ভূমিসাৎ করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত স্থূল বেতনভোগী এক জন রাজ পুরুষের প্রয়োজন!

স্বজাতীয় শত্রু ভিন্ন মধুমক্ষিকা দিগের অনেক শত্রু আছে; সামান্য কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত অনেক প্রাণীই ইহাদের শত্রু। বোলতা, ভীমরুল, গিরগিটা, ভেক, ইন্দুর, নানাজাতীয় পিপীলিকা, মধুমক্ষিকাভোজী পক্ষী বিশেষ, ভল্লুক, লুতা, ও মনুষ্য ইহাদিগের প্রধান শত্রু। বোলতা ও ভীমরুল সুবিধা পাইলেই মধুমক্ষিকার উদর চিরিয়া তাহার সঞ্চিত মধু পান করে। গিরগিটা ও টিক্‌টিকী মধুচক্রের নিকটে যাইয়া স্থির ভাবে অবস্থান করে; যেমন একটী মধুমক্ষিকা তাহার নিকটবর্ত্তী হয়, সে অমনি তাহাকে একেবারে উদরসাৎ করে; এইরূপে কয়েক মিনিটের মধ্যে একটী টিকটিকীকে পাঁচ সাতটী মধুমক্ষিকা ভোজন করিতে দেখা গিয়াছে; মধুমক্ষিকাগণ বোধ হয়, ইহার কিছুই জানিতে পারে না, নতুবা তাহারা এমন শত্রুকে নিরাপদে মধুক্রমের অতি সন্নিহিত স্থানে আসিতে দিবে কেন? ইন্দুর, মধুমক্ষিকার সমীপে অগ্রসর হয় না, কিন্তু সুবিধা পাইলে মক্ষিকাডিম্ব মক্ষিকাগৃহ ও মধু দ্বারা উদরপূর্ণ করিয়া থাকে। বৃহৎকৃষ্ণকায় পিপীলিকা মধুক্রমে প্রবেশ করিয়া মধু ও ডিম্ব আহার করে। ক্ষুদ্র রক্ত বর্ণ পিপীলিকা বিশেষ অনিষ্টকর নহে; সময়ে ২ তাহারা ঝাড়ুদারের কার্য্য করিয়া থাকে।(১) কয়েক জাতীয় পক্ষী, মধুমক্ষিকা আহার করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় হটেণ্টট দেশে এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় পক্ষী আছে; এই পক্ষীগণ অতিশয় মধুপ্রিয়; কিন্তু মধুমক্ষিকার ভয়ে নিকটে অগ্রসর হইতেও সাহস করে না। মধুচক্র দেখিতে পাইলেই ইহারা ভল্লুকের অন্বেষণ করে এবং চীৎকার করিতে২ তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া মৌচাকের নিকট লইয়া যায়; ভল্লুক মধুচক্র ভঙ্গ করিয়া মধুপান করিলে তাহার ভুক্তাবশিষ্ট মধু পরমাহ্লাদে পান করিয়া আপনাদিগকে পরম সুখী জ্ঞান করে। ভল্লুক দিগের ন্যায় মনুষ্যকেও ইহারা মধুচক্রের নিকটে লইয়া গিয়া থাকে। ভল্লুকগণ মধুপান করিতে পাইলে আর কিছুই আহার করিতে চায় না; মধুমক্ষিকাগণ

১ আলিপুর টেলিগ্রাফ্ ষ্টোরের সুপারিন্টেন্ডেণ্ট মিঃ জেঃ সিঃ ডগলাস সাহেবের হস্ত লিখিত পুস্তক হইতে গৃহীত। ইনি একজন অভিজ্ঞ মধুমক্ষিকাপালক। ইতি আলিপুর পশুশালায় ও টেলিগ্রাফ আফিসে কয়েকটী মধুমক্ষিকাগৃহ স্থাপন করিয়া দেশীয় ও ইতালীয় মক্ষিকা পালন করিতেছেন এবং কতকাংশে সফল প্রযত্ন হইয়া নিদর্শন স্বরূপ কয়েক খানি মধুচক্র কলিকাতা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইনি অনুগ্রহ করিয়া মধুমক্ষিকা পালন সম্বন্ধীয় দুই খানি বিলাতি পুস্তক, ও তাহার স্বহস্ত লিখিত মন্তব্য পুস্তক আমাকে পাঠের নিমিত্ত প্রদান না করিলে, বোধ হয় আমি এবিষয়ে অতি অল্পই লিখিতে সক্ষম হইতাম। এতদ্ভিন্ন ইনি অতি আহ্লাদ সহকারে মধুমক্ষিকা পালন সম্বন্ধে আমাকে অনেক বাচনিক উপদেশও প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতার কোনও পুস্তক বিক্রেতার নিকট হইতে আমি উক্ত দুই খানি পুস্তক অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই। সুতরাং আমি ইহার নিকট বিশেষ রূপে ঋণী। এস্থলে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কা, কৃ, ব,

পরম শত্রু ভল্লুককে মধুচক্রের নিকট দেখিতে পাইলেই ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং কখন ২ ভীষণকায় ভল্লুক মধুমক্ষিকাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া মধুপান লালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। কীট-ব্যাধ লুতা মধুচক্রের নিকট ফাঁদ পাতিয়া স্থিরভাবে আপনার অন্তর্দুর্গে অবস্থিতি করে; কর্ম্মকর মক্ষিকাগণ ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে করিতে কখন২ জালে আবদ্ধ হইয়া যায়; জালবদ্ধ অভাগা মক্ষিকা জাল হইতে মুক্তি পাইবার আশায় কিছুক্ষণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া খিন্ন হইলে অতিসুতর্ক লুতা অল্পে অল্পে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আহার করে। মনুষ্যজাতি মধু ও মধুখের প্রত্যাশায় অতি প্রাচীন কাল হইতে মধুমক্ষিকার শত্রুতা করিয়া আসিতেছে। ইহার সবিশেষ বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। এই সকল শত্রু ভিন্ন কতকগুলি ক্ষুদ্রকীট মধুমক্ষিকার পরম শত্রুতা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটী মধুমক্ষিকার গাত্রে সংলগ্ন হইয়া গিয়া তাহাদিগকে মহাকষ্ট দেয়। এক জাতীয় কীট মধুচক্রের ডিম্বগৃহের উপরিভাগে আপনাদের ডিম্ব ত্যাগ করিয়া থাকে; অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ সকল কীটের ডিম্ব হইতে কীট নির্গত হইয়া মধু, মোম, ও পরাগ ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং কখন ২ ইহারা এরূপ প্রবল হয়, যে মধুমক্ষিকাগণ ইহাদের দৌরাত্ম্যে স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র নূতন মধুচক্র নির্ম্মাণ করে। ডেথস্ হেড হক মথ নামে আর এক প্রকার কীট অগ্রে রাজ্ঞীর ন্যায় একপ্রকার শব্দ করিয়া মধুমক্ষিকা-গণকে মুগ্ধ ও জড়বৎ করিয়া ফেলে; পরে সহস্র ২ মধুমক্ষিকার মধ্য দিয়া মধুক্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক নিরাপদে মধু ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে; মধুমক্ষিকাগণ তাহাকে আক্রমণ করা দূরে থাকুক, তাহার নিকট অগ্রসর হইতেও সাহসী হয় না।

মধুমক্ষিকা দিগের সাধারণ সমর ও দ্বন্দযুদ্ধের বিষয় বর্ণিত হইল। এক্ষণে উহাদিগের দুর্গ নির্ম্মাণ প্রণালী বর্ণন করিয়া মধুমক্ষিকার স্বভাবসংস্কারাদি বর্ণণার শেষ করিব। মধুমক্ষিকাগণ স্বীয় বাসস্থান রক্ষণের নিমিত্ত কিরূপ সাহস ও বীরত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে, পাঠকগণ তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। অসভ্য মানব বিপক্ষের আক্রমণ হইতে আপনাকে সুরক্ষিত করিবার নিমিত্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে জানে না; পর্ণাবৃত উন্নত বৃক্ষশাখা বা পর্ব্বত-গুহাই তাহার পরম আশ্রয় স্থল। মানবজাতি সভ্যতার অনেক উচ্চ সোপানে আরোহণ না করিলে দুর্গ প্রাকারাদি নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু মধুমক্ষিকার জ্ঞান স্বভাব-প্রদত্ত মানবজ্ঞানের ন্যায় অর্জ্জিত নহে; ইহাদের মধ্যে সভ্যাসভ্য নাই; সকলের কার্য্যই একরূপ; অতি প্রাচীন কালে মধুমক্ষিকা মধুচক্র নির্ম্মাণে, সন্তান-পালনে, মধু সঞ্চয়ে ও দুর্গ নির্ম্মাণাদি কার্য্যে যেরূপ কৌশল প্রদর্শন করিত,অদ্যাপিও ঠিক সেইরূপ করিয়া থাকে; ইহাদের কিঞ্চিন্মাত্র উন্নতি বা অবনতি হয় নাই। যাহা হউক সুসভ্য মনুষ্য স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানপ্রভাবে, যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, সংস্কারাভিজ্ঞ মধুমক্ষিকা তদপেক্ষা ন্যূন কৌশল প্রকাশ করে না। এক ২ দল মধুমক্ষিকা দুর্জ্জেয় বিপক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত যেরূপ সুকৌশল সম্পন্ন প্রাকারাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, তাহা সন্দর্শন করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সামরিকপূর্ত্তক্রিয়া বিদ্যায় মধু-

মক্ষিকাগণ বর্ত্তমানকালীন মানব অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। যে শত্রুকে হুলবিদ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয় না, তাহারই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত মধুমক্ষিকাগণ প্রাচীরাদির দ্বারা মধুচক্রের দ্বারদেশ সুরক্ষিত ও দুরধিগম্য করে। স্বজাতীয় প্রবলতর শত্রুর হস্ত হইতেও আপনাদিগকে ধনে প্রাণে বাঁচাইবার নিমিত্তও মধুমক্ষিকাগণ এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। শত্রুভয়ে মধুমক্ষিকাগণ কখন ২ মধুচক্রের দ্বারদেশ মধুথ ও বৃক্ষনির্যাস দ্বারা একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলে; কেবলমাত্র আপনাদের গমনাগমনের নিমিত্ত কয়েকটী অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখে; ছিদ্রগুলি এত ক্ষুদ্রাকার করে, যে দুইটী মক্ষিকা তাহার ভিতর এককালে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয় না। ডেথ্‌স্‌হেড্‌মথ্‌ নামক কীটের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত হিউবার সাহেবের মধুমক্ষিকাগণ নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া ছিল।

ডেথ্‌সহেড্‌মথ্‌ নামক কীটের উপদ্রব আরম্ভ হইলে হিউবার তাহাদের লুণ্ঠন নিবারণ করিবার মানসে তাঁহার মক্ষিকাগৃহ সকলের দ্বার এতদূর সঙ্কুচিত করিলেন, যে তদ্বারা মধুমক্ষিকাদিগের গমনাগমনের কোন অসুবিধা হইল না, অথচ তাহাদের প্রবল শত্রুর প্রবেশপথ একেবারে রুদ্ধ হইল; সুতরাং তাহারা মধুহরণাদি কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইল না। কিন্তু হিউবার ভ্রমক্রমে কতকগুলি গৃহের দ্বারদেশ ক্ষুদ্রীকৃত করেন নাই; সেই গৃহগুলিতে মধুমক্ষিকাগণ আপনারাই দ্বার সঙ্কোচ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা বৃক্ষনির্যাস ও মধুথ কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, তদ্বারা গৃহদ্বারের পুরোভাগে এক সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিল; প্রাচীর দ্বারা দ্বারদেশ সম্পূর্ণ রূপে রুদ্ধ করিয়া তাহাতে কতকগুলি ছিদ্র করিল; ছিদ্র গুলি এত ক্ষুদ্র করিয়াছিল যে, তাহার ভিতর দিয়া এক সময়ে দুইটী মাত্র মক্ষিকা গমনাগমন করিতে পারিত সুতরাং তাহাদের পরম শত্রু গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেও সক্ষম হইল না। মধুমক্ষিকাগণ এই প্রাচীর কখন ঠিক দ্বারদেশে কখন কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ভাগে এবং কখন কিঞ্চিৎ সম্মুখভাগে নির্ম্মিত করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র কীট ইঞ্জিনীয়রগণ সর্ব্বসময়ে একরূপ দুর্গ নির্ম্মাণ করে না; যে সময়ে যেরূপ দুর্গের আবশ্যক, সেই সময়ে সেইরূপ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কখন২ কতক গুলি ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত একমাত্র প্রাচীর নির্ম্মাণ করে; কখন২ পাশাপাশি সমান্তর ভাবে অবস্থিত, কতিপয় প্রাচীর নির্ম্মাণ করে; প্রাচীর গুলির অন্তর্বর্ত্তী পথ সকল এরূপ অপ্রশস্ত করে যে দুইটীর অধিক সংখ্যক মক্ষিকা এককালে উক্তপথ দিয়া গমনাগমন করিতে পারে না; প্রাচীর গুলির গাত্রে ক্ষুদ্র২ দ্বার করিয়া থাকে; দ্বারগুলি এরূপ ভাবে কৃত হয়, যে সন্নিহিত কোন তিনটী দ্বার এক সরল রেখাবর্ত্তী হয় না, সুতরাং মধুচক্রে প্রবেশ করিতে হইলে, একদ্বার হইতে অন্য দ্বারে গমন করিবার সময় মক্ষিকাগণকে এক তির্য্যক পথ অবলম্বন করিতে হইবে। যাঁহারা বর্ত্তমান কালের মনুষ্য নির্ম্মিত কোন দুর্গের প্রবেশপথ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা মধুমক্ষিকাকৃত দুর্গের বক্র প্রবেশ পথের সহিত মনুষ্যকৃত দুর্গ দ্বারের সাদৃশ্য দর্শনে নিশ্চয়ই অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। মধুমক্ষিকাগণ উক্ত প্রাচীর গুলি কখন২ খিলান ও স্তম্ভময় করিয়া থাকে;

কিন্তু থিলান ও স্তম্ভগুলি তদ্রূপ ভাবে নির্ম্মাণ করে, যে এক প্রাচীরের থিলান তদ্‌সন্নিহিত প্রাচীরের স্তম্ভের সম্মুখীন হয় সুতরাং প্রবেশপথ বক্র ভাবাপন্ন হয়। অতি আবশ্যক না হইলে মধুমক্ষিকাগণ কখন দুর্গনির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয় না; যে শক্রকে হুলদ্বারা বিনাশ করিতে পারে, তাহার ভয়ে ইহারা কখন দুর্গ নির্ম্মাণ করে না। স্বজাতীয় প্রবল শক্রর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত মধুমক্ষিকাগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাচীরাদি নির্ম্মিত করিয়া থাকে; কিন্তু ছিদ্রগুলি এত ক্ষুদ্র করে যে একটীমাত্র কর্ম্মকর তাহার ভিতর দিয়া গমন করিতে পারে; সুতরাং অল্প সংখ্যক মক্ষিকা ভিতর দিকে প্রহরী স্বরূপে অবস্থিত হইলে তাহারা অবলীলা ক্রমে অতি প্রবলতম শক্রকেও পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। পাঠক! তোমার কি থর্ম্মাপলির গিরিশঙ্কটের বিষয় মনে উদিত হইতেছে না? বীরকুলচূড়ামণি লিওনিডাস্ এক গিরিশঙ্কট আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক, তিনশত মাত্র সংসপ্তক স্পার্টানের সাহায্যে অমিত পরাক্রম পারস্য রাজ্যের শত শত অক্ষৌহিণীর গতিরোধ করিতে অন্ততঃ কিছু কালের জন্যও সক্ষম হইয়াছিলেন; মধুমক্ষিকাগণও সেই প্রকারে সুকৌশল সম্পন্ন প্রাচীরের অন্তরালে অবস্থান পূর্ব্বক আপনাদিগকে প্রবলতর শক্রর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে এবং প্রায়ই সফল-প্রযত্ন হয়। মধুমক্ষিকাগণের বংশবৃদ্ধি হইয়া যখন এক ঝাঁকের পর আর এক ঝাঁক জন্ম ভূমি পরিত্যাগ করিতে থাকে, তখন ঐ প্রাচীরগুলি থাকিলে গমনাগমনের অত্যন্ত অসুবিধা হয় বলিয়া তাহারা ঐ সময়ে প্রাচীরগুলি ভগ্ন করিয়া থাকে এবং দুর্নিবার বিপদ উপস্থিত না হইলে পুনর্ব্বার প্রাচীর নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয় না।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীকৃষ্ণ বসাক।

জড়জগতের নিয়ম আকর্ষণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অপিচ কতকগুলিন বস্তু এমন আছে যে, তাহারা নিত্য একত্রাবস্থান করিয়াও সংযুক্ত হইতেছে না, সুসম্পূর্ণরূপে পৃথকভাবে থাকে; বালুকা, বারুদ চূর্ণাদি ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত স্থল। যে শক্তি প্রভাবে বস্তু সমূহের পরমাণুপুঞ্জ একত্র মিলিত হইয়া সংযুক্ত হয়, সেই যোগাকর্ষণ শক্তি এই পদার্থ নিচয়ের এককালে নাই বলিলেও হয়। একটী বালুকাকণার একগুলির পরমাণু কদাচিৎ অন্যটির পরমাণু স্পর্শ করে, যে তাহারা পরস্পর মিলিত

হয়; সুতরাং সর্ব্বদাই বিচ্ছিন্নাবস্থায় অবস্থান করে; যে সমুদয় কঠিন পদার্থ এই মত স্পর্শ করিয়াও সংযুক্ত হয় না তাহাদিগকে কর্কশ পদার্থ কহে। সচরাচর দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক জলবিন্দু সমীপবর্ত্তী হইলেই সংযুক্ত হইয়া একটী বৃহৎ জলবিন্দুতে পরিণত হয়; দুইখানি কাচ উপর্য্যুপরি স্থাপন করিয়া চাপ দিলে এমনি দৃঢ়রূপে সংযুক্ত হইয়া যায়, যে, পুনর্ব্বার পৃথক করিবার সময় কিঞ্চিৎ শক্তির আবশ্যক হয়; জল, দুগ্ধ এবং সুরা পরস্পরে মিলিত হইয়া একরূপ হইতেছে, অঙ্গুলির অগ্রভাগ কর্ত্তিত হইলে অবিলম্বে সেই কর্ত্তিত অংশ চাপ দিলে সংযুক্ত হইয়া ঠিক পূর্ব্বমত হয়; এই সমুদয়ই যোগাকর্ষণের কার্য্য।

"তরল বস্তুর পরমাণু সমূহ তাহার কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া গোলাকৃতি প্রাপ্ত হয়" এই সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী এবং গ্রহগণও আদৌ দ্রবময় ছিল; যোগাকর্ষণশক্তি-প্রভাবে ক্রমে গোলাকার হইয়া কঠিন হইয়াছে। প্লেটো, টম্‌লিন্সন্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরাও বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা ইহার যাথার্থ সুন্দররূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিম্ন লিখিত দৃষ্টান্তগুলি পাঠ করিলে, উক্ত মত সমর্থন-যোগ্য বলিয়া বোধ হয় সাধারণের প্রতীতি হইতে পারে। সীস-গোলা-ব্যবসায়ীরা গোলা নির্ম্মাণকালে ভূমি হইতে অন্যূন ২৫।৩০ হাত ঊর্দ্ধে একখানি চালনী কৌশলপূর্ব্বক স্থাপন করে, পরে সীসক দ্রব করিয়া সেই উত্তপ্ত দ্রব সীসক চালনীতে ঢালিতে থাকে। চালনীর অসংখ্য ছিদ্র দিয়া তাহা নির্গত হইবার সময় গোলাকার ধারণ করে, এবং পতনমাত্রেই শীতল হইয়া কঠিন হয়। আরও দেখা যায় যে প্রজ্জ্বলিত দীপস্থ তৈলবিন্দু পতনকালে গোলাকার ধারণ করে; সুতরাং এক্ষণে বলা যাইতে পারে যে, উষ্ণ তরল পদার্থের বিশ্লিষ্টাংশ পতনকালে গোলাকার ধারণ করে, এই ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিব্যাদি গ্রহ সমূহও এককালে সূর্য্যের অবয়বস্বরূপ ছিল, কাল সহকারে সূর্য্য হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া এপ্রকার হইয়াছে।

ইতি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কঠিন অপেক্ষা তরল পদার্থের যোগাকর্ষণ-শক্তি অল্প; এই অল্পতাহেতু আমাদের যে সমূহ মঙ্গল সংসাধিত হইতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ, লৌহ, জল এবং বায়ু এ তিনেরই যোগাকর্ষণ শক্তি সমান হইলে কি বিসদৃশ হইত; জীবজগৎ সমূহ বিপদগ্রস্ত হইত। পক্ষান্তরে, কঠিন পদার্থের যোগাকর্ষণশক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল হইয়া কত সুমহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে; বলা বাহুল্য যে এবম্বিধ না হইলে যাবতীয় কঠিন পদার্থই চূর্ণীকৃত হইয়া ভূমিসাৎ হইত। পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থেই যোগাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, তবে কোনটীতে অধিক, কোনটীতে বা অল্প এইমাত্র ভেদ। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এই যোগাকর্ষণ শক্তির অসদ্ভাবে পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থই অসম্বদ্ধ অণুরাশি হইয়া থাকিত। এই যে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ইত্যাদি, এই যে, সকানন-পর্ব্বত পৃথিবী, এই যে অসংখ্য নক্ষত্র পরিশোভিত নভোমণ্ডল, ইহাদের কোনওটীরই শোভা আমাদের নয়নগোচর হইত না;

সকলেই বিচ্ছিন্নাবস্থায় অবস্থান করিত। সুতরাং মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় এই যোগাকর্ষণ শক্তির সদ্ভাবে আমাদের কম উপকার সংসাধিত হইতেছে না।

গন্ধক ও পারদ সংযুক্ত হইয়া হিঙ্গুল উৎপন্ন হয়; হরিদ্রা ও চুণের বিমিশ্রণে যে পদার্থ সমদ্ভূত হয়, তাহা না শ্বেত না পীত; উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট বস্তুসমূহ মিলিত হইয়া বর্ণহীন পদার্থই উৎপাদন করে; বাষ্পীয় পদার্থ সংযুক্ত হইয়া জলবৎ কঠিন হয়; আবার বর্ণ বিহীন পদার্থের সংমিলনে জ্যোতির্ম্ময় বর্ণ বিশিষ্ট পদার্থের সম্ভাব হয়; গন্ধ বিহীন দ্রব্য হইতে সুগন্ধ দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, কারণ, যবক্ষারজান্ এবং উদ্জান্ ইহার উভয়েই গন্ধহীন; কিন্তু এতদুভয়ের বিমিশ্রণ সম্ভূত আমোনিয়া তীব্রগন্ধবিশিষ্ট; আবার স্বাদহীন দ্রব্য সংযোগে সুস্বাদু দ্রব্যের উৎপত্তির কারণ, অঙ্গার, অম্লজান এবং উদজান ইহারা সকলেই স্বাদ বিরহিত, কিন্তু ইহাদিগেরই সংসক্তি প্রভাবে শর্করা উৎপন্ন হয়; এই-মত ভিন্ন ভিন্ন রূঢ় পদার্থ সমূহের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ বশতঃ পরস্পরে মিলিত হইয়া এই প্রকার নূতন আকার ও নূতন গুণ ধারণ করিয়া থাকে পণ্ডিতেরা তাহাকে "রাসায়নিক আকর্ষণ" কহেন।

মাধ্যাকর্ষণ এবং যোগাকর্ষণ এতদুভয়কে যেমন জড় পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম বলা যায়, রাসায়নিক আকর্ষণ তদ্রূপ নহে; কারণ, ইহা সকল পদার্থে পরিলক্ষিত হয় না; ইহা দ্বারা প্রত্যেক পদার্থের সহিত প্রত্যেক পদার্থের সংযোগ সম্ভবে না। ইতিপূর্ব্বে যে সমুদয় আকর্ষণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনটীতেই কি আকর্ষক, কি আকৃষ্ট কেহই রূপান্তরিত বা বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত হয় না; কিন্তু এই আকর্ষণ প্রভাবে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য সংঘটন হয়, অর্থাৎ উভয়ে মিলিত হইয়া নূতন গুণবিশিষ্ট স্বতন্ত্র পদার্থ উৎপন্ন করে। এই রাসায়নিক আকর্ষণের আর এক বিচিত্র ধর্ম্ম এই যে, ইহার প্রভাবে মিলিত পদার্থ সমূহের অণু সকল কদাপি পৃথক করা যায় না; কিন্তু যোগাকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট বস্তু সমূহের অণু সকল ছেদন, পেষণ, মর্দ্দন ইত্যাদির দ্বারা অনায়াসে বিচ্ছিন্ন হয়। অপিচ যে পদার্থ যত বিসদৃশ, তাহাদেরই রাসায়নিক আকর্ষণ তত শীঘ্র এবং সহজে সঙ্ঘটিত হয়।

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যে মনোমুগ্ধকারী বিচিত্রিত আমরা নিত্য সন্দর্শন করিতেছি, ইহার যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকই অশেষবিধ শোভায় পরিশোভিত দেখি, রাসায়নিক আকর্ষণ যে ইহার একটী প্রধান কারণ তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কারণ রূঢ় পদার্থনিচয়ের পরস্পর সংযোগাদি দ্বারাই এবম্বিধ বৈচিত্র্য উপাদিত হইয়া থাকে। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যে সমুদয় পদার্থ আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, তৎ-সমুদয়ই যৌগিক, অর্থাৎ তাহারা দুই, তিন বা ততোধিক রূঢ় বা ভূত পদার্থের সম-বায়ে উদ্ভূত। পদার্থ-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বহু বিচার দ্বারা ৬৪টী কোন কোন মতে ৬৬টী রূঢ় পদার্থের অস্তিত্ব স্থির করিয়াছেন; বলা বাহুল্য যে এই কয়েকটী রূঢ় পদার্থ হইতেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থের কতকগুলিন অম্লজানের ন্যায় বায়বীয়

আকারে, কতকগুলিন পারদের ন্যায় তরলাকারে, আর কতকগুলিন লৌহ, গন্ধক ইত্যাদির ন্যায় কঠিন আকারে অবস্থিত। নিম্নে তাহাদিগের কতকগুলির নাম উল্লিখিত হইতেছে যথাঃ—স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, লৌহ, রাঙ, সীস, দস্তা ইত্যাদি ৪৯টীকে ধাতু কহে, আর——

বাঙ্গালা নাম	ইংরাজি নাম
১। অম্লজান	অক্সিজেন
২। উদ্জান	হাইড্রোজেন
৩। যবক্ষারজান্	নাইট্রোজন
৪। গন্ধক	সলফর্
৫। উপগন্ধক	সিলিনিয়ম্
৬। অনুগন্ধক	টেল্রিয়ম্
৭। অরুণক	আইয়োডাইন
৮। কৃষ্ণান্তক	ফ্লোরাইন
৯। হরিতক্	ক্লোরাইন
১০। পূতিক	ব্রোমাইন
১১। টঙ্কক	[illegible]ন
১২। প্রস্ফুরক	ফস্ফরস্
১৩। সৈকতক	সিলিকন
১৪। অঙ্গারক	কার্ব্বন
১৫। সেঁকো	আর্সনিক

এই ১৫ টী কে উপধাতু বলে। সমুদয় এই ৬৪ টী রূঢ় বা মূল পদার্থের প্রত্যেকেই এক এক প্রকার পরমাণু সমষ্টি; এখানে ইহাও বলা আবশ্যক করে এই মূল পদার্থ সমূহের সংযোগে যে সমুদয় যৌগিক পদার্থ উদ্ভূত হয়, পুনঃ বিশ্লেষণ করিলে তাহাদিগের শরীরগত মূল উপকরণগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপিচ, মূল পদার্থগুলি পৃথগবস্থায় যেমন ভার বিশিষ্ট থাকে, পরস্পর সংযুক্ত হইলেও ঠিক সেই মতই থাকে; কদাপি ব্যত্যয় সম্ভবে না; সুতরাং উৎপন্ন যৌগিকের ভার, তাহার শরীরগত মূল উপাদানের ভার সমষ্টির তুল্য; অতএব এখানে ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাসায়নিক সংযোগে নির্দ্দিষ্ট ভারের আধিক্য কি ন্যূনতা কিছুই সম্ভবে না। বস্তুতঃ রাসায়নিক সংযোগ দ্রব্যের মাত্র কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশবর্ত্তী; এই হেতুই প্রত্যেক স্থলে এবম্বিধ পরিবর্ত্তনে কি কি পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের পরিমাণই বা কি তাহা আমরা অনায়াসে অবগত হইতে সক্ষম হই। কিন্তু তাহাদিগের পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি করা মানবশক্তির অসাধ্য, তাই তাহারা কি বিশুদ্ধ, কি বিমিশ্রিত, সকল অবস্থাতেই সমভার বিশিষ্ট থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তত্ত্ব সংগ্রহ।

মৎস্য ভোজন—মৎস্য ভোজন আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত। সম্প্রতি মাংস ভোজনের বহুল প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উষ্ণ প্রধান দেশে মাংস ভোজন অপেক্ষা মৎস্য ভোজন অধিক হিতজনক। প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও আমেরিকান চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে মৎস্য ভোজন স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম উপকারী এবং ইহাতে দীর্ঘজীবন লাভ হয়। আবার নদীর বা পুষ্করিণীর মৎস্য অপেক্ষা সমুদ্রজাত মৎস্যে শরীরপুষ্টিকারী পদার্থ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

রোগের কারণ—সম্প্রতি উদ্ভিদাণু লইয়া চিকিৎকদিগের মধ্যে মহা গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছে। অনেক ডাক্তারের মতে টাইফস্, টাইফায়েড, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উৎকট জ্বর একপ্রকার চক্ষুরগোচর উদ্ভিদাণু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনেকের মতে বিসূচিকা রোগও চক্ষুরগোচর উদ্ভিদাণুবিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই বিষয় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ডাক্তার কচ্ প্রভৃতি চারিজন ডাক্তার কিছুদিন হইল জর্ম্মণী হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা অনেকগুলি বিসূচিকা রোগীর মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন যে সকলকারই রক্তে ও মলমূত্রে এক প্রকার উদ্ভিদাণু বিদ্যমান ছিল; কিন্তু অন্য অন্য রোগে মৃত কয়েকদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া উক্ত প্রকার জীবাণুর সত্তার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হন নাই। সম্প্রতি ডাক্তার রিচার্ডস্ ওলাউঠাজনক কীটাণু একটী শূকরের দেহে প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন, অল্পক্ষণ পরে ঐ জন্তুটি পূর্ণলক্ষণাক্রান্ত ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এক্ষণে ঐ কীটনাশক কোন পদার্থ আবিষ্কৃত হইলে ওলাউঠা রোগ বৎসর বৎসর সহস্র সহস্র লোকের প্রাণনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। কতকগুলি সুবিখ্যাত ডাক্তারদিগের মতে ক্ষয়কাশ রোগও কীটাণু বিশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন যে উক্ত কীটাণু নিশ্বাসের সহিত রোগীর দেহ হইতে নির্গত হইয়া সমীপস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে উক্ত রোগাক্রান্ত করিয়া ফেলে। তাঁহারা আপনাদের মত সমর্থনার্থ স্ত্রী হইতে স্বামীর, স্বামী হইতে স্ত্রীর একত্র শয়ন নিমিত্ত রোগ হইবার কয়েকটী উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা ক্ষয়কাশ রোগকে সংক্রামক রোগের মধ্যে গণনা করিয়াছেন।

অজীর্ণ হইলে অর্দ্ধ চামচা লবণ কিঞ্চিৎ শীতল জলে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, উপকার দর্শিয়া থাকে। লবণ কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে বমিকারক ঔষধের

ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে; এজন্য বিষপায়ীকে কিছু অধিক পরিমাণে লবণ খাওয়াইলে বিষ বমির সহিত বহির্গত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। কীটদষ্ট স্থানে লবণ লাগাইলে জ্বালা নিবারণ হইয়া থাকে।

বাগ আচড়ার পাতা ও মুথা পিশিয়া মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘার উপর মাখাইয়া তাহার উপর কচি কলা পাতা চাপা দিয়া ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাউর ঘা শুষ্ক হয়।

আমরক্ত রোগের চমৎকার ঔষধ।—আস্‌সেওড়ার শিকড়ের ছাল ৩ কুঁচ, ২ টা গোলমরিচের সহিত পিষিয়া প্রাতেঃ, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার সময় তিনটী বটিকা সেবন করিতে হইবে।

পাকা কয়েৎবেলের পানা মিছরির সহ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে পুরাতন রক্তাতিসার আরোগ্য হয়।

দেশীয় বুটিং কাগজ প্রস্তুত করিবার নূতন উপায়।—পাকা তেঁতুলের মাড়ি বাঙ্গালা কাগজের দুইদিকে মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ গরম জলে পরিষ্কার করিয়া সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করিলে ব্যবহারোপযোগী বুটীং কাগজ প্রস্তুত হইবে।

উৎকৃষ্ট ইংরাজী কালী প্রস্তুত করিবার সহজ উপায়।—মাজু ফল আধ ছটাক, হিরাকস্ ১ কাঁচ্চা, লবঙ্গ আড়াই আনা, গঁদ্ (বাব্‌লা) ১ কাঁচ্চা উত্তমরূপে হামামদিস্তায় চূর্ণ করিয়া পরে একপোয়া পরিষ্কার জলে ফেলিয়া ৪৮ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইলে ভাল কালী প্রস্তুত হইবে। কপি-ইংক করিতে ইচ্ছা হইলে ১ তোলা পরিষ্কার কাশির চিনী মিশাইবে।

এ, পি, এস

শুষ্ক আকন্দপত্রের ধূম দিলে মশা ছারপোকার দৌরাত্ম্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, ইহাতে ইন্দুর পর্য্যন্ত আইসে না।

বড় কাঁকড়ার খোলায় আকন্দ মূল ও শামুক রাখিয়া প্রদীপ জ্বালিলে ছারপোকা নষ্ট হয়।

মাথায় উকুন হইলে পায়ের তলে পানের রস মাখিলে উকুন মরে।

লবণ ও কাঁজী একত্রে মিশাইয়া দিলে গাছের পোকা মরে।

বৃক্ষে লতা গুল্মাদি স্বাভাবিক শ্বেতবর্ণের পুষ্পবৃক্ষে কৃত্রিম উপায়ে নীল, লাল, প্রভৃতি বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত করিবার সহজ উপায়।

১ ভাগ এক বৎসরের গোময় সার, ১ ভাগ পাতা পচা সার, $\frac{১}{৪}$ বেলেমাটি $\frac{১}{৮}$ আঁটাল মাটি শৃঙ্গচূর্ণ অথবা অস্থি চূর্ণসহ অল্প পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া নীলের জল (লাল হইলে গেঁরিমাটির) উহাতে ঢালিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে পরে চূর্ণ করিয়া পুনরায় শুষ্ক করিয়া টবে দিয়া উহাতে বীজ অথবা চারা বা গেঁড় রোপন করিবে, এবং প্রত্যহ জল দিবার সময় ঐ বর্ণের জল সেচন করিবে (সাবধান যেন রৌদ্র বা বৃষ্টি না লাগে) তাহা হইলে ঐ বর্ণের পুষ্প ফুটিবে।

অর্শরোগের ঔষধ।—সাদা ধুনা, মোঙ্গস্তান, মোচরস, খুনখারাবি প্রত্যেক একতোলা করিয়া লইয়া হামাম দিস্তায় উত্তমরূপে গুঁড়াইয়া কাপড়ে ছাকিয়া মধু দিয়া খলে উত্তমরূপে পিষিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটিকা করিয়া তিন দিবস তিনবার করিয়া সেবন করিতে হইবে। শাক, অম্ল, কলাইয়ের দাউল প্রভৃতি খাওয়া নিষিদ্ধ।

ঔষধ সেবনের কয়দিন মূলার পত্র ও মূলা সিদ্ধ করিয়া তাহার জল খাইলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। পক্ক পেঁপিয়া খাইলে উককার দর্শে। বলি হইলে তাহাতে লেপন করিবার স্বতন্ত্র ঔষধ আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিব।

কাশির ঔষধ। হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, মরিচ, পিপুল, শুণ্ঠি চূর্ণ করিয়া সমভাগে মধুর সহিত মিশাইয়া বটীকা করিয়া সেবন করিলে কাশ রোগ আরোগ্য হয়।

বাতের ঔষধ। ভেরেণ্ডার তৈল আধপোয়া, সৈন্ধবলবণ এক কাঁচ্চা, লৌহ পাত্রে ঘষিয়া গরম করিয়া লেপন করিলে বাত ভাল হয়।

বাতের ঔষধ। সোনা পাতা, চিরতা; শরফোকা, শরতাড়া, জাঙ্গি-হরিতকী, (বড় হরিতকী (প্রত্যেক চারিআনা ওজন) রাত্রিতে ভিজাইয়া একপোয়া জলে পিপুল গুঁড়া দিয়া মধু সহ খাইবে।

বাধক দোষ নিবারক। অনন্তমূল, বাকসমূল ও রক্তশালী তণ্ডুল, কাঁজি ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঋতুকালে সেবন করিলে বাধক রোগ আরগ্য হয়।

অহিফেন সেবনে বিষাক্ত হইলে কল্‌মি শাকের রস বা শালুকের রস পান করিলে বিষ নষ্ট করে।

কেশরাজ বাটিয়া ঘায়ে লাগাইলে ঘায়ের বিষ নাশ হয়।

ধুতরার পাতা বাটিয়া ঘায়ে প্রলেপ দিলে ঘা ভাল হয়।

এলাইচ বাটিয়া ঘোলের সহ লেপন করিলে দাদ আরাম হয়।

জীরা, হরিতকী, ধুনা, অশ্বত্থ ছাল একত্রে লেপন করিলে পোড়া ঘায়ের জ্বালা নিবারণ হয়।

হাঁপানি রোগের ঔষধ। বংশলোচন, বড় পিপুল, ছোট এলাইচ, গোক্ষুর পোলা গুড়াইয়া (প্রত্যেক এক তোলা ওজন) মধু দ্বারা ছোট মটর প্রমাণ বটীকা বাঁধিয়া অন্ততঃ সাতদিন খাইতে হইবে।

রক্ত পরিষ্কারক। নিমছাল ১ তোলা, মেহেন্দি পাতা ২ তোলা, চিরতা ১ তোলা মুণ্ডি ১ তোলা, শরতাড়া ৸৹ আনা, শরফোকা ॥৹ আনা, নিলকাটী ।৴৹ আনা, হরিতকী ১ তোলা, মধু ২ তোলা অর্দ্ধসের জলে ভিজাইয়া অগ্নিতে চাপাইবে এবং ৴৹ আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু সহ প্রাতে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেবন করিবে।

সহজে সকল প্রকার ফোড়া কাটাইবার ঔষধ—শ্বেত চন্দন ও ঘৃত উত্তমরূপ কোন একটী পাতরের পাত্রে মিশাইয়া ঐ মিশ্রিত পদার্থ ফোড়ার উপর লেপন করিবে। পরে উহার উপর সিমুল তুলার একটী পটী বসাইয়া আবার তাহার

[illegible] পূর্ব্বের ন্যায় উক্ত মিশ্রিত পদার্থ লেপন করিবে। এইরূপ করিয়া [illegible] [illegible] রাখিলে সকল প্রকার ফোড়া ফাটিয়া যায়। যদি একবারে না ফাটিয়া যায় তবে দুইবার লেপন করিবে।

অম্ল জনিত অজীর্ণ রোগের ঔষধ—কাঁচা দুগ্ধ একছটাক, নির্ম্মল চুনের জল অর্দ্ধ ছটাক ও সামান্য মিছরি একত্র করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে অল্প দিবসের মধ্যে আরোগ্য হইবে।

ভীমরুল, মৌমাছি, বোল্‌তা প্রভৃতির দংষ্ট্রা জনিত জ্বালা নিবারণের উপায়।—কচু ডাঁটার রস দংষ্ট্র স্থানে লেপন্ করিলে জ্বালা নিবারিত হয়।

মিঃ লেম্‌ফন তাড়িত প্রবাহ দ্বারা প্রাণি বধের এক প্রকার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন; ইহাতে বধ্য প্রাণির কিঞ্চিন্মাত্রও কষ্ট বোধ হইবে না। সে সহসা বজ্রাহতের ন্যায় মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে। ফাঁসির পরিবর্ত্তে এই উপায় অবলম্বন করা প্রশস্ততর তাহার আর সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞানবিৎ হাগিন্স ধূমকেতুর আলোক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহাতে অঙ্গার, উদজান ও যবক্ষারজান বিদ্যমান আছে। বার্থলট্ সাহেব বলেন যে ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে ধূমকেতুর আলোক বৈদ্যুতিক আলোক ব্যতীত আর [illegible] নহে।

এক জন ফরাসী অস্ত্র চিকিৎসক একদা কয়েকটী ইন্দুরকে ক্লোরোফরম্ দ্বারা অজ্ঞান করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই অবস্থায় তাহাদের লাঙ্গুল ধরিয়া উত্তোলন করাতে তাহারা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কামড়াইতে উদ্যত হইল, পুনর্ব্বার তাহাদের ভূমিতে পাতিত করাতে তাহারা পুনরায় সংজ্ঞাহীন হইয়াছিল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া তিনি ইহা মনুষ্য সম্বন্ধেও পরীক্ষা করিয়াছিলেন। একদা কোন রোগী অতিরিক্ত [illegible] [illegible] দ্বারা অজ্ঞানাভিভূত হইলে তিনি তাহার মস্তক শয্যার উপর রাখিয়া পা দুখানি ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া তাহাকে সংজ্ঞাযুক্ত করিয়াছিলেন।

[illegible] বাঙ্গালা চিকিৎসক-প্রধান দেশ; দেশের [illegible] দেশহিতের নিমিত্ত [illegible] ঔষধ বিক্রয় করেন। রোগেরও অভাব নাই; ঔষধেরও অভাব নাই, কিন্তু দুঃখের [illegible] যে অনেক "অব্যর্থ মহৌষধ" ও "ব্রহ্মাস্ত্র" সেবন করিয়াও অনেক লোকের রোগ [illegible] হয় না। বাঙ্গালার প্রায় অর্দ্ধেক লোক দন্তরোগের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রতি [illegible] সংবাদ [illegible] বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঔষধ কত উপকারী তাহা সাধারণে [illegible]। আমরা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে নিমগাছের [illegible] [illegible] প্রাতে চর্ব্বণ করিয়া দন্ত মার্জ্জন করিলে দন্তের প্রায় সকল প্রকার রোগ [illegible] দন্তের গোড় ফোলা, দন্ত [illegible] ও দন্তের গোড়া ফোলা প্রভৃতি [illegible] রোগের পরীক্ষার এই সামান্য ঔষধ [illegible]। উহা চর্ব্বণ করিলে [illegible] [illegible] থাকে, তাহাতে দন্তের [illegible] হয় না।